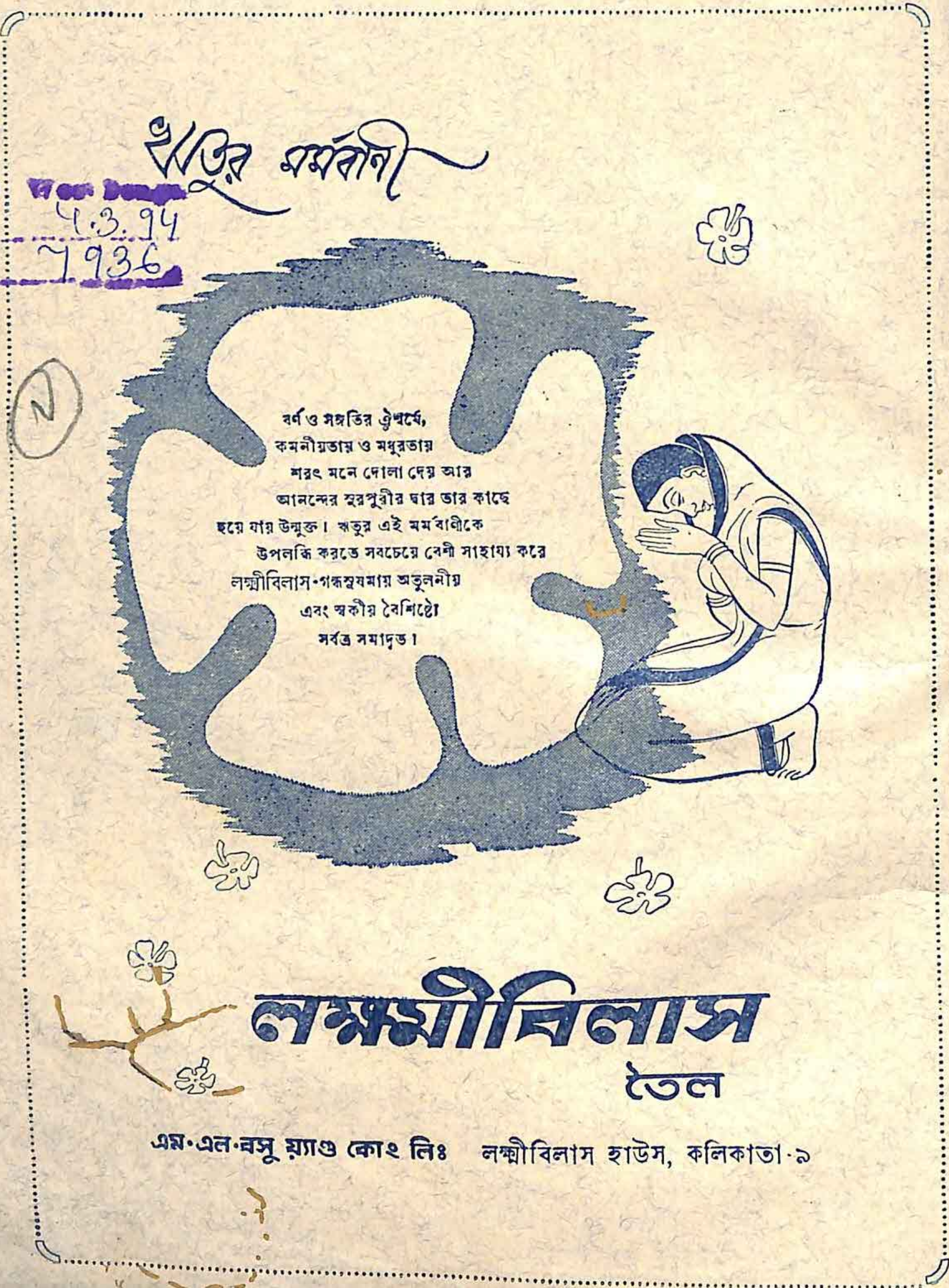

ঋতুর মর্মবাণী
বর্ণ ও সঙ্গতির ঐশ্বর্যে,
কমনীয়তায় ও মধুরতায়
শরৎ মনে দোলা দেয় আর
আনন্দের সুরপুরীর দ্বার তার কাছে
হয়ে যায় উন্মুক্ত। ঋতুর এই মর্মবাণীকে
উপলব্ধি করতে সবচেয়ে বেশী সাহায্য করে
লক্ষ্মীবিলাস-গন্ধসুষমায় অতুলনীয়
এবং স্বকীয় বৈশিষ্ট্যে
সর্বত্র সমাদৃত।
লক্ষ্মীবিলাস
তৈল
এম·এল·বসু য়্যাণ্ড কোং লিঃ লক্ষ্মীবিলাস হাউস, কলিকাতা·৯



॥ বার্ষিক ॥
॥ শিশু-সাথী ॥

আশুতোষ লাইব্রেরী · কলিকাতা

প্রকাশক
বৃন্দাবন ধর অ্যাণ্ড সন্‌স্ লিমিটেড্
স্বত্বাধিকারী—আশুতোষ লাইব্রেরী
৫, বংকিম চাটার্জি ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২

ছবি আঁকিয়াছেন

কাফী খাঁ, পূর্ণ চক্রবর্ত্তী, শৈল চক্রবর্ত্তী, সিদ্ধেশ্বর মিত্র, সমর দে, আশু বন্দ্যোপাধ্যায়, নরেন্দ্রনাথ দত্ত, ধীরেন বল, বীতপাল, সুধেন্দু সেনগুপ্ত, নরেন মল্লিক, রেবতী ঘোষ।

মুদ্রাকর
শ্রীপরেশনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
শ্রীনারসিংহ প্রেস
৫, বংকিম চাটার্জি ষ্ট্রীট, কলিকাতা

দাম ৪৲ চার টাকা

সূচীপত্র

চিত্র


PHILIPS
'১১৬' (ড্রাই ব্যাটারী)
মূল্য : ১৭৫৲
বিসিএ ৪৩৬ এ (এ-সি)
মূল্য : ৪৩৫৲
ফিলিপস্ এর
সুপার এম্ রেডিও
বিসিএ ৫১৬ বি
(ড্রাই ব্যাটারী)
মূল্য : ৪৭৫৲
বিসিএ ৬২৮ ইউ (এসি-ডিসি)
মূল্য : ৬৫০৲
রেডিওতে ম্যাগনেটিক সরঞ্জামের ব্যবহার এটা ফিলিপ্স্ এর নূতন এক সৃষ্টি; এঁদের আধুনিক রেডিওগুলি "সুপার এম্" কৌশলে সমৃদ্ধ হ'য়ে রেডিও জগতে নূতন এক মাপ-কাঠির প্রবর্ত্তন করেছে।
আনন্দ - মুখর দিনের খোরাক জোগাবে ফিলিপ্স্ এর নূতন এই 'সুপার এম্' রেডিও গোষ্ঠী। এ দিনের উপহার হিসাবে ফিলিপ্স্ এর রেডিওর কথা না ভেবে পারা যায় না।
সবে বেরিয়েছে
বিসিএ ৩৪৫ বি
৩ ওয়েভ ব্যাণ্ড, ৫ ভাল্‌ব্
চমৎকার স্বর, ব্যাটারী খরচে
সাশ্রয়—মূল্য : ২৯৫৲
ফিলিপ্স্
আপনার গৃহের অফুরন্ত আনন্দের আধার
বিএক্স ৭৪৫ এ (এসি)
মূল্য : ১২০০৲
রেকর্ড চেঞ্জার
এজি ১০০৪ (এসি)
মূল্য : ২৯০৲
ডিস্ক-যকি
এজি ২১৪১ (এসি) মূল্য : ১৬৫৲
রেডিওগ্রাম্
এফ্‌সিএ ৬৫৯ এ/ইউ (এসি কিংবা এসি-ডিসি)
মেহোগনী বহিরাবরণ—মূল্য : ১৭৫০৲
মূল্যের উপর স্থানীয় ট্যাক্স্ দেয় কোন রকম ডিস্‌কাউন্টের ব্যবস্থা নেই।
PSPH 153 A

তিন হাতী



অন্নদাশঙ্কর রায়

বাপা!
তখন আমার কর্ম ছিল হাতীর পিঠে চাপা।
তিনটি হাতীর কথা আমার আজো পড়ে মনে
হায়রে সে সব হাতী কোথায়! আছে কি জীবনে!

(১)



দুবলহাটির হাতী রে
দুবলহাটির হাতী
বপুখানা দেখতে যেন
ঐরাবতের নাতি।
রাজার হাতী, হাতীর রাজা,
চতুর্দিকে রব
আমারে সেলাম করো,
নিখুঁৎ আদব।

গদাই লস্করী চাল ভারিক্কি ধরণ
দেমাকে আমার ভূঁয়ে পড়েনা চরণ।
কি যে তোমার মর্জি, বাপু,
পাঁকে কিসের কাজ
নামবে তুমি কোন পাতালে
মরা বিলের মাঝ!
পিঠে আমি বসে আছি ভুলে গেলে কি
অমনি করে দেবে আমায়
কাদায় ফেলে কি!



শুকনো ডাঙা নয় যে আমি পিঠ থেকে দি' লাফ
প্রাণে বাঁচার পন্থা কোথায়! কিসে থাকি সাফ!
মাহুৎ ছিল পাকা লোক অঙ্কুশ চালায়
হাতী তখন পঙ্ক হতে উঠিয়ে পালায়।

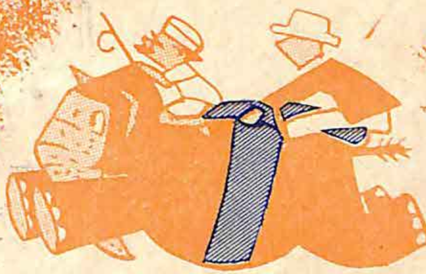
(২)



রাতোয়ালের হাতী রে
রাতোয়ালের হাতী
আকারে মাঝারি তুমি
ঐরাবতের জাতি।
মেজাজ শরিফ বেশ
চলাটিও খাসা
কত বার পিঠে নিয়ে
কত যাওয়া আসা।

কী যে হলো খেয়াল, আমায় উঠতে দেবে না
হাঁটু পেতে বসে তুমি সোয়ারি নেবে না!
হাতী চড়ার জন্যে আমি কোথায় পাব মই
টেবিল পাতি চেয়ার রাখি তাতে খাড়া হই।
আবার যখন নামতে হবে সে বড় ভাবনা
গ্রামে গ্রামে চেয়ার টেবিল পাব কি পাব না।
হাতীতে চড়ি তো হাতী নামাতে না চায়
কাজের জায়গা এলে আমি অসহায়।
মাহুৎটা হদ্দ হয় অঙ্কুশ তাড়িয়ে
হাতী বসবে না, খালি থাকবে দাঁড়িয়ে।

(৩)



নেমৎপুরের হাতী রে নেমৎপুরের হাতী
আকারে বামন তবু ঐরাবতের জাতি।
অদ্ভুত দৌড়তে পারে কদাচিৎ হাঁটে
আমি তো লজ্জায় পড়ি পথে আর ঘাটে।
লোকজন ভাবে আমার এমন কি তাড়া
আমার ধরন দেখে ভেঙে পড়ে পাড়া।

"ঘোড়েকা পর হাওদা
হাতীকা পর জিন
জলদি যাও জলদি যাও
ওয়ারেন হেস্টিন"।
যদিও লোকটি নই
ওয়ারেন হেস্টিন
তবুও আমার ইনি হাওদাবিহীন।



গদিটি আঁকড়ে ধরে মনে মনে কম্প
প্রবল প্রতাপ বলে যত করি ঝম্প।
তারপর মজা দেখ, নামার সময়
পিছনের দিকটাই হাঁটু মুড়ে রয়।
আমি তো ডিগবাজি খাই পা দুটো উঠিয়ে
গদির বাঁধনটাকে দু'হাতে মুঠিয়ে।
ছুটে আসে চৌকিদার ধরে আমায় চেপে
নইলে কেউ ছবি দিত পত্রিকায় ছেপে।





বনফুল

রাত বারোটা বেজে গেছে। নীলমণিবাবু তখনও ফেরেন নি। নীলমণি-পত্নী সুলোচনা লোচন দুটি রক্তবর্ণ করে' বসে আছেন রেগে। নীলমণিবাবুর বিধবা বোন মায়াও বসে আছেন একটু কুণ্ঠিত হ'য়ে। বৌদি দাদার নামে যে সব কটূক্তি করছেন তার প্রতিবাদ করতে ইচ্ছে করছে, কিন্তু করবার সাহস নেই। বৌদির অনুগ্রহ না থাকলে এ বাড়িতে টেকা সম্ভব নয়।

...ঘড়িতে টং করে' যখন সাড়ে বারোটা বাজল তখন সুলোচনা পুনরায় তিক্তকণ্ঠে মায়াকে বললেন, "কাণ্ডখানা দেখেছ তোমার দাদার। তা-ও যদি বুঝতাম নিজের কাজের জন্যে এত খেটে মরছে তাহলেও বা মানে ছিল। কিন্তু কোথাকার কে হাড়হাবাতে মাছের ব্যবসা করবে তার জন্যে ওর ঘুম হচ্ছে না। সারাজীবনটা এই করছে। ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়ানোর সীমা আছে তো একটা—"

নীলুবাবু ফিরলেন রাত দেড়টার সময় কিছু টাট্কা বাটা মাছ নিয়ে। নিদ্রিতা সুলোচনাকে ঘুম থেকে তুলে বললেন, "ওগো, শুনছ, ফার্ষ্ট ক্লাস বাটা মাছ পেয়ে গেলাম মহলদারের কাছে। ভদ্রলোকের ভাগ্য ভালো, ঝাল করে' ফেল দিকি মাছগুলোর—।"

"এখন, এত রাত্রে? উনুনে আঁচ নেই—তোমার আক্কেলও কি নেই?"

"আঁচ দিয়ে দাও, কতক্ষণ লাগবে! আমি মাছগুলো বেছে দিচ্ছি। মাছ সঙ্গে করে' নিয়ে এলুম, ভদ্রলোককে নিরামিষ খেতে কি দেওয়া যায়!"

মায়া বলল—"আমি সব করে' দিচ্ছি।"

দুই ভাই বোনে মহা উৎসাহে লেগে পড়ল। সুলোচনাকেও লাগতে হ'ল, সে কিন্তু গজগজ করতে লাগল সমানে। যাই হোক, রাত্রি আড়াইটের সময় উক্ত আগন্তুক ভদ্রলোককে পরিতৃপ্তি সহকারে মাছ-ভাত খাইয়ে নীলুবাবু সত্যই পরিতৃপ্ত হলেন।

যে ঘটনাটা বললাম সেটা একটা উদাহরণ মাত্র। নীলমণিবাবু সারাজীবন ধরে' এই কাজ করে এসেছেন। তিনি সামান্য লোক, স্থানীয় জমিদারের স্টেটে সামান্য গোমস্তার কাজ করেন। কিন্তু তাঁর এমন দিল-দরিয়া স্বভাব যে বিশ্বের যাবতীয় লোককে দু'হাত বাড়িয়ে সাদরে অভ্যর্থনা করবার সাহস তাঁর আছে। ঘরের খেয়ে অনেক বুনো মোষ তাড়িয়েছেন তিনি জীবনে! আর সুলোচনাও এ নিয়ে অনেক বাক্যযন্ত্রণা দিয়েছে তাঁকে। কিন্তু তিনি গ্রাহ্য করেন নি।

—দুই—

একবার অসুস্থ হয়ে কোলকাতা শহরে গিয়ে পড়তে হ'ল নীলুবাবুকে। গ্রামের ডাক্তার তাঁর অসুখ সারাতে পারলেন না। কোলকাতা শহরে নীলুবাবু বড়ই বেকায়দায় পড়ে' গেলেন। এখানে কেউ তাঁকে চেনে না। প্রতি পদক্ষেপে পয়সা দরকার। দিলদরিয়া নীলুবাবু জীবনে বিশেষ কিছু জমাতে পারেন নি। জমিদারের কাছ থেকে শ'দুই টাকা ধার করে' নিয়ে এসেছিলেন তিনি। এসে আশ্রয় নিয়েছিলেন একটি খোলার ঘরে। যে ডাক্তার বাবুটির চিকিৎসায় তিনি আত্মসমর্পণ করলেন তাঁর ফি আট টাকা। তাঁকে বার দুই ডেকেই নীলুবাবুর জিব বেরিয়ে পড়ল। অবশেষে ডাক্তারবাবুকে নিজের অর্থ-কৃচ্ছ্রতার কথা নিবেদন করলেন। ডাক্তারবাবু বললেন, "আমার প্রত্যহ আসবার দরকার নেই। সাতদিন পরে পরে আমি আসব। আপনি সকাল বিকেল একটু একটু বেড়াবেন পার্কে গিয়ে। যে ওষুধ দিয়ে গেলাম ওইটেই এখন চলুক—"

নীলুবাবু সুলোচনাকে এবং নিজের একটি অবিবাহিতা কন্যাকে সঙ্গে নিয়ে এসেছিলেন। মায়া গ্রামের বাড়িতে ছিল। সবাই চলে এলে ঘরদোর দেখবে কে? আর তাঁর একমাত্র পুত্র জগন্নাথ ছিল বোর্ডিংয়ে। গ্রামে হাইস্কুল ছিল না, তাই তাকে বিদেশে পাঠাতে হয়েছিল। সে যেখানে ছিল সেটাও একটা গ্রাম। শহরে পাঠাবার সামর্থ্য নীলমণির ছিল না।

ডাক্তারের কথা শুনে নীলমণি বললেন—"জগুকে না হয় আসতে লিখি। একা একা বেড়ানো আমার পক্ষে অসম্ভব এই কোলকাতা শহরে—"

সুলোচনা বললে—"জগুই বা কোলকাতা শহরের কি চেনে। সেও ত কখনও আসে নি—"

"তবু সঙ্গে একটা কেউ থাকলে ভরসা হয়। রাস্তাঘাট দু'দিনেই চিনে নেবে—"

"তাহলে জগুকে লিখে দাও সে যেন কাউকে সঙ্গে নিয়ে আসে। কখনও তো কোলকাতায় আসে নি। হাওড়া স্টেশনে নেমে এই গলির গলি তস্য গলির ঠিকানা সে কি বার করতে পারবে?"

"আমি হরেনকে লিখে দিচ্ছি। সেই ওকে পৌঁছে দিয়ে যাবে।"

নীলমণিবাবুর বন্ধু হরেন জগুকে পৌঁছে দিয়ে গেলেন। এর পরই সমস্যাটা হঠাৎ খুব জটিল হ'য়ে উঠল। নীলমণিবাবু ঠিক করেছিলেন ট্রামে চড়ে' হেদো পর্য্যন্ত যাবেন, হেদোয় গিয়ে বেড়াবেন। জগুকে সঙ্গে নিয়ে বেরুলেন তিনি। ট্রাম স্টপেজের কাছে গিয়ে জগুকে তিনি বললেন, "ট্রামটা এলেই টপ করে' উঠে পড়বি। ট্রাম বেশীক্ষণ থামবে না।" ট্রাম যখন এল তখন জগু ঠিক চড়ে' পড়ল, কিন্তু চড়তে পারলেন না নীলমণিবাবু। তিনি দুর্ব্বল হয়ে পড়েছিলেন, ভীড় ঠেলে ওঠা সম্ভবপর হ'ল না তাঁর পক্ষে। তিনি চেঁচিয়ে জগুকে বললেন, পরের স্টপেজে নেমে পড়িস। জগু সে কথা শুনতে পেলে না। ট্রাম যখন কলেজ ষ্ট্রীটের মোড়ে গিয়ে থামল তখন নামল সে। কণ্ডাক্টার নামিয়ে দিলে। নেমেই দিশা-হারা হয়ে পড়ল বেচারী। কেবল আশা করতে লাগল বাবা হয়তো পরের ট্রামেই এসে পড়বেন। কিন্তু উপর্য্যুপরি তিন চারটে ট্রাম এল, বাবা এলেন না। নীলমণিবাবু আসতেন, কিন্তু তাঁর এমন মাথা ঘুরতে লাগল যে তিনি আর ট্রামে উঠতে সাহসই করলেন না। আস্তে আস্তে বাড়িই ফিরে এলেন। ভাবলেন জগু ঠিক ফিরে আসতে পারবে। কিন্তু সে এল না। বিকেল গড়িয়ে সন্ধ্যা হ'ল, ক্রমশ রাত্রি আটটা



বাজল তবু জগুর দেখা নেই। কান্না জুড়ে দিলেন সুলোচনা। নীলমণিবাবুও খুব চিন্তিত হলেন। অসুস্থ শরীর নিয়েই বেরিয়ে পড়লেন আবার। প্রতিবেশী জীবনবাবুর কাছে গেলেন। জীবনবাবুর ফোন ছিল। তিনি ফোন করে' হাসপাতালগুলোতে খোঁজ নিলেন, দু'চারটে থানাতেও খবর দিলেন। তারপর বললেন, "আপনি বাড়ি যান। যদি কোনও খবর আসে আমি আপনাকে বলে' আসব। চোদ্দ পনর বছরের ছেলে যখন, তখন ভয় নেই। রাস্তা হারিয়ে ফেলেছে, ঠিক ফিরে আসবে--হয়তো একটু দেরি হবে, আসবে ঠিক।"

"আপনার মুখে ফুলচন্দন পড়ুক মশাই। খবর পেলে দয়া করে' জানাবেন আমাকে। আমরা জেগেই থাকব—"

"নিশ্চয়, নিশ্চয়, সে কথা আর বলতে—"

রাত দশটা পর্য্যন্ত জগু এল না। নীলমণিবাবু এবং সুলোচনার মনোভাব অবর্ণনীয়। দুজনেই কাতর ভাবে ভগবান্‌কে ডাকছিলেন। আর কিছু করবার ছিল না।

—তিন—

যা ঘটেছিল তা এই।

জগু প্রায় ঘণ্টাখানেক কলেজ ষ্ট্রীটের মোড়ে দাঁড়িয়ে বাবার জন্যে অপেক্ষা করল। যখন অন্ধকার হ'য়ে এল, তখন তার মনে হল এবার বাড়ি ফেরা উচিত। কিন্তু এখান থেকে হেঁটে সে কি বাড়ি ফিরতে পারবে? সরকার বাই লেন নামটা মনে আছে, কিন্তু সেটা ঠিক কোনখান থেকে বেরিয়েছে তা তো ঠিক মনে নেই। ট্রামে যাবার উপায়ও বন্ধ, সঙ্গে পয়সা নেই একটিও। টিকিট ছিল না বলেই ট্রাম কণ্ডাক্‌টার নামিয়ে দিয়েছিল তাকে। কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হয়ে চিন্তা করল সে খানিকক্ষণ। তারপর একটা বুদ্ধি মাথায় এল। একটা রিক্‌সায় চড়ে' গেলে কেমন হয়। ওরা অনেক লেনের খবর জানে। বাড়ি গিয়ে ওকে পয়সা দিলেই হবে। একটা রিক্‌সা-ওলাকে জিগ্যেস করলে—"সরকার বাই লেন চেন?"

"খুব চিনি আসুন—"

রিকসা যখন চলতে লাগল তখন জগুর মনে হল সে ঠিক উল্টো দিকে চলছে। বলল সে কথা। কিন্তু রিক্‌সাওলা ধমকে উঠল—"ঠিক নিয়ে যাচ্ছি বাবু, আপনি বৈসে থাকুন না—"

পাড়াগাঁয়ের ছেলে জগু, চুপ করে' রইল। তার মনে হল কোন 'শর্ট কাট্' দিয়ে নিয়ে যাচ্ছে হয়তো। খানিকক্ষণ পরে সে জগুকে নিয়ে যে লেনে ঢুকল তা যে সরকার বাই-লেন নয় তা বুঝতে জগুর দেরি হল না। চেহারাই সে রকম নয়।

"এ কোথায় নিয়ে এলে আমাকে—"

"এইতো শাঁখারিটোলা লেন—"

"আমি বললাম সরকার বাই লেনে যাব—"

"সরকার বাই লেন কোথা! তখন বললেন শাঁখারিটোলা, এখন অন্য বাত বলছেন!"



"সরকার বাই লেনে নিয়ে যেতে গোড়াতেই বলেছি।"

"সরকার বাই লেন কোথা আমি জানি না। আপনি আমার ভাড়া দিয়ে দিন, অন্য সোয়ারি করে' যান।"

"আমার কাছে পয়সা নেই যে। আমাকে বাড়ি নিয়ে চল তখন পয়সা দেব।"

"সরকার বাই লেন আমি চিনি না।"

বচসা শুরু হল। কোলকাতার রিকসাওলা সহজে ছাড়বার পাত্র নয়। জগুও নিরুপায়। কথা কাটাকাটি চলতে লাগল। গোলমাল শুনে একটা বাড়ির দরজা খুলে গেল।

"কি হয়েছে খোকা—"

জগুর তখন চোখে জল। সে সব কথা খুলে বলল ভদ্রলোককে।

"ও, তুমি এই প্রথম কোলকাতা এসেছ বুঝি। কোথায় বাড়ি তোমার?"

"মানসাই। পূর্ণিয়া জেলায়—"

"ও! তোমার বাবার নাম কি?"

"নীলমণি মুখোপাধ্যায়—"

"নীলমণিবাবুর ছেলে তুমি? এস এস।"

ভদ্রলোক রিকসাওলাকে বিদায় করলেন। তারপর বললেন, "সরকার বাই-লেন কোথায় তা আমিও চিনি না। তবে বার করতে পারব আশা করি। তুমি ততক্ষণ একটু কিছু খাও।" জগুর ক্ষিধে পেয়েছিল, সে আর আপত্তি করলে না। প্রচুর খাওয়ালেন ভদ্রলোক। তারপর একটা বই খুলে সরকার বাই-লেনের পাত্তা লাগালেন।

"এইবার চল, তোমাকে পৌঁছে দিয়ে আসি—"

বিরাট মোটর বার করলেন একটা গ্যারেজ থেকে। দশ মিনিটের মধ্যে এসে হাজির হলেন তিনি নীলমণিরাবুর বাসায় রাত্রি সাড়ে দশটায়।

"চিনতে পারেন আমাকে— ?"

নীলমণিবাবু চিনতে পারলেন না।

"সেই যে মাছের ব্যবসা উপলক্ষে আপনার কাছে গিয়েছিলাম বছর কয়েক আগে ? সেই যে রাত্রে বাটা মাছের ঝোল দিয়ে গরম গরম ভাত খাইয়েছিলেন, মনে নেই ?"

নীলমণিবাবুর তখন সব মনে পড়ল।

"আপনার আশীর্ব্বাদে মাছের ব্যবসা করে' ভালই হয়েছে আমার। আপনার সাহায্যেই আমার প্রথম হাতে খড়ি। যোগাযোগ দেখুন, কতদিন পরে আবার দেখা। এখানে এসেছেন অসুখের চিকিৎসা করাতে ? কোন্ ডাক্তার দেখছে—"

"ডাক্তার এস. কে. মিত্র—"

"আমি কাল নীলরতন সরকারকে নিয়ে আসব। তিনি আমার বাড়ির ডাক্তার। এটি কে ? মেয়ে ? বা চমৎকার দেখতে তো। বিয়ে হয় নি দেখছি। সুপাত্র আছে হাতে। আমার ভাগ্নে। আচ্ছা সে সব কথা পরে হবে এখন। আগে সেরে উঠুন—"

নীলমণিবাবু সেরে উঠলেন। তাঁর মেয়েরও বিয়ে হ'য়ে গেল ভদ্রলোকের ভাগ্নের সঙ্গে। নীলমণিবাবু খুব আনন্দিত হলেন অবশ্য, কিন্তু খুব বেশী বিস্মিত বা বিচলিত হলেন না। তাঁর মনে হ'ল যা ঘটা উচিত ছিল তাই ঘটল, এর মধ্যে অপ্রত্যাশিত বা বিস্ময়কর তিনি কিছু দেখ্‌তে পেলেন না। উক্ত মৎস্যব্যবসায়ী যদি এসব না করতেন, তাহলেই বরং তিনি আশ্চর্য্য হতেন। ভদ্রলোকমাত্রেই তো ভদ্রতা করবে, এতে আশ্চর্য্য হবার কি আছে!

সুলোচনা কিন্তু ঈষৎ অপ্রতিভ হয়ে পড়েছিলেন।

—চার—

কোলকাতা থেকে ফিরে আসবার প্রায় মাস ছয়েক পরে একদিন নীলমণিবাবু প্রতিবেশী মহাদেববাবুর গাভীটির সেবা করছিলেন, নিজের হাতেই ঘাস দিচ্ছিলেন তাকে। কারণ মহাদেববাবু আসন্নপ্রসবা গাভীটিকে তাঁর কাছে রেখে নিশ্চিন্তমনে তীর্থ-ভ্রমণে বেরিয়েছিলেন। এমন সময়ে জন দুই কনেষ্টবল সঙ্গে নিয়ে থানার নূতন দারোগাটি এসে হাজির হলেন।

বললেন, "দিন সাতেক আগে দুটি ভদ্রলোক কি আপনার বাড়িতে এসে আশ্রয় নিয়েছিলেন ?"

"হ্যাঁ। কেন বলুন তো। খদ্দরধারী দুটি ছোকরা—"

"তারা পলিটিকাল আসামী। আপনাকে আমার সঙ্গে থানায় যেতে হবে—"

"চলুন—"

হাত ধুয়ে তিনি পুলিশদের অনুগমন করলেন। আর ফিরলেন না। বিচারে তাঁর জেল হ'ল এবং জেলে মৃত্যুও হল।



—পাঁচ—

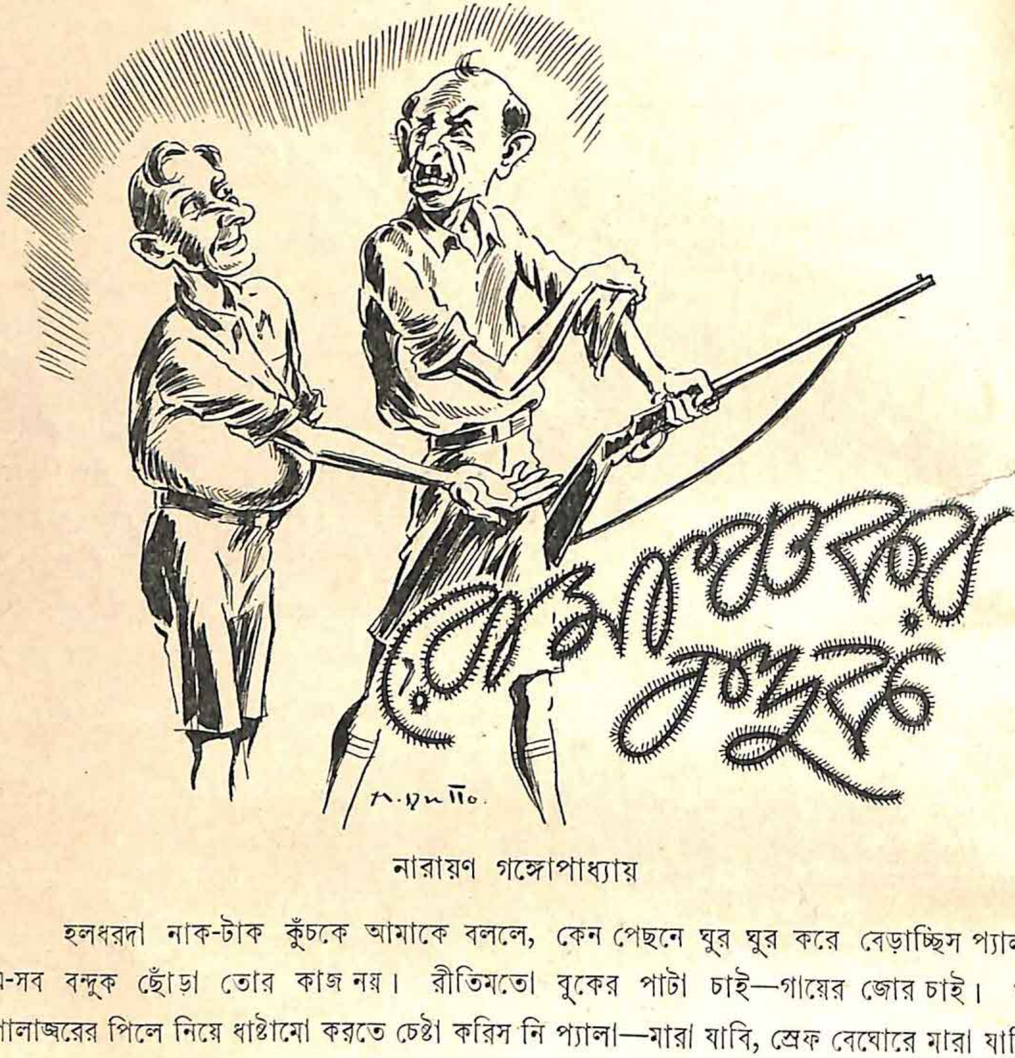
পাঁচ বছর পরে বিধবা সুলোচনা এই নিয়ে দুঃখ করছিলেন তাঁর বোনের কাছে।

"চিরকালটা ভাই ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়িয়ে গেছেন। কত মানা করতাম, কিন্তু আমার কথা কানে তুলতেন না। কোথা থেকে যে অচেনা দুটো লোক এল! আর বাড়িতে কোন লোক এলে তো ওঁর জ্ঞান থাকত না, একেবারে অস্থির হয়ে উঠতেন। কত মানা করতাম আমি। এখন হাতে পয়সা নেই, জগুরও চাকরি হয় নি—"

হঠাৎ জগন্নাথ উত্তেজিত হ'য়ে এসে ঢুকল।

"মা আমার চাকরি হয়ে গেল। অনেক ভালো ভালো ক্যাণ্ডিডেট ছিল। কিন্তু আমারই হয়ে গেল। কি করে' হ'ল জান? সেই যে দুটি লোক একবার আমাদের বাড়িতে এসেছিল যার জন্যে বাবাকে পুলিশে ধরে নিয়ে যায়, তাদেরই একজন মিনিষ্টার এখন। আমার পরিচয় শুনে বললেন—ও তুমি নীলমণিবাবুর ছেলে! তোমাকে নিশ্চয়ই নেব। তোমার বাবা সেদিন রাত্রে আশ্রয় না দিলে হয়তো ফাঁসিই হয়ে যেত আমার। বস, বস—। খুব আদর যত্ন করলেন। তারপর বললেন তুমি নিশ্চিন্ত হয়ে বাড়ি যাও, তোমার চাকরি হয়ে যাবে।

সুলোচনা অবাক্ হয়ে চেয়ে রইলেন। তারপর আঁচলে মুখ ঢেকে কাঁদতে লাগলেন।



হলধরের বন্দুক

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়

হলধরদা নাক-টাক কুঁচকে আমাকে বললে, কেন পেছনে ঘুর ঘুর করে বেড়াচ্ছিস প্যালা! এ-সব বন্দুক ছোঁড়া তোর কাজ নয়। রীতিমতো বুকের পাটা চাই—গায়ের জোর চাই। ওই পালাজ্বরের পিলে নিয়ে ধাষ্টামো করতে চেষ্টা করিস নি প্যালা—মারা যাবি, স্রেফ বেঘোরে মারা যাবি।

হলধরদার লেকচার শুনে আমার গা জ্বলে গেল। ঈস্—নিজে কী একখানা গামা পালোয়ান রে। রোগা ডিগ্ডিগে শরীর—ঘাড়টা সব সময়ে ঝুঁকে রয়েছে সামনের দিকে। সম্পত্তির মধ্যে খরগোসের মতো দুটো খাড়া খাড়া কান—তাদের একটার ওপর আবার জড়ুল—যেন মাছি বসে আছে। গলায় সর্বজ্বরহর মাদুলি দুলছে, সেটার রং কালো—মনে হয় একটা পকেট ডিক্শনারী ঝুলিয়ে রেখেছে। আমার তো তবু পালাজ্বর—ম্যালেরিয়া জ্বর, ডেঙ্গু জ্বর, কালা জ্বর—কী নেই হলধরদার?

ইচ্ছে করলে আমি হলধরদাকে এক্ষুণি ল্যাং মেরে ফেলে দিতে পারি। নিশ্চয়ই পারি। কিন্তু তা বলে হলধরদার বন্দুকটা আর হাতে পাওয়া যাবে না। কাজেই গায়ের ঝাল গায়ে রেখে

বললাম, সে তো বটেই। তোমার মতো জোয়ান লোকের হাতেই তো বন্দুক মানায়। রোজ সকালে তুমি পাঁচশো করে ডন-বৈঠক দাও, আধসের করে ছোলা খাও—তোমার নাম শুনলে ভীম-ভবানী পর্যন্ত দৌড়ে পালায়···

শুনে, হলধরদা কিছুক্ষণ কট্‌কট্‌ করে আমার দিকে চেয়ে রইল।

—ইয়ার্কি দিচ্ছিস নাকি?

বললাম, সর্বনাশ, একে তুমি সাক্ষাৎ হলধরদা—তায় তোমার হাতে বন্দুক। তোমার সঙ্গে ইয়ার্কি দিয়ে আমি কি শেষে পৈতৃক প্রাণটি খোয়াব?

হলধরদা বললে, হুঁ। – তারপর হন্‌হন্‌ করে তালবাগানের দিকে হাঁটতে সুরু করে দিলে।

আমিও সঙ্গ ছাড়ি না। গুটি গুটি পায়ে পেছনে চলেছি তো চলেইছি। একটা বন্দুক কিনে কী ডাটই হয়েছে হলধরদার—আমাদের আর মানুষ বলেই গ্রাহ্য করে না। অথচ লোকটা কী অকৃতজ্ঞ দ্যাখো একবার। এই সেদিনও ঠাকুরমার ঘর থেকে আমসত্ত্ব আর আচার চুরি করে এনে ওকে খাইয়েছি, কথা ছিল বন্দুক কিনলেই আমাকে একবার ছুঁড়তে দেবে। কিন্তু নাকটাকে এখন সোজা আকাশের দিকে তুলে হাঁটছে—আমাদের যেন চিনতেই পারছে না!

হলধরদা পেছন ফিরে তাকালো।

—ওকি, আবার সঙ্গে আসছিস যে?

আমি কান চুলকে বললাম, না—না, এম্‌নিই। মানে, তুমি যখন পাখি-টাখি মারবে, তখন সেগুলো বয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্যে একজন লোক চাই তো! সেই জন্যেই সঙ্গে যাচ্ছি।

—গোলমাল করবি না?

—না।

—পাখি উড়িয়ে দিবি না?

—রামচন্দ্র! পাখি ওড়ালে তুমি আমার কান উড়িয়ে দিয়ো।

—শিকারের ভাগ চাইবি নাকি?

—ছিঃ—ছিঃ! তুমি পাখি মারবে—তাই দেখেই আমার স্বর্গীয় আনন্দ। তুচ্ছ ভাগের কথা কেন তুলছ হলধরদা? মনে মনে বললাম, তুমি যা পাখি মারবে সে তো আমি জানিই! সব বাসায় গিয়ে মরে থাকবে!

হলধরদার বোধহয় এতক্ষণে আমার ওপর একটুখানি করুণা হল।

—ইয়ে, কথাটা কি জানিস? ছেলে তুই নেহাৎ খারাপ নোস্—সে আমি জানি। একবার তোকে বন্দুক ছুঁড়তে দিতেও আমার আপত্তি ছিল না। কিন্তু তোর তো ওই পালাজ্বরের পিলে—হঠাৎ ধাক্কা খেয়ে যদি উড়ে যাস্—

—কিসের ধাক্কা ? কোথায় উড়ে যাব ?

—এঃ, তুই একটা পাগল। কিচ্ছু জানিস নে। বন্দুক ছোঁড়বার সময় পেছন দিকে একটা ভয়ঙ্কর ধাক্কা লাগে। সে ধাক্কায় যারা রোগা-পটকা তারা যে কে কোথায় ছিটকে পড়ে কেউ বলতে পারে না !—বলে ডিগ্‌ডিগে পালোয়ান হলধরদা সগর্বে নিজের বন্দুকের দিকে তাকালো।

—তাই নাকি ?

—হেঁ—হেঁ—তবে আর বলছি কি! সেবার গোয়ালন্দে—বুঝলি, একটা রোগা-পটকা সায়েব বন্দুক নিয়ে চখাচখি মারতে গিয়েছিল। যেই 'গ্রাম্‌' করে গুলি ছুঁড়েছে, তার পরেই কী হল বল্‌তো ?

—তুমিই বলো। আমি তো কখনো গোয়ালন্দে যাই নি।

—যাস্‌নি ? তা হলে তোর বেঁচে থাকাই মিথ্যে। ঢাকার ইষ্টিমারও দেখিস্‌ নি ? সে এক পেল্লায় ব্যাপার। তোদের কলকাতার চাঁদপাল ঘাটের জাহাজগুলো তার কাছে একেবারেই তুচ্ছ !

—তা হোক তুচ্ছ !—আমি অধৈর্য হয়ে বললাম, 'গ্রাম্‌' করে গুলি ছোড়ার পরে কী হলো তাই বলো।

—হ্যাঁ—হ্যাঁ—তাই বলছি। গুলি ছুঁড়েছে, ধোঁয়া বেরিয়েছে—সবই হয়েছে। কিন্তু সায়েবের আর পাত্তা নেই। বন্দুক-টুপি, সব পড়ে রয়েছে, শুধু সায়েবই নেই। নেই তো নেই—কোথাও নেই। একেবারে বেমালুম ভ্যানিশ্‌ !

—ভ্যানিশ্‌ ! নিজের গুলিতে নিজেই উড়ে গেল বুঝি ?

—যায়না—কেন বাজে বকছিস্‌ ? সায়েব তো নেই। চারদিকে হৈ চৈ। থানা, পুলিশ, টেলিগ্রাম, ফৌজ—সে এক কাণ্ড ! ওদিকে মেম সাহেবের ঘন ঘন ফিট হচ্ছে। শেষে সেই সায়েবের পাত্তা পাওয়া গেল পদ্মার ওপারে। বালুচরের ওপর দাঁত-কপাটি লেগে পড়ে রয়েছে। তিন দিন পরে তার জ্ঞান আসে। বন্দুকের এক ধাক্কাতেই পদ্মা পেরিয়ে গেল—নৌকোয় চড়লে না, ষ্টীমারে চড়লে না—কিচ্ছু না ? এরই নাম বন্দুক ছোড়া—বুঝলি ?—বলে হলধরদা আমার মুখের দিকে তাকালো, খাড়া খাড়া কান দুটো পর্যন্ত নড়ে উঠল তার।

ঈস্‌—কী বোম্বাই চালটাই দিলে ! বলতেও যাচ্ছিলাম সে-কথা, কিন্তু বুদ্ধি করে সামলে নিলাম। খামাখা চটিয়ে লাভ কী ? বন্দুকটা একবার হাতে পাওয়ার আশা এখনো ছাড়ি নি।

হলধরদা বললে, নেঃ—রাস্তার মধ্যে এখন আর বকিসনি। সঙ্গে যাবি তো চল্‌। কিন্তু আগেই সাবধান করে দিচ্ছি—যদি পাখি উড়িয়ে দিস্‌—

—তাহলে বন্দুকের ঘায়ে আমাকে শুদ্ধ উড়িয়ে দিয়ো—আমিই বলে দিলাম শেষটা।

আমবাগানের মধ্যে দিয়ে টিপি টিপি পায়ে দুজনে চলেছি। বন্দুক বাগিয়ে হলধরদা পাখি খুঁজছে। আর আমি যথাসাধ্য ওকে সাহায্য করতে চেষ্টা করছি।

হঠাৎ আমি আনন্দে চেঁচিয়ে উঠলাম : হলধরদা, ওই যে একজোড়া ঘুঘু।

—কই, কোথায় ?—বলে আরো চেঁচিয়ে উঠল হলধরদা।

ব্যস্—আর দেখতে হলনা। সেই চিৎকারেই ঘুঘু দুটো উড়ে পালালো। হলধরদা রুখে দাঁড়ালো আমার দিকে।

—চ্যাচালি যে ?

—চ্যাচালাম কই ? তোমাকে তো পাখি দেখালাম।

—তাই বলে চ্যাচাবি ? অমন গাধার মতো ডাক ছাড়বি ?

—বাঃ রে, তুমিও তো ষাঁড়ের মতো চেঁচিয়ে উঠলে। তাই তো পালিয়ে গেল।

—এঃ—ভারী ভুল হয়ে গেছে !—হলধরদা টাকটা চুলকে নিলে : তোরই দোষ। তুই চেঁচিয়ে উঠেই আমাকে এমন ভেবড়ে দিলি যে কেমন সব গোলমাল হয়ে গেল। শোন—এর পরে পাখি দেখলে আর চ্যাচাবিনে।

—তবে কী করব ?

—এই, একটা খোঁচা টোঁচা, কিংবা একটা চিম্‌টি—বুঝেছিস তো ?

বিলক্ষণ ! এ বুঝতে আর বাকী থাকে ! আমি পটলডাঙার প্যালারাম চিম্‌টি কাকে বলে তা ভালোই বুঝি। সানন্দে মাথা নাড়লাম।

আরো খানিকটা এগিয়ে হলধরদা বললেন : এঃ, আবার ভুল হয়ে যাচ্ছে। এ-ভাবে তো হাঁটা চলবে না। হামাগুড়ি দিয়ে যেতে হবে।

—বলো কি ! চারদিকে কাঁটা, বিছুটি—তার মধ্যে হামাগুড়ি দিতে হবে ?

—তুই শিকার করতে এসেছিস না মোগলাই পরোটা খেতে এসেছিস ?—হলধরদা ভেংচি কাটল : অত আরাম চলবে না। নে—হামা দে। এইটেই নিয়ম। আমি অনেক শিকারীকে হামাগুড়ি দিয়ে যেতে দেখেছি।

—শিকার সামনে না থাকলেও হামা দিতে হবে ?

—হ্যাঁ, দিতে হবে। বেশি বকিস্‌নি প্যালা, যা বলছি তাই কর্।

ইঃ—এ আবার কী ফ্যাচাং রে বাপু ! আর সেই আমবাগানে হামা দেওয়া কি চারটিখানি কথা। তিন হাত না যেতেই হাঁটুর ছাল যাবার জো। উঠে পড়া দরকার কিনা ভাবছি, তার আগেই লাফিয়ে উঠল হলধরদা : উরেঃ বাপ—গেছি গেছি।

বলে বন্দুকটা নামিয়ে প্রাণপণে পা চুলকোতে লাগল।

—কী হল ?

—বিছুটি। ইস্—কী জ্বলছে রে!—দাঁতমুখ খিঁচিয়ে এমনভাবে পা চুলকে চলল যে মনে হল ছাল-টাল সব তুলে ফেলবে।

—তা হলে আর হামা দিয়ে দরকার নেই বোধহয়?—আমি জানতে চাইলাম।

—না—না—না!—হলধরদা মুখ শিঁটকে বললে, ও-সব আনাড়ী শিকারীর জন্যে। ভাল শিকারীরা বুক চিতিয়েই হাঁটে।—বলে বন্দুক তুলে নিয়ে হাঁটতে শুরু করলে। অবশ্য সবটা বুক চিতিয়ে নয়, মাঝে মাঝে থেমে দাঁড়িয়ে পা চুলকে নিতে হচ্ছিল।

একটু পরেই সামনে একটা জলা। সেই জলার দিকে যেই আমার চোখ পড়েছে, অম্নি আমি হলধরদার পিঠে কটাং করে চিম্‌টি দিয়েছি একটা।

—উরেঃ বাপস্—বলে হলধরদা লাফিয়ে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে জলা থেকে তিনটে পাখি উড়ে পালালো একসঙ্গে।

চোখ পাকিয়ে হলধরদা আমাকে বললে, এটা কী হল—অ্যাঁ? বলি, এটা কী হল?

কেন—কী করেছি?—গো-বেচারার মতো আমি জানতে চাইলাম।

—কী করেছি?—হলধরদা দাঁত খিঁচিয়ে বললে, অমন করে রাম চিম্‌টি দিলি যে? পিঠের মাংস প্রায় তুলে নিয়েছিস এক খাব্‌লা। উঃ—উঃস্-স্-স্! একে পায়ের জ্বলুনিতে মরছি, তার ওপরে—

বললাম, আমার কী দোষ? পাখি দেখলে তুমি চিম্‌টি দিতে বলেছিলে। আমি দেখলাম, জলায় তিনটে জলপিপি বসে আছে—

—তাই বলে অত জোরে চিম্‌টি কাটবি?

—আচ্ছা, এবার থেকে আস্তে কাটব।

—থাক, হয়েছে। চিমটি কেটে আর দরকার নেই। এবার একটা ধাক্কা দিবি—বুঝেছিস তো?

—বুঝেছি।

জলা পার হয়ে একটা জাম-জারুল-গামারের বন। চারদিকে ছায়া-ছায়া ঠাণ্ডা। সেখানে ঢুকেই হলধরদা দেখি সোজা মাথার ওপর বন্দুক তাগ করছে।

—পাখি পেলে বুঝি?—আমি চেঁচাতে যাচ্ছিলাম, হলধরদা আরো জোরে চেঁচিয়ে বললে, চুপ কর, বলছি! গাছের ওপরে দুটো লাল পাখি দেখা যাচ্ছে।

লাল পাখি দুটো ভালো—এত চেঁচানোতেও পালালো না। তাকিয়ে দেখে আমার কেমন সন্দেহ হল। সে কথা বলতেও যাচ্ছি, এমন সময়ঃ ক্রুম্—ধ্রাস্!

ক্রুম্ হল বন্দুক—আর ধ্রাস্ হল হলধরদা। অর্থাৎ গুলি ছুঁড়েই কুঁদোর ঘা খেয়ে পড়ে গেল মাটিতে।

—এঃ—এঃ—

কিন্তু তার আগেই লাল পাখি দুটো পড়েছে। একটা আমার নাকে—আর একটা হলধরদার টাকে। টিপ্ আছে হলধরদার।

কিন্তু রাম-রাম কী বিচ্ছিরি পাখি! পড়েই ফটাস করে ফাটল। কী সব বদগন্ধওলা কালো কলো জিনিস আমার নাকে মুখে ঢুকে গেল, আর হলধরদার টাকের যে কী বাহার খুলল সে আর কী বলব!

পাখি নয়—দুটো টুকটুকে পাকা মাকাল। গাছের অনেক ওপরে ভালো করে দেখা যাচ্ছিল না, তাই—খানিকক্ষণ আমরা দুজনেই চুপচাপ! আমি শোকে মুহ্যমান—আর হলধরদা কাঁকাল চেপে ধরে বসে আছে—টাকটা পর্যন্ত মুছতে পারছে না। হলধরদার বন্দুকই ওঁকে একখানা মোক্ষম কুঁদোর ঘা বসিয়েছে।

প্রায় পাঁচ মিনিট পরে হলধরদা উঠে দাঁড়াল। অবস্থা দেখে দয়া হল আমার। কয়েকটা শুকনো পাতা দিয়ে টাকটা সাফ করে দিলাম।

—যাত্রাটাই খারাপ। না হলধরদা? দুটো মাকাল শিকার করলে, তার ওপরে কুঁদের ঘা! ভাগ্যিস্ ধাক্কাটা ওপর দিক থেকে এসেছিল, নইলে এতক্ষণে হয়তো তোমাকেও গঙ্গার ওপারে নিয়ে ফেলত।

এত করে যে টাক পরিষ্কার করে দিলাম, তার কোনো কৃতজ্ঞতা আছে নাকি? হলধরদা যাচ্ছে তাই রকমের ভেংচি কেটে বললে, থাম, থাম, ওস্তাদি করিসনি। তুই-ই তো গোলমাল করে দিলি—তাইতেই বেসামাল্ হয়ে কোমরে কুঁদোর ঘা লেগে গেল। কিন্তু হাতের টিপ দেখেছিস তো? মাকাল দুটোকে ঠিক নামিয়েছি!

—তা নামিয়েছ। আর পড়েওছে ঠিক তাক মাফিক। আমার নাকে আর তোমার টাকে।

—খুব হয়েছে। চল্ এখন। পাখি না মেরে আজ কিছুতেই ফিরছি না।—তারপর আমার দিকে তাকিয়ে বাহাদুরীর হাসি হাসল : আরে, আমি কি আর জানিনে যে ওদুটো মাকাল? হাতের টিপ কি রকম, সেইটেই দেখিয়ে দিলাম তোকে।

আমার নাকটা ব্যথা করছিল। ক্ষুণ্ণ হয়ে বললাম, তা বটে, তা বটে।

আবার খানিক দূর এগোতেই আমি দেখতে পেলাম—একটা ঘাসঝোপের পাশে এক জোড়া পাখি চরছে। তিতির নির্ঘাৎ তিতির।

আর তখুনি ধাক্কা দিলাম হলধরদাকে।

কিন্তু হলধরদা যে এমন পল্‌কা তা কে জানত! ধাক্কা খেয়েই বোঁ করে সামনের দিকে ছুটল। তিতির টিতির সব টপকে একেবারে ঘাস ঝোপটায় গিয়ে হুমড়ি খেয়ে পড়ল।

উঠে দাঁড়িয়েই হলধরদা চেরা গলায় সিংহনাদ করলে, প্যালা।

আমি তখন কাছে এগিয়ে এসেছি। বললাম, কী আদেশ সেনাপতি!

—থাম্, আর মশকরা করতে হবে না। কী আক্কেলে অমন করে ধাক্কা দিলি ইস্টুপিড্ কোথাকার?

—বাঃ, তুমিই তো পাখি দেখলে ধাক্কা দিতে বলেছিলে। আমি দেখলাম এক জোড়া তিতির—

—তাই আমাকে ভেবেছিলি বুঝি গুল্‌তির গুলি? ভেবেছিলি, একেবারে সোজা ঠেলে পাখির গায়ে ফেলে দিবি? ইস্টুপিড্-গাধা! তোকে সঙ্গে এনেই ভুল হয়েছে। চলে যা এখান থেকে, আমি আর তোর মুখদর্শনও করতে চাইনে।

—এবার মাপ করো হলধরদা।—আমি হাত যোড় করলাম।

—আর চ্যাঁচাবি না?

—না।

—আর চিম্‌টি কাটবি না?

— কক্ষনো না।

—পাঞ্জাব মেলের এঞ্জিনের মতো পেছন থেকে ধাক্কা দিবি না?

—ছিঃ—ছিঃ—আবার!

—বেশ, কথা রইল। শুধু সঙ্গে থাকবি—আর কিছু করতে হবেনা।

—একেবারে কিছুই না?

—না-না।—হলধরদা চেঁচিয়ে উঠল: এক নম্বরের ভণ্ডুলরাম তুই। যা বলব, ঠিক উল্‌টোটি করে বসে থাকবি। তোকে কিছু করতে হবে না শুধু পাখি পড়লেই কুড়িয়ে নিবি।

—আচ্ছা, আচ্ছা, তাই হবে—মাথা নেড়ে আমি সম্মতি জানিয়ে দিলাম।

হাঁটতে হাঁটতে নদীর ধারে।

এতক্ষণে শিকার কিছু হয়নি। সত্যি বলছি, আমি চেঁচাইনি, কিচ্ছু করিনি—একেবারে মুখ বুজে পেছনে পেছনে চলে এসেছি। তবু হতচ্ছাড়া পাখিগুলো যে কী করে টের পেয়েছে, ওরাই জানে। আমাদের দেখার সঙ্গে সঙ্গেই হাওয়া। একটা ডাহুক একটু সময় দিয়েছিল, কিন্তু হলধরদা 'ওই যে ওই যে' বলে লাফিয়ে ওঠায় সেটা পালিয়ে গেল।

হলধরদা বলছিল, যখন তুই সঙ্গে এসেছিস, তখনই জানি আজকের শিকারের নামে লবডঙ্কা।

আমি বলেছিলাম, একবার আমার হাতে যদি বন্দুকটা দিতে—

—ইঃ, আচ্ছা দ্যাখো না? আমার মতো বড় শিকারীই জেরবার হয়ে গেল আর এই পুঁটিরাম এসেছেন শিকার করতে!—হলধরদা একেবারে দমিয়ে দিয়েছিল আমাকে।

শেষে এসে গেলাম নদীর ধারে।

হলধরদা নিজেই দেখল এবার জলের ধারে এক জোড়া বক।

—বক মারব প্যালা ?

—বক মেরে কী হবে ? কেউ তো খায় না।

—আরে, পালক ছাড়িয়ে নিয়ে গেলে বকও যা, বুনো হাঁসও তাই। না হয়, তোকেই দিয়ে দেব।

আহা, কী দয়ারে ! আমাকে বক দেখাচ্ছেন। দু-একটা ঘুঘু হরিয়াল মেরে দিলেও নয়, বোঝা যেত, বক দান করে আর দরকার নেই।



আমি ব্যাজার হয়ে বললাম, আচ্ছা, আচ্ছা, বকের ব্যবস্থা পরে হবে। আগে মারো তো দেখি।

—আরে, মারা আর শক্ত কী ! ওরা তো মরেই রয়েছে !—বলে হলধরদা বললে, আমার কোমরটা জাপ্‌টে ধর দেখি প্যালা।

—আবার কোমর জাপ্‌টাব কেন ?

—বলা তো যায় না—বন্দুকের মর্জি ! এক ধাক্কায় যদি—

—তার মানে আমাকে শুদ্ধু ওড়াতে চাও ? ও সবে আমি নেই হলধরদা !—বলে আমি সরে দাঁড়ালাম।

—মাইরি প্যালা, লক্ষ্মী ভাইটি, এবারটি কথা শোন। তোর মনের ব্যথা আমি বুঝেছি। যদি একটা বকও মারতে পারি, তা হলে তোকে একবার আমি বন্দুকটা ছুঁড়তে দেব। দিব্যি গেলে বলছি—হলধরদার স্বর করুণ হয়ে এল।

—ঠিক বলছ ?

—ঠিক বলছি ।

—মা-কালীর দিব্যি ?

—মা-কালীর দিব্যি ।

আমি হলধরদার কোমর সাপ্‌টে ধরলাম, প্রাণপণে ।

হলধরদা বন্দুক বাগালো । বললেন, জয় মা রক্ষাকালী—জোড়া বক দিস্ মা—

দ্রুম্ ! তারপরেই ধপাস্ আর ঝপাস্ !

আবার মোক্ষম ঘা মেরেছে বন্দুকের কুঁদো । হলধরদা ক্যাঁক করে উঠল, তারপরে আমাকে নিয়ে সোজা ডিগবাজী খেয়ে পড়ল একেবারে নদীর মধ্যে ।

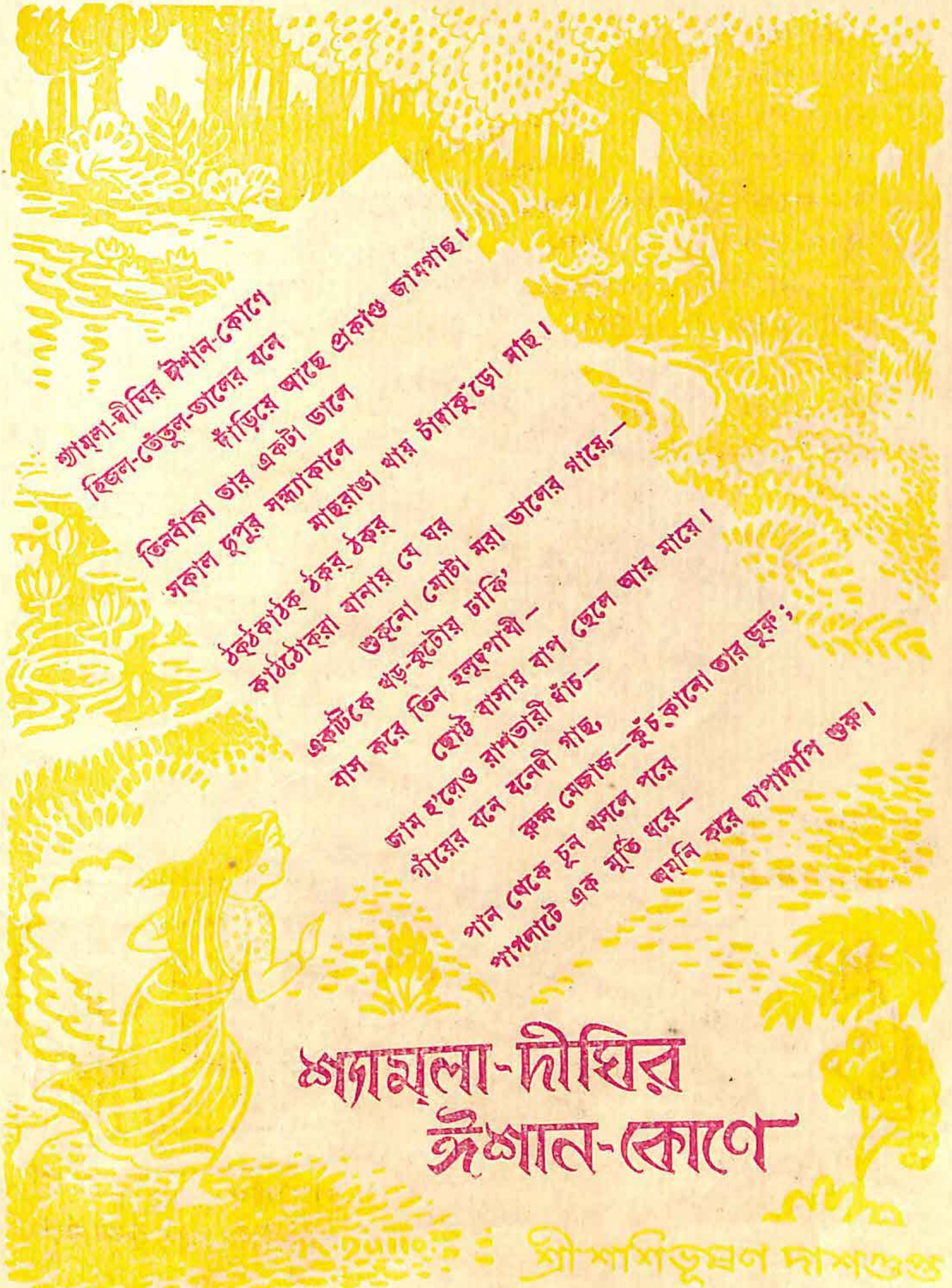
যেমন কন্‌কনে ঠাণ্ডা জল—তেম্‌নি স্রোত । প্রায় কুড়ি হাত সাঁতরে উঠতে হল ডাঙায় । আমি আবার বেশ খানিক জল গিলেও খেয়েছি, একটু হলেই মহাপ্রাণী বেরিয়ে যেত !

ডাঙায় উঠে দশ মিনিট ঠক্‌ঠক্ করে কাঁপতে লাগলাম দু'জন । তারপর এদিক্-ওদিক্ তাকিয়ে আমি বললাম, হলধরদা, তোমার বন্দুক ?

—ও হতচ্ছাড়াকে নদীতেই বিসর্জন দিলাম । উঃ, পাঁজরায় এমন লেগেছে যে সাতদিনে সে ব্যথা সারলে হয় । তার ওপর যা ঠাণ্ডা—নিমোনিয়ায় না পড়লেই বাঁচি !

মাথার ওপরে উড়ন্ত বকজোড়া ক্যাঁ-ক্যাঁ করে ডেকে উঠল ॥





শ্যামলা-দীঘির ঈশান-কোণে

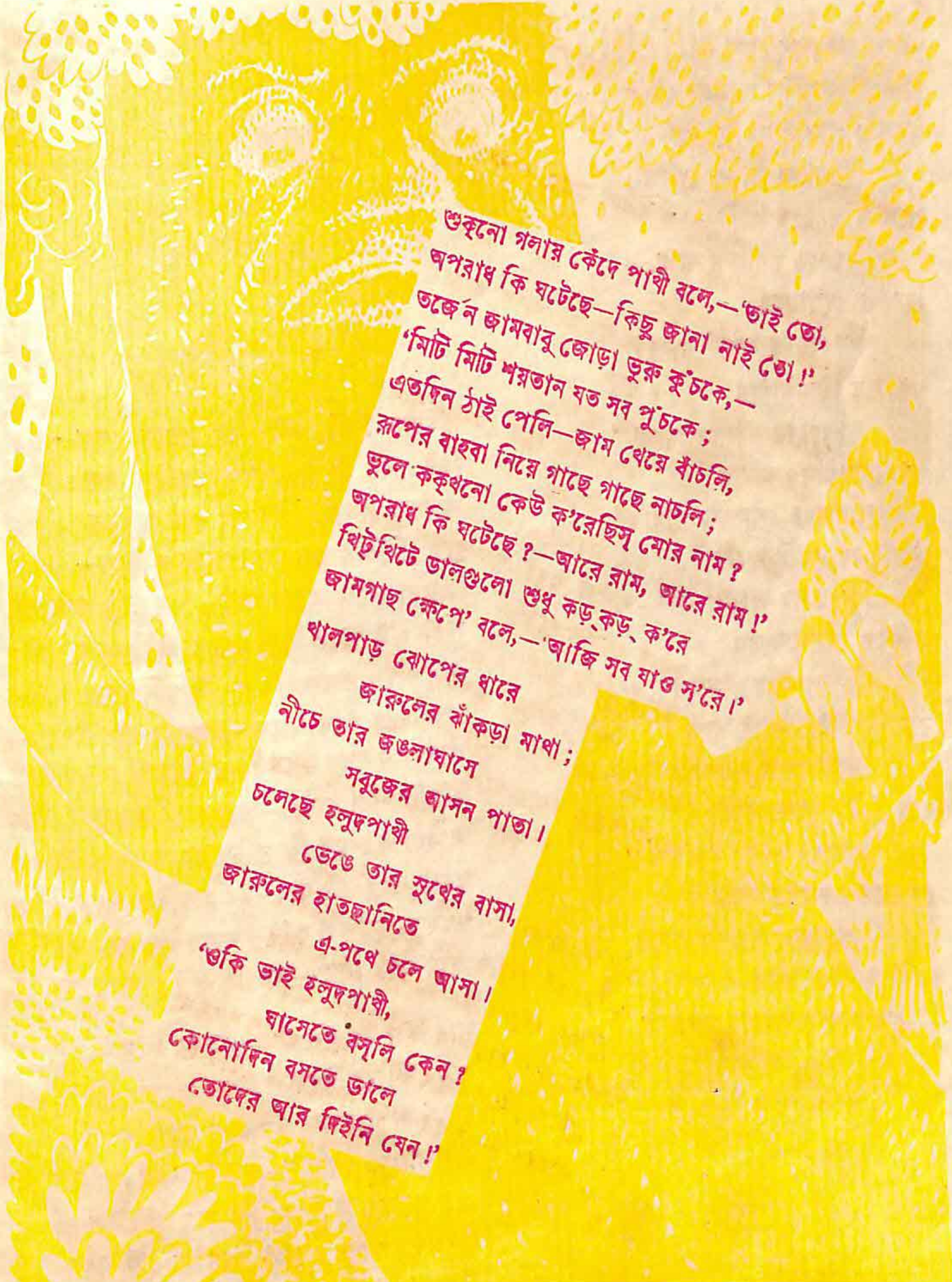
শ্রীশশিভূষণ দাশগুপ্ত

শ্যামলা-দীঘির ঈশান-কোণে
হিজল-তেঁতুল-তালের বনে
দাঁড়িয়ে আছে প্রকাণ্ড জামগাছ।
তিনবাঁকা তার একটা ডালে
সকাল দুপুর সন্ধ্যাকালে
মাছরাঙা খায় চাঁদাকুঁড়ো মাছ।
ঠক্‌ঠকাঠক্‌ ঠকর্‌ ঠকর্‌
কাঠঠোকরা বানায় যে ঘর
শুক্‌নো মোটা মরা ডালের গায়ে,—
একটিকে খড়-কুটোয় ঢাকি'
বাস করে তিন হলুদ্‌পাখী—
ছোট্ট বাসায় বাপ ছেলে আর মায়ে।
জাম হ'লেও রাশভারী ধাঁচ—
গাঁয়ের বনে বনেদী গাছ,
রুক্ষ মেজাজ—কুঁচ্‌কানো তার ভুরু;
পান থেকে চুন খসলে পরে
পাগলাটে এক মূর্তি ধরে—
অমনি করে দাপাদাপি শুরু।



মোসাহেব তার কাঠবেড়ালি
ন্যাজ ফুলিয়ে বেড়ায় খালি—
সরফরাজি সকল ডালে পাতায় ;
সুযোগ পেলে চক্ষু মুদি'
কুর্‌কুর্ কুর্ তোষামুদি—
নানান্ ঢঙে পিত্তি কেবল তাতায়।
একদিন পাঁচ কথার ছলে
গোঁফ উঁচিয়ে গাছকে বলে,—
'হলুদ্‌পাখী বড়ই নেমকহারাম ;
এই যে তাদের ঠাঁই দিয়েছ
ঝড়-ঝাপটের দায় নিয়েছ—
পাচ্ছে শুধুই সুখ-সুবিধে আরাম ;
পাঁচ গুল্লাট বেড়ায় ঘুরে'—
সেই কথাটা মিষ্টি সুরে
বলে' বেড়ায় একটা গাছের কাছে ?
ঝেঁটিয়ে দিতুম আমি হ'লে ;
এদের কাছে দয়ায় গলে'
লাভটা বল কোন্‌খানটায় আছে !'

চটলেন জামবাবু—হাঁক ডাক পাঁচটা,—
'আজকেই ভেঙে দেব ফুর্‌ফুরে নাচটা।
হেঁইরে হলুদ্‌পাখী—এক্ষুনি নেমে আয়
যদি প্রাণ বাঁচাবার এতটুকু সাধ যায়।'
কেঁপে কেঁপে নামে বাপ—কেঁপে কেঁপে নামে মা—
তাদের গা-ঘেঁষে নামে লালঠোঁটে ছোট ছা'।



শুক্‌নো গলায় কেঁদে পাখী বলে,—'তাই তো,
অপরাধ কি ঘটেছে—কিছু জানা নাই তো!'
তর্জ্জেন জামবাবু জোড়া ভুরু কুঁচকে,—
'মিটি মিটি শয়তান যত সব পুঁচকে;
এতদিন ঠাই পেলি—জাম খেয়ে বাঁচলি,
রূপের বাহবা নিয়ে গাছে গাছে নাচলি;
ভুলে কক্‌খনো কেউ ক'রেছিস্ মোর নাম?
অপরাধ কি ঘটেছে?—আরে রাম, আরে রাম!'
খিট্‌খিটে ডালগুলো শুধু কড়্‌কড়্ ক'রে
জামগাছ ক্ষেপে' বলে,—'আজি সব যাও স'রে।'

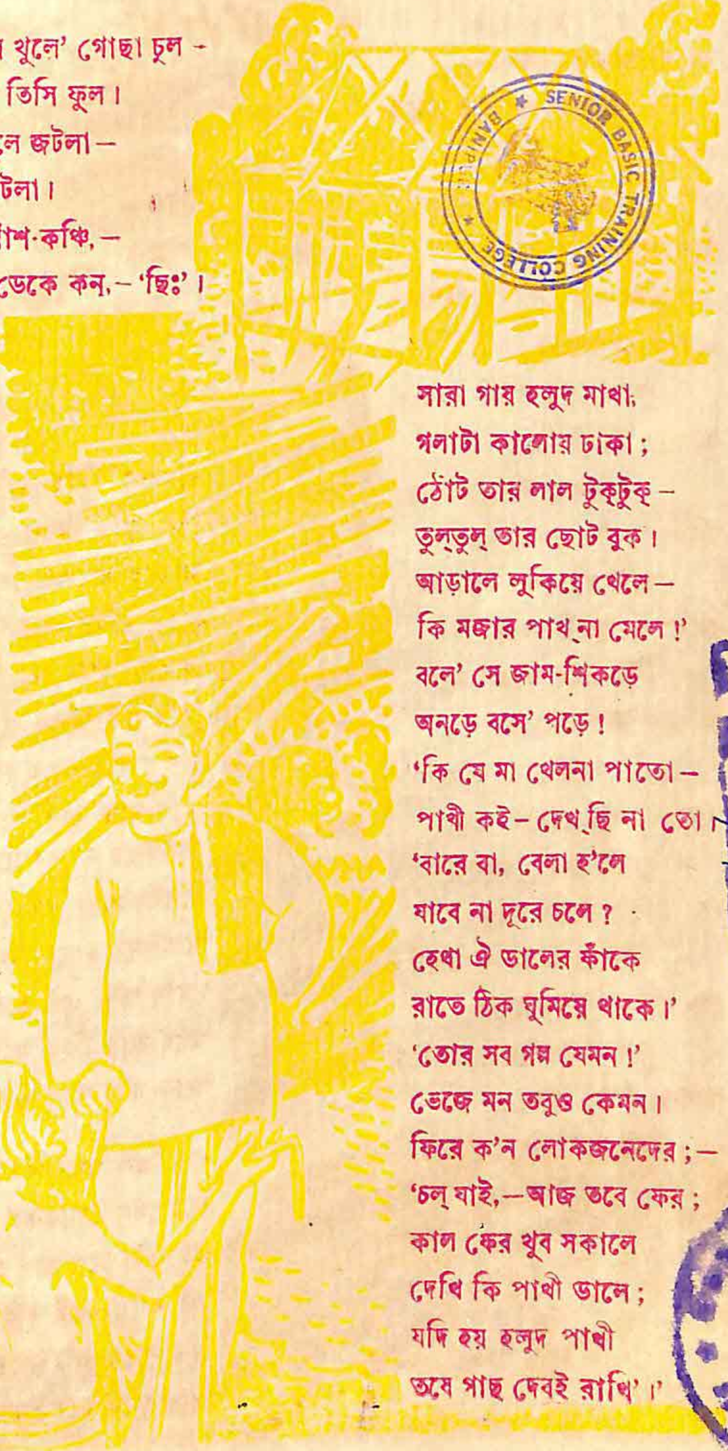
খালপাড় ঝোপের ধারে
জারুলের ঝাঁকড়া মাথা;
নীচে তার জঙলাঘাসে
সবুজের আসন পাতা।
চলেছে হলুদপাখী
ভেঙে তার সুখের বাসা,
জারুলের হাতছানিতে
এ-পথে চলে আসা।
'ওকি ভাই হলুদপাখী,
ঘাসেতে বস্‌লি কেন?
কোনোদিন বসতে ডালে
তোদের আর দিইনি যেন!'

'না না তা ব'লব কেন,—
কতদিন আসতে যেতে
ব'সেছি গান গেয়েছি
ছায়াতে আসন পেতে'।
মনে আজ দুঃখ ভারী—
ভেঙেছে মোদের বাসা,—
চলেছি দেশান্তরে
আকাশের পথটি খাসা।'
বাতাসে ঝিরঝিরিয়ে
বেদনায় কাঁপছে পাতা,
জারুলের মন ভেজাল
পাখীদের শোকের গাথা।
শুনে' সব চুপটি করে'
কি ভাবে জারুল মনে—
জড়িয়ে ডালপাতাতে
পাখীদের, সঙ্গোপনে
বলে,—'ভাই, হেথাই থাক,
ছোট মোর ডালপালাতে
হবে ঠাঁই; সুখের বাড়ি—
গরীবের কাজ কি তাতে?'
সেথানে ঝোপের ধারে
ছলোজল খালের পাড়ে
পাখীরা বাঁধল বাসা
জারুলের পাতার আড়ে।'



গদিয়ান গিরি গুঁই—ঘর তোলে মস্ত—
তিন কুড়ি টানা—আড়ে তেত্রিশ হস্ত।
আড়তে যা কাঠ ছিল সব কাঠ জুড়িয়ে
বুড়ো মিস্তিরী কয় ভাঙা পা'টা খুঁড়িয়ে—
'আরো কাঠ—আরো কাঠ—তিন কুড়ি কাঠ চাই,
গিরি গুঁই হেঁকে বলে,—'এত কাঠ কোথা পাই?
বাঁশ চাই? তাতে হবে?'—মিস্তিরি হেসে কয়,—
'বাঁশ-ঘরে হাঁস থাকে—মানুষের বাস নয়!'
'তালগাছে হ'তে পারে?—হেই মোটা বড় তাল?'
মিস্তিরি মাথা নাড়ে,—'তালকাঠে বড় শাল।'
'আমগাছে চলবে কি?'—'হ'তে পারে তক্তা—
'দোষ তার এই হবে—খুব হবে টক তা।'
'তবে আর কিবা করি,—আছে এক বড় জাম'—
'জাম কাঠ ভাল'—বলে মিস্তিরি দুইরাম।

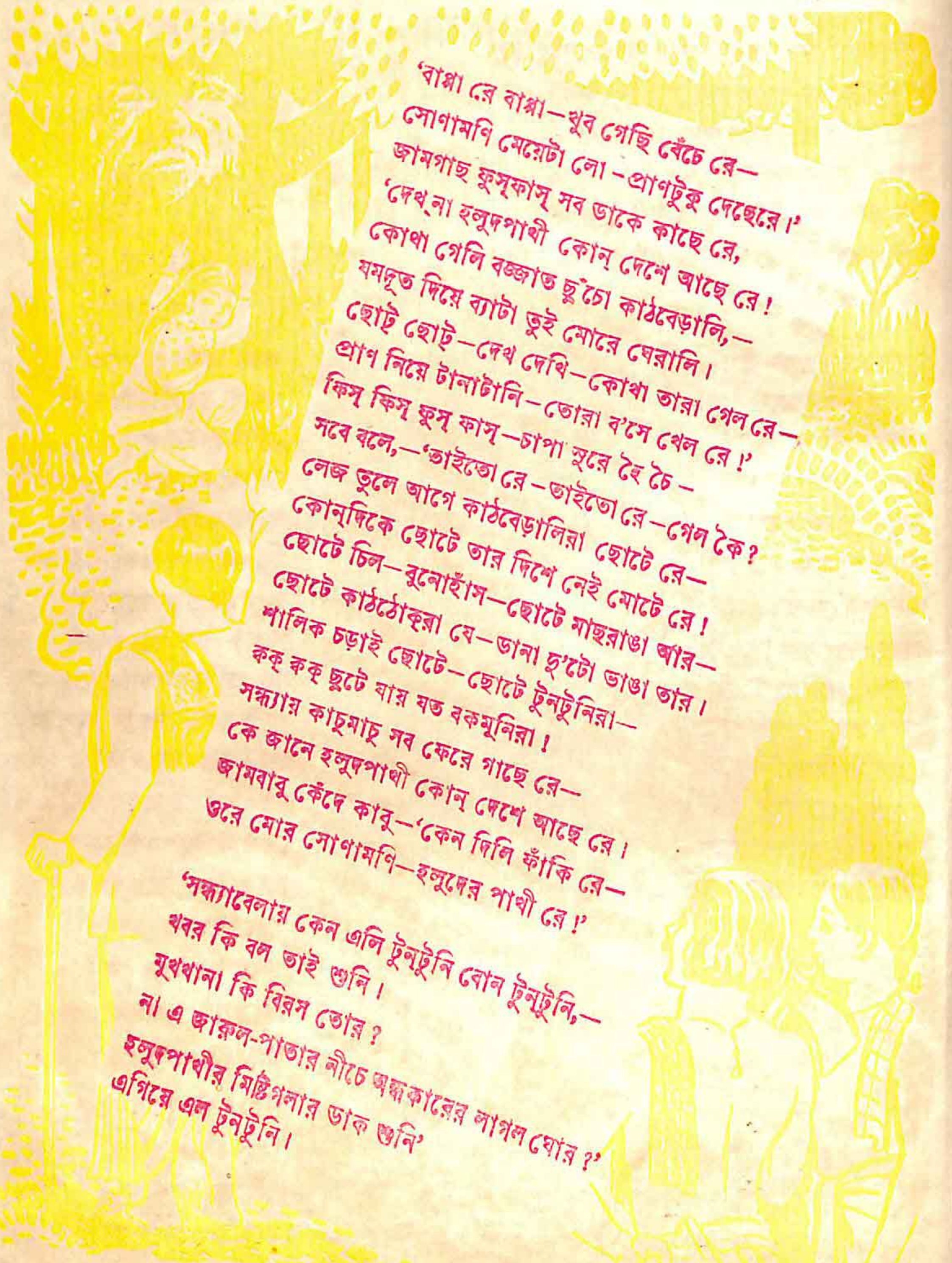
নাম ছিল 'প্রহেলিকা'—গুঁইদের কন্যে—
হয়ে গেল 'পেল্লিকা' স্বভাবের জন্যে।
জটাকটা চুলে তার চুপ্‌চুপে তেল কি?
এই আছে—এই নাই—জানে কি সে ভেল্কি?
এক পায়ে চু-উ দিতে তিনগাঁয়ে জুড়ি কৈ?
বিনে ধানে মুখে ফোটে দিনে মন কুড়ি খৈ!



ভোরবেলা দোর খুলে'—আর খুলে' গোছা চুল -
শ্যামলা দীঘির পাড়ে তুলছিল তিসি ফুল।
চেয়ে দেখে ঐ কোণে জামমূলে জটলা—
বাবা ও কুড়ুল হাতে বঙ্কু ও পটলা।
দিল ছুট—দিল ছিঁড়ে জামা বাঁশ-কঞ্চি,—
তাই দেখে গিরি গুঁই কাছে ডেকে কন,—'ছিঃ'।

মেয়ে চায় বাপের মুখে—
ধুকুধুক্ শব্দ বুকে,
'এখানে জটলা কেন ?
যমদূত পটলা যেন !'
'জামে যে তক্তা হবে,
তাতে ঘর শক্ত র'বে।'
'তা হ'লে ফেলবে কেটে ?'—
ছলো চোখ যায় কি ফেটে !
'তাতে তোর দুঃখটা কি ?'
মেয়ে কয়,—'হলুদ পাখী'—
'কেন মা দিচ্ছ ফাঁকি,—
কোথা তোর হলুদ পাখী ?'
'থাকে এই গাছের ডালে—
দেখি রোজ স্নানের কালে।

সারা গায় হলুদ মাখা,
গলাটা কালোয় ঢাকা ;
ঠোঁট তার লাল টুক্‌টুক্—
তুল্‌তুল্ তার ছোট বুক।
আড়ালে লুকিয়ে খেলে—
কি মজার পাখ্‌না মেলে !'
বলে' সে জাম-শিকড়ে
অনড়ে বসে' পড়ে !
'কি যে মা খেলনা পাতো—
পাখী কই—দেখ্‌ছি না তো।'
'বারে বা, বেলা হ'লে
যাবে না দূরে চলে ?
হেথা ঐ ডালের ফাঁকে
রাতে ঠিক ঘুমিয়ে থাকে।'
'তোর সব গল্প যেমন !'
ভেজে মন তবুও কেমন।
ফিরে ক'ন লোকজনেদের ;—
'চল্ যাই,—আজ তবে ফের ;
কাল ফের খুব সকালে
দেখি কি পাখী ডালে ;
যদি হয় হলুদ পাখী
অমে গাছ দেবই রাখি'।'



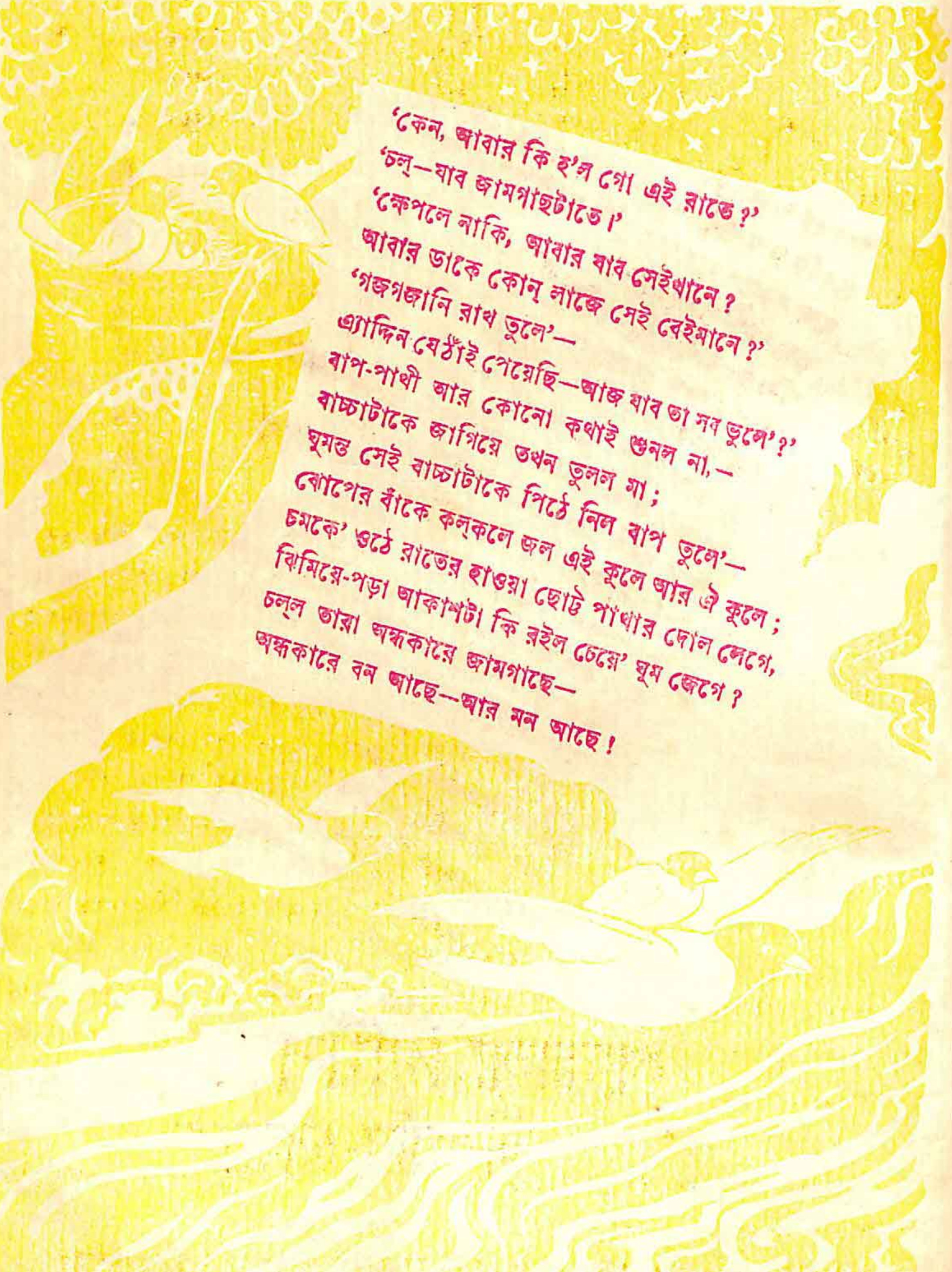
'বাপ্পা রে বাপ্পা—খুব গেছি বেঁচে রে—
সোণামণি মেয়েটা লো—প্রাণটুকু দেছেরে।'
জামগাছ ফুস্‌ফাস্‌ সব ডাকে কাছে রে,
'দেখ্‌না হলুদপাখী কোন্‌ দেশে আছে রে!
কোথা গেলি বজ্জাত ছুঁচো কাঠবেড়ালি,—
যমদূত দিয়ে ব্যাটা তুই মোরে ঘেরালি।
ছোট্ট ছোট্ট—দেখ দেখি—কোথা তারা গেল রে—
প্রাণ নিয়ে টানাটানি—তোরা ব'সে খেল রে!'
ফিস্‌ ফিস্‌ ফুস্‌ ফাস্‌—চাপা সুরে হৈ চৈ—
সবে বলে,—'তাইতো রে—তাইতো রে—গেল কৈ?
লেজ তুলে আগে কাঠবেড়ালিরা ছোটে রে—
কোন্‌দিকে ছোটে তার দিশে নেই মোটে রে!
ছোটে চিল—বুনোহাঁস—ছোটে মাছরাঙা আর—
ছোটে কাঠঠোক্‌রা যে—ডানা দু'টো ভাঙা তার।
শালিক চড়াই ছোটে—ছোটে টুনটুনিরা—
কক্‌ কক্‌ ছুটে যায় যত বকমুনিরা!
সন্ধ্যায় কাচুমাচু সব ফেরে গাছে রে—
কে জানে হলুদপাখী কোন্‌ দেশে আছে রে।
জামবাবু কেঁদে কাবু—'কেন দিলি ফাঁকি রে—
ওরে মোর সোণামণি—হলুদের পাখী রে!'

'সন্ধ্যাবেলায় কেন এলি টুনটুনি বোন টুনটুনি,—
খবর কি বল তাই শুনি।
মুখখানা কি বিরস তোর?
না এ জারুল-পাতার নীচে অন্ধকারের লাগল ঘোর?'
হলুদপাখীর মিষ্টিগলার ডাক শুনি'
এগিয়ে এল টুনটুনি।



'খবর বড় সাঙ্ঘাতিক'—
হবে কি তার নাই যে ঠিক—
আজ সকালে দলে দলে ছুটল সবাই দিক্‌-বিদিক্।'
'ওমা, এসব বলিস্ কি—
সত্যি ?—না-তুই ছলিস্ কি ?'
'খুঁজছে সবাই তোমাদের—
খবর বড় রকমফের ;
যা' করে' হোক, এই রাতে
বাপবেটা আর তোমাকে বোন—হবেই আবার ফেরাতে।
শুনে' সকল চেঁচিয়ে বলে মা-পাখী—
'কক্ষনো না,—লাঞ্ছনা আর অপমানের নেই বাকি।'
'কক্ষনো না'—চেঁচিয়ে বলে বাচ্চাটা,—
'শাস্তি হবে আচ্ছাটা।'
চুপটি থাকে একটু দূরে জারুল-ডালে বাপ-পাখী—
পালকে তার ঠোঁট ঢাকি' আর চোখ ঢাকি'।

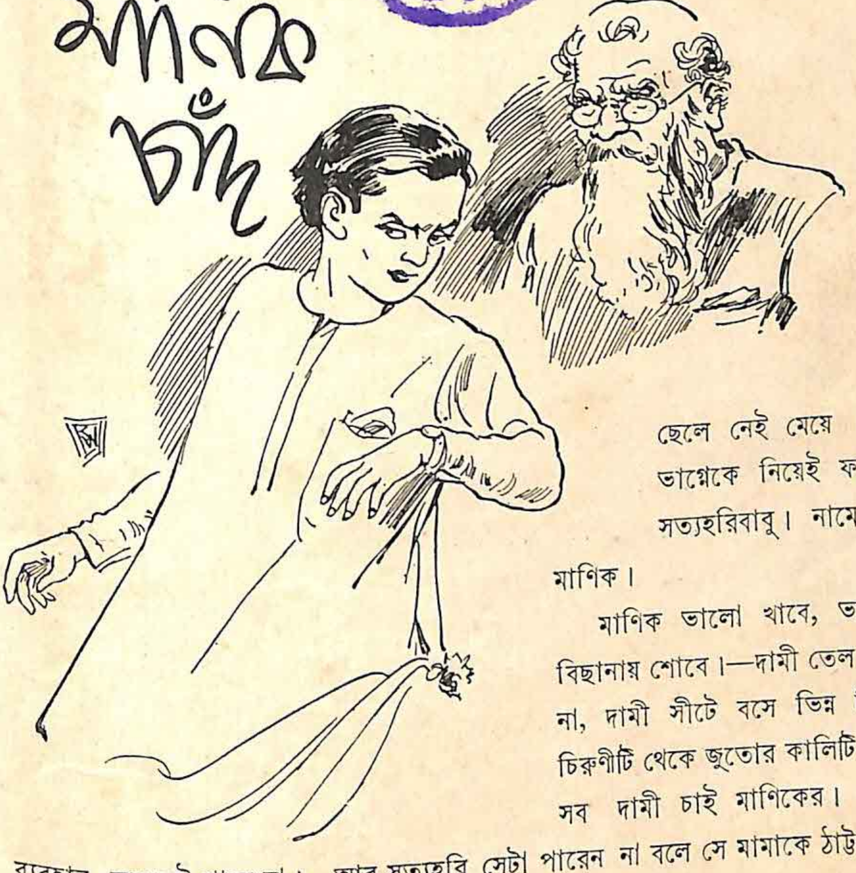
রাত যবে ঠিক দশ বাজে—
পঞ্চমী চাঁদ বিদায় নিল সব কাজে—
আকাশজোড়া ঘুমিয়ে আছে লাখ তারা—
কলকলিয়ে বইছে খালের জলধারা—
জাগল হলুদ বাপ-পাখী,
গিন্নীরে তার চুপি' চুপি' কয় ডাকি'—
'ঘুমিয়ে আছিস্—তোল্ না গা'—
বাচ্চাটাকে হেঁই জাগা।'



'কেন, আবার কি হ'ল গো এই রাত্তে ?'
'চল্—যাব জামগাছটাতে।'
'ক্ষেপলে নাকি, আবার যাব সেইখানে ?
আবার ডাকে কোন্ লাজে সেই বেইমানে ?'
'গজগজানি রাখ তুলে'—
এ্যাদ্দিন যেঠাঁই পেয়েছি—আজ যাব তা সব ভুলে'?'
বাপ-পাখী আর কোনো কথাই শুনল না,—
বাচ্চাটাকে জাগিয়ে তখন তুলল গা ;
ঘুমন্ত সেই বাচ্চাটাকে পিঠে নিল বাপ তুলে'—
ঝোপের বাঁকে কল্‌কলে জল এই কূলে আর ঐ কূলে ;
চমকে' ওঠে রাতের হাওয়া ছোট্ট পাখার দোল লেগে,
ঝিমিয়ে-পড়া আকাশটা কি রইল চেয়ে' ঘুম জেগে ?
চল্‌ল তারা অন্ধকারে জামগাছে—
অন্ধকারে বন আছে—আর মন আছে !

মানিক চাঁদ

শ্রী আশাপূর্ণা দেবী



ছেলে নেই মেয়ে নেই, কিন্তু একটা ভাগ্নেকে নিয়েই ফতুর হ'তে বসেছেন সত্যহরিবাবু। নামেও মাণিক, কাজেও মাণিক।

মাণিক ভালো খাবে, ভালো পরবে, ভালো বিছানায় শোবে।—দামী তেল ভিন্ন মাথায় মাখবে না, দামী সীটে বসে ভিন্ন সিনেমা দেখবে না। চিরুণীটি থেকে জুতোর কালিটি পর্য্যন্ত আগাগোড়া সব দামী চাই মাণিকের। সস্তা জিনিস সে ব্যবহার করতেই পারে না। আর সত্যহরি সেটা পারেন না বলে সে মামাকে ঠাট্টা করে—খরচ করো মামা, একটু খরচ করো! টাকা নিয়ে কি ধুয়ে জল খাবে?

সত্যহরি যদি বাজারে যান, মাণিক বাজারের আনাজপাতিগুলো ধরে ধরে ব্যাখান করতে বসে—বাজারে এর চাইতে পোকাটে বেগুন বুঝি আর ছিলো না মামা?…বাঃ কী ফার্ষ্ট ক্লাশ কপিটা, দেখোতো মামী, ভেতরে বোধ হয় ঘুন ধরে এসেছে!…আরে! এগুলো আলু? আমি ভাবছিলাম সুপুরি!

নিজে যদি কোনোদিন বাজারে যায় মাণিক, দশটা টাকার কমে ওর কুলোয় না। বেছে বেছে বাজারের সেরা জিনিসগুলি এনে হাজির করবে!

মামী যদি বলেন—এতো মাছ কে খাবে রে মান্‌কে? এই তো তিনটে মানুষের সংসার!

মাণিক গম্ভীরভাবে উত্তর দেয়—কার সংসারে কটা লোক সে তো কারুর গায়ে লেখা থাকে না মামী! হাতে করে এক পো আধসের মাছ কিনবো কোন্ লজ্জায়?… সে পারে মামা! যেমন বেশভূষা করে যায়।… ফতুয়া গায়ে দিয়ে বাজারে গেলে এক পো মাছ কেনা চলে।…

মামী রাগ করে বলেন—তা ওর তো আর তোমার মতো পরের পয়সায় নবাবী নয়!

মাণিক বলে—পরের পয়সা নিজের পয়সা বুঝি না মামী! পয়সা হচ্ছে খরচ করবার জিনিস, এইটাই বুঝি।…মামা এমন করে রাস্তায় বেরোয় 'মামা' বলে পরিচয় দিতে লজ্জা করে।

সত্যহরির গিন্নীটি তা বলে সত্যহরির মতো ভালো মানুষ নন, বেশ একটু দজ্জাল গোছের। তিনি চটে উঠে বলেন—না বললেই পারিস? কে তোকে সেধেছে—'মামা' বলে পরিচয় দিতে?

—বাঃ! বেড়ে!…মাণিক শ্লেষের হাসি হেসে বলে—এমন নইলে বুদ্ধি! পরিচয় দেবো না তো শুধু আমার মুখখানি দেখে দোকানে পসারে কে আমাকে অম্নি মাল ছাড়বে শুনি?

মামী শুনে আরো জ্বলে ওঠেন। চীৎকার করে বলেন—ওরে বোম্বেটে শয়তান! মামার নাম ভাঙিয়ে বাজারে ধার করে বেড়াও তুমি?

—ধার! ধার করে বেড়াই?—মাণিক যেন রীতিমত অপমানিত হয়েছে, এইভাবে বলে—ধার করে বেড়াবে এমন হুজুতে ছেলে মাণিকচাঁদ নয়, বুঝলে মামী? ধার করে ছোটলোকে। দস্তুরমতো স্লিপ্ লিখে দোকানে জমা দিয়ে, তবে জিনিষ নিই! ওই জন্যেই অল্‌ওয়েজ মামার লেটার হেড্—মানে আর কি—মামার নাম ঠিকানা ছাপা ওই চিঠির কাগজ দু পাঁচখানা, পকেটে রাখি। লণ্ড্রীতে, দর্জির দোকানে, স্টেশনরি শপে, রেষ্টুরেন্টে কোথায় না দরকার হয়?

মামী চোখ কপালে তুলে বলেন—সেই কাগজ দেখলেই তোকে অমনি জিনিষ ছেড়ে দেয়?

—দেবে না—মানে? মাণিক 'ঘুঘুমার্কা'—একটি হাসি হেসে বলে—কাগজ কি আর তখন কাগজ থাকে মামী? কাগজ নোট হয়ে হয়ে যায়!

মামী রাগ ভুলে অবাক্ হয়ে বলেন—কাগজ নোট হয়ে যায়?

—হুঁ-র বাবা! একেবারে নোটের সেরা নোট, হ্যাণ্ডনোট! হবে না? কাগজের নীচের দিকে মামাকে দিয়ে সই করিয়ে রাখি যে! তাক বুঝে মামাকে একবার ধরে বসিয়ে এক সঙ্গে ডজন দুই কাগজে সই করিয়ে নিই, যে ক'দিন চলে! মাসের শেষে—মামা সব ম্যানেজ করে দেয়।

কাগজ নোট হয়ে যায় শুনে মামী ভাবছিলেন ধুরন্ধর ভাগ্নে হয়তো কোথাও কোনো ম্যাজিক

ট্যাজিক শিখে এসেছে, যাতে কাগজ নোট করা যায়। নোট করার ইতিহাস শুনে মামী গরম তেলে কই মাছের মতো চিড়বিড়িয়ে ওঠেন। যতো পারেন কটুকাটব্য করেন মাণিককে, আর সত্যহরির উদ্দেশে 'ন ভূতো ন ভবিষ্যতি' করতে থাকেন।

মাণিক এ সব পছন্দ করে না, বিরক্তভাবে বলে—আঃ এই এক জ্বালা হয়েছে বাড়ীতে! সর্ব্বদা ফ্যাচ্ ফ্যাচ্ বকবক!···মানুষকে—একটু শান্তিতে থাকতে দেবে না! ভাইদের তো পেল্লায় বাড়ী আছে, যাও না সেখানে? গিয়ে থাকো গে না! মামা ভাগ্নেয় দুদিন জুড়িয়ে বাঁচি।



এরপর আর কথা কইতে প্রবৃত্তি হয় মানুষের? সত্যহরি-গিন্নী সুভাষিণীর তো হয় না। তিনি কথা বন্ধ করে দেন মাণিকের সঙ্গে।···কিন্তু সে আর কদিন? সে প্রতিজ্ঞা ক'দিন রাখা যায়? আবার কইতে হয়। যাকে চারবেলা খেতে দিতে হবে হাতে করে, তার সঙ্গে কথা না কইলে চলে?

যেদিন ভাতের থালাটাকে দুম্ করে বসিয়ে দিয়ে রান্নাঘরে ঢুকে যান আর কিছু নেবার কথা জিজ্ঞেস করেন না, সেদিন আঁচিয়ে উঠে মাণিক মামার শ্রবণশক্তির এলাকার মধ্যে কোথায় দাঁড়িয়ে বেশ গলা তুলে আক্ষেপ সুরু করতে থাকে—হুঁঃ! সাধে কি আর বলেছে—মামার ভাত, মামীর হাত!···রাস্তার ভিখিরিটাকে খেতে বসালেও মানুষ একবার শুধোয়—"কি রে, কিছু নিবি?" আর ভাগ্নে এমনই চক্ষুশূল জিনিষ যে তার জন্যে সেটুকু মনুষ্যত্বও আসে না। হা ঈশ্বর!

প্রত্যেক কথায় ঈশ্বরকে ডাক দেয় বলে এ মনে করবার দরকার নেই মাণিক খুব ঈশ্বর অনুরাগী! ···ওটা মাণিকের মুদ্রাদোষ।

মাণিকের কথা সত্যহরির কাণে গেলেই সত্যহরি চঞ্চল হয়ে ওঠেন। মাণিক তাঁর আপন বোনের

ছেলে নয় বটে, পিস্‌তুতো বোনের। তা'তে কিছু এসে যায় না। বাড়ীতে থাকে, 'মামা' বলে ডাকে, অতো কি আর মনে থাকে, 'আপন নয়, আপন নয়'! আর—আপন পর যাই হোক, কারো খাওয়া ভালো হয়নি শুনলেই সত্যহরি চঞ্চল না হয়ে পারেন না।···অতএব তিনি মাণিককে চুপি চুপি ডেকে দ্বারিকের দোকান কি গ্রেট ঈষ্টার্ণে যাবার অনুরোধ জানান হাতে টাকা গুঁজে দিয়ে। চুপি চুপি না করে উপায় নেই, সুভাষিণীকে প্রায় বাঘের মতোই ভয় করেন সত্যহরি।

কিন্তু মাণিক তো আর ভয় করে না? সে টাকাটা লুফ্‌তে লুফ্‌তে, অথবা নোটখানা দোলাতে দোলাতে মামীর কাছ বরাবর ঘোরাঘুরি করতে করতে বলে—যাই, এখন আবার রেষ্টুরেণ্টে ছুটি! নিশ্চিন্দি তো নেই! মামা—গুরুজন, তার উপরোধ ঠেলাও দুষ্কর! উপরোধে লোকে ঢেঁকি গেলে, তা এতো দুটো চপ্‌ কাটলেট কি খানিক মাংস পরোটা!···তবে এও ভাবি—কী লোক কী বাড়ীতেই বিয়ে করতে গেছলো! জানি তো তেনাদের নামের মহিমা! সকালে নাম করলে অন্ন জোটে না, হাঁড়ি ফাটে। নইলে আর এমন কন্যে!

আর যায় কোথা!

প্রতিজ্ঞা ভুলে তেড়ে আসেন সুভাষিণী। সত্যি এতো অপমান সহ্য করে কে মৌনব্রত পালন করতে পারে? রীতিমত একটি খণ্ডপ্রলয় ঘটে যায়! আর মাণিক অম্লান বদনে সমস্ত গালমন্দ সহ্য করে, শেষকালে দুইহাত জোড় করে কপালে ঠেকিয়ে বলে—ধন্য ধন্য! নাম রেখেছিলো বটে মা বাপ। যা এক একখানি ভীষণ কথা, দাপটে হিমাদ্রি টলেন!···তবে মাণিক নাকি একেবারে সহ্যাদ্রি, তাই—এখনো টি কে আছে!

সুভাষিণী বলেন—থাকবি না তো যাবি কোথায় শুনি? তিন কুলে আছে কেউ?

মাণিক বলে—হাসালে মামী। তিনকুল কোথা? সবে তো দুটোই কুল এখনো! তবে হ্যাঁ—এক্‌খুনি গিয়ে একখানি বিয়ে করি, সঙ্গে সঙ্গে একটা কুল বেড়ে যাবে।···আর শ্বশুরবাড়ীতে? কোন বেটা শ্বশুর আর জামাইকে মাংস পোলাও রাবড়ি রসগোল্লা না খাওয়াবে?···তোফাই থাকতে পারি। যাই না—শুদ্ধু মামার মায়ায় পড়ে। আমার অবর্ত্তমানে—একা তুমি মামাকে নিজের অধিকারে পেলে কি আর রাখবে?

এই অপমানের পর আবার কথা বন্ধ হয়ে যায়।

এখন চলছিলো সেই বন্ধর পালা।—কিন্তু দৈবদুর্বিপাকে কথা বলায়। চাকরটা নেই বাড়ীতে, আর সুভাষিণী সুক্ত চড়িয়ে দেখেন পাঁচফোঁড়ন নেই।

মানটা বরং খোওয়ানো চলে, কিন্তু সুক্তাতে পাঁচফোঁড়ন না দিলে তো আর চলে না! অন্তত সুভাষিণীর মতে চলতে পারেই না। অগত্যা ছুটে আসেন মাণিকের শরণাপন্ন হতে।

সংসারের কাজে মাণিককে পাওয়া যায় না অবশ্য কোনো সময়েই। মাণিক হয় বাড়ীতে থাকে না, নয় খাটের ওপর বাবা ভোলানাথের ভঙ্গীতে শুয়ে পা নাচায় আর দার্শনিক চিন্তা করে। তবু তেমন বিপদে পড়লে ধ্যানভঙ্গ করতেই হয় ওর। যেমন আজ করলেন সুভাষিণী। ছুটে এসে বললেন—আছো তো বিছানায় লম্বা হয়ে? উঃ, দেখলে যেন গায়ে বিষ ছড়ায়! নাও, অনুগ্রহ করে ওঠো দিকি একবার! চার পয়সার পাঁচফোঁড়ন এনে দাও চট্ করে।



সুভাষিণী যদি এসে বলতেন—“ও বাবা মাণিক, মাধাইটা বাড়ী নেই, কষ্ট করে একবারটি একটু দোকানে যা দিকি—” তাহ'লে কি হতো বলা যায় না, হয় তো মাণিকের মন গলতো, কিন্তু এ ক্ষেত্রে? নৈব নৈব চ!

মাণিক একবার মাত্র মামীর দিকে অত্যন্ত তাচ্ছিল্য দৃষ্টি হেনে দেয়ালের দিকে মুখ করে শুলো পাশ বালিশটাকে ভালো করে আঁকড়ে।

এমনিতেই, ঘরে ঢুকেই সুভাষিণীর মেজাজ উঠেছিলো পঞ্চমে, এখন চড়লো সপ্তমে। সাধ্যমতো চেঁচিয়ে বলে উঠলেন—গুছিয়ে গাছিয়ে শুচ্ছিস্ যে? যাবি না?

মাণিক ওদিক্ ফিরেই বিরক্ত ক্লান্ত স্বরে বলে—আঃ বাবা, এ সংসারে দু'মিনিট একটু উচ্চ চিন্তা করবারও জো নেই! তিন তিন দিন সিনেমা দেখা হয়নি, কোথায় ভাবছি—ছটা পর্য্যন্ত অপেক্ষা করবো, না তিনটের 'শো'তেই চলে যাবো, এখন এই ভাবনা চিন্তার সময় কানের কাছে কামান দাগলেন কিনা 'চার পয়সার পাঁচফোঁড়ন!' ছিঃ!

সুরের রাজ্যে সাতটা বৈ স্তর নেই, কিন্তু স্বরের রাজ্যে আছে। নবম দশম একাদশ দ্বাদশ—অনেক স্তর আছে। সুভাষিণীর স্বর উঠতে থাকে উচ্চ থেকে উচ্চতর স্তরে।

—এতোখানি আস্পদ্দা হয়েছে তোর? আমাকে এতো তুচ্ছ তাচ্ছিল্য? ভেবেছিস কি তুই?

মাণিক ঘাড়টা ঘুরিয়ে একচোখের কোণ দিয়ে একটু দেখে নিয়ে বলে—তোমাকে তো তুচ্ছ করিনা, করি তোমার আক্কেলকে। পাঁচফোঁড়নের অভাবে অমন কি রাজ্য বয়ে যাচ্ছিলো যে, একটা মানুষ শুয়ে রয়েছে, তা'কে জ্বালাতে এলে?

—শুয়ে রয়েছে!···স্বর চড়তে থাকে,—শুয়ে রয়েছে তো আমার মাথা কিনেছে!···বলি—শুয়ে থাকবার সময় এটা? চব্বিশ ঘণ্টা শুয়েই বা থাকবি কেন? জোয়ান বয়সের একটা ছেলে, লজ্জা করে না খালি বিছানায় আড় হয়ে পড়ে থাকতে? যা, দেখতো যা—এতোবড়ো পৃথিবীতে নেহাৎ অনড় রুগী ভিন্ন বেলা নটার সময় শুয়ে কে আছে?

···কে আছে? মাণিক এবার উঠে বসে, খাটের ধারে পা ঝুলিয়ে দোলাতে দোলাতে একটু অনুকম্পার হাসি হেসে বলে···হুঁঃ!···পৃথিবীর সব খবরই তো রাখো! পৃথিবীতে ক'জন খেটে খায়, আর ক'জন বসে খায়, তার হিসেব জানো?

সুভাষিণী গলার শির ফুলিয়ে চেঁচান—সে হিসেব তুই রাখগে যা! মামার ঘাড়ে চেপে বসে বসে চারবেলা চর্ব্বচোষ্য খেতে যার লজ্জা করে না, তারই বসে বসে ওই সব হিসেব কষা সাজে!···আপনার ভাগে নয়, কিছু নয়, পিসতুতো বোনের ছেলে, তাকে নিয়ে এতো জ্বালা পোহানো! কেন শুনি? কেন চারবেলা খাওয়াবো দাওয়াবো, যদি একটু কাজ না পাই?

মাণিক হঠাৎ—ধুত্তোর খাওয়া—বলে গা ঝাড়া দিয়ে উঠে পড়ে। আলনা থেকে জামাটা টেনে নিয়ে গায়ে দিয়ে চটিটা পায়ে গলাতে গলাতে বলে—বেশ! অতোই যখন তোমার আপন পর নিয়ে চুলচেরা হিসেব, তখন চললাম!···মামাকে ডিস্‌পেনসারিতে বলে চলে যাবো!

সত্যহরি হোমিওপ্যাথিক ডাক্তার! পসার আছে। ডিস্‌পেনসারি বাড়ীর কাছেই।

সুভাষিণী আর কি বলতেন কে জানে, ওদিকে ততোক্ষণে সুক্ত পুড়ে শেষ হয়ে সারা-বাড়ীতে সৌরভ বিকীর্ণ করছে!···তার ভেতরেই সুভাষিণী একবার প্রশ্ন করেন, কোথায় যাওয়াটা হচ্ছে, শুনি?

—যে দিকে দু চোখ যায়!

খানিক পরেই সত্যহরি হন্তদন্ত হয়ে ছুটে আসেন। কিন্তু সুভাষিণীকে প্রশ্ন করেন ভয়ে ভয়ে। মাথা চুলকে বলেন—ছোঁড়াটা গেলো কোথায়?

সুভাষিণীর সুক্ত পুড়েছে, রান্নাঘর খোলা পাওয়ার সুযোগে বেড়ালে দুধ খেয়ে গেছে, কাজেই মেজাজ খাপ্পা! তিনি রক্ত দৃষ্টিতে তাকিয়ে বলেন—কেন, তোমাকে তো বলে গেছে!

—হ্যাঁ—অ্যাঁ! ইয়ে কি একটা বলে গেলো—'জন্মের শোধ চলে যাচ্ছি' না কি! ঠিক বুঝতে—

—বলেছে তাই? সুভাষিণী বলেন—আজই পাঁচসিকের হরির লুট দেবো!

—মানে? মানে? ব্যাপারটা কি হলো?

—হবে আবার কি! মান্‌কে বিদেয় হলে হরির লুট দেবো, মেনে রেখেছিলাম!

—আহা ছি ছি!

—ছি ছি মানে? সুভাষিণী আরও চটিতং হয়ে বলেন—ও হতভাগা বুকে বসে দাড়ি ওপড়াবে, আর তাই তুমি সহ্য করবে?

সত্যহরির দাড়ি আছে। তিনি সভয়ে একবার সেই দাড়িতে হাত বুলিয়ে বলেন—কই না তো! দাড়ি তো এই—

—বুদ্ধির বালাই নিয়ে মরি! সত্যি করে ঘাস ওপড়ানোর মতন টেনে না ওপড়ালে বুঝি আর চৈতন্য হবে না? বলি মান্‌কে তোমার নিজের বোনের ছেলে?

সত্যহরি প্রতিবাদ করে ওঠেন—কে বলেছে, কে? মানকের মা আমার মেজপিসির মেয়ে, না?

—আর মানকে সেই মামাতো মামার বাড়ী বসে রামরাজত্ব করবে?

সত্যহরি আরো তীব্র প্রতিবাদ করে ওঠেন—কখনো না, কেন করবে?

—করবে না কেন? তুমি যেমন বোকা!

—আমি বোকা? বটে! বলেছে বুঝি মান্‌কে?

—শুধু মানকে বলবে কেন, জগত সুদ্ধু সবাই ব'লবে। মান্‌কে তোমার ঘাড়ের ওপর দিয়ে কী লাট সাহেবীটা চালায় দেখেছো তাকিয়ে।

সত্যহরি চোখ পাকিয়ে বলেন—দেখিনি আবার? শুধু লাট সাহেবী? স্রেফ নবাবী! বেটার চেহারাখানাও কি তেমনি! আদ্দির পাঞ্জাবী উড়িয়ে আর লম্বা কোঁচা দুলিয়ে যখন আমার ডিস্‌পেনসারীর সামনে দিয়ে যায়, মনে হয় টেবিলের তলায় লুকিয়ে পড়ি। কে বলবে যে আমি ও বেটার মামা! ঠিক যেন ওর বাবার বাড়ীর চাকর!

—বেশ বলেছো! সুভাষিণী ধিক্কারের স্বরে বলেন—তাইতেই ও আমাকে অতো তাচ্ছিল্য করে।

—তোমায় তাচ্ছিল্য করে? বটে? এতো আস্পদ্দা হয়েছে ওর? কি বলে কি?

—কি না বলে? আমার একটা কথা শোনে না, আমাকে যা মুখে আসে তাই বলে, আমাকে বাপের বাড়ী তুলে খোঁটা দেয়।

—বটে! বটে! এইসব করে মান্‌কে? সহ্য করবো না! এসব সহ্য করবো না আমি! সায়েস্তা করে দেবো ওকে। বাপের বাড়ী তুলে খোঁটা?...না না চলবে না, এসব চলবে না।

সত্যহরি বীরবিক্রমে দালানে যেন নেচে বেড়ান।

সন্ধ্যাবেলা মাধাই এসে বলে—বাবু, দাদাবাবু "সুখাদ্য রেষ্টুরেণ্টে" বসে খাচ্ছে, টাকা চাইলো!

সুভাষিণী হতবাক্ হয়ে বলেন—টাকা চাইলো!

মাধাই দাদাবাবুর অনুরক্ত, সে বিরক্ত স্বরে বলে—না চাইবে তো পাবে কোথায়? দাদাবাবু কি রোজগার করে?



—যে রোজগার করে না তার আবার এতো হোটেলে খাওয়ার সখ কেন রে মুখপোড়া?

মাধাই গম্ভীর ভাবে বলে—তা' কি করবে? আপনি ইদিকে ভাতের খোঁটা দিয়ে বসে আছো, খাবে কি? দাদাবাবু বলেছে—এ জন্মে ভাত খাবে না! শুধু চপ কাটলেট, মাংস পরোটা, রাবড়ি ডালপুরী খেয়ে থাকবে!

সুভাষিণী সত্যহরির দিকে চেয়ে জ্বলন্ত স্বরে বলেন—শুনছো!

—শুনছি বলে, শুনছি! শুনে শুনে তাজ্জব বনে যাচ্ছি! বাঙালীর ছেলে তুই, গোঁ করে ভাত ছেড়ে দিবি? বলি, ছেড়ে দিয়ে বাঁচবি? আমার আর একটি রুগী বাড়াবে আর কি!

সুভাষিণী হতাশ ভাবে বলেন—আমারও যেমন, তাই তোমাকে কথা বলতে আসি।

কতো টাকা দিচ্ছো?

সত্যহরি অপ্রতিভ ভাবে বলেন—ইয়ে মানে গোটা চারেক টাকা না দিলে কি? মানে সকাল থেকে খায়নি—

ততোক্ষণে মাধাই হেসে ওঠে—চার টাকায় কি হবে বাবু? দাদাবাবু বলে দিলো অন্তত দশটা টাকা চাই! চার পাঁচ জনা বন্ধু মিলে খেতে বসেছে!

সুভাষিণী ছিটকে ওঠেন—বটে! নিজে খেয়ে হয় না, আবার বন্ধু নিয়ে খেতে বসা হয়েছে!

এমন যে কতোই হয় এবং ডিস্‌পেনসারি থেকে তার বিল মেটানোর টাকা যায়, সে সুভাষিণী জানেন না। তিনি ক্রুদ্ধ কণ্ঠে কথা শেষ করেন—পরের ঘাড়ে চড়ে হচ্ছে, তাই। নিজের পয়সা হতো, তো দেখতাম, কতো দরাজ মন। দেখবো—মরবো না তো? নিজের পয়সা হলে তখন হাত দিয়ে জল গলবে না।

যাই হোক—রেষ্টুরেণ্টের দশটাকা তবুও সহ্য করেছিলেন সুভাষিণী! ছেলেটা সকাল থেকে ভাত খায়নি বলে তবুও মনটা একটু নরম হয়েছিলো ভিতরে ভিতরে। কিন্তু যখন মাধাই এসে বললে—বাবু, দাদাবাবু বললো—আর পাঁচটা টাকা লাগবে দুই বন্ধুতে সিনেমা যাবে—তখন সুভাষিণী গম্ভীর ভাবে বললেন—মাধাই, তুই একটা রিকশা ডেকে দিয়ে যা, আমি বাপের বাড়ী যাবো।

কিন্তু সত্যহরি নিজেই এবার রেগেছেন।

তিনি আবার নাচতে থাকেন—দেবোনা টাকা। কেন দেব? হেস্তনেস্ত করবো, এর একটা হেস্তনেস্ত করবো! দু'হাতে টাকা ওড়াবে? ভেবেছে কি? না না, কিছুতেই দেবোনা! ওকে সায়েস্তা করবো।

মাধাই বলে—সে যখন যা করবেন, করবেন বাবু। আজ দাদাবাবুর মনটা খিঁচড়ে আছে, সিনেমা না দেখলে মন ভালো হবে না।

সত্যহরি একখানা পাঁচ টাকার নোট ছুঁড়ে দিয়ে বলেন—বলগে যা, এই শেষ! "সিনেমা না দেখলে মন ভালো হবে না!" উঃ! এই সিনেমাগুলোয় কবে আগুন লাগবে!

ব্যস, তারপর থেকে সত্যহরি মাণিককে জব্দ করবার তালে ঘোরাঘুরি করছেন, আর সুভাষিণী মৌন ব্রত নিয়ে বসে আছেন।

দিন তিনেক পরে হঠাৎ মাণিক এসে হাজির। ট্যাক্সী থেকে নামলো, পিছনে সত্যহরি। সেই ধব্‌ধবে আদ্দির পাঞ্জাবী, শান্তিপুরী ধুতি, কায়দার টেরী, পায়ে হরিণের চামড়ার চটি, গায়ে এসেন্সের গন্ধ—দেখে আবার গা জ্বলে উঠলো সুভাষিণীর।

সুভাষিণী গম্ভীর ভাবে ওর আপাদমস্তক দেখে নেন। বললেন—কেন, বন্ধুর বাড়ী আর জায়গা হলো না বুঝি? আবার এলি যে?

মাণিক মুচকে হেসে পাখার স্পীডটা পুরোদমে বাড়িয়ে দিলো, কথা বললো না। কথা বললেন সত্যহরি—আসবে না মানে? ওর ঘাড় আসবে। আসতে বাধ্য! এ বাড়ী এখন কার? ওর নয়? দায়িত্ব নেই ওর! একেবারে জন্মের শোধ জব্দ করে দিয়েছি। বাড়ী ডিস্‌পেনসারি, দেশের জমিজমা নগদ টাকা যেখানে যা ছিলো, সব চাপিয়ে দিয়েছি হতভাগার ঘাড়ে। একেবারে

পাকা উইল। নে এখন কি করবি কর! এখন ওড়াও দু'হাতে! হুঁ বাবা, তা' আর ওড়াতে হবে না।



এ আর পরের পয়সা নয়, দস্তুর মতো নিজের আঁটের জিনিষ। এরপর হাত দিয়ে জল গলবে না! দেখবো সবই, মরবো না তো!

সুভাষিণী ভীষণ স্বরে বলেন—তুমি না মরো আমি মরবো। গলায় দড়ি দিয়ে মরবো। মাণকের পয়সায় খেয়ে বেঁচে থাকার চাইতে—

মাণিক কথায় বাধা দিয়ে বলে—আঃ কেন মামার কথা ধরছো মামী? 'ঘাড়ে চাপাবে!' ঘাড় ভারী সস্তা, চাপালেই হলো! ঘাড়টা পাতছে কে?...বাজে বক্ বক্ ছেড়ে এখন কিছু টাকা খসাও দিকি মামা, জুত করে একটা সিনেমা দেখে আসি!...মামী যাবে না কি? যাবে তো বলো? দুটো টিকিট কেটে আনি তা'হলে!



দেখ বড় হচ্ছিস্, বক্সিং খেলা শেখ। আমি এই রকম করে ঘুষি মারি! আ-আক্! পড়ে গেলুম যে!



ট্যাক ও ফ্রেণ্ড

দেবপ্রসাদ

দিল্লি থেকে হরিশ কাকা চিঠি দিয়েছেন···

: আমাদের অফিসে একটি কর্ম্ম খালি হইয়াছে। কাজটি ভাল, উন্নতিরও যথেষ্ট সম্ভাবনা আছে। তোমার জন্য বড় সাহেবকে ধরিয়াছি এবং তিনি খানিকটা রাজীও হইয়াছেন। ইন্টারভিয়ুর জন্য উপযুক্ত মত পোষাক আনিবে। দিল্লিতে এখন বেশ শীত পড়িতেছে। গরম কোট-প্যান্ট আনিবে। বড় সাহেবের পোষাক-পরিচ্ছদের দিকে অত্যন্ত প্রখর দৃষ্টি। গরম স্যুট যদি না থাকে, তবে কিনিবার সময় কাট-ছাটের দিকে নজর দিবে। ইত্যাদি ইত্যাদি।

এই বাজারে একটা গরম স্যুট মানে অন্ততঃ দেড়শ'টি টাকার ধাক্কা। কিন্তু চাকুরীটি ভাল, তার উপরে ধরা-করার লোক আছে, এক্ষেত্রে টাকার মায়া করলে চলে না। তাই এখান থেকে, সেখান থেকে টাকাটা জোগাড় করতেই হ'ল। প্যান্টটা নীচের দিকে থাকে, ততটা নজরে পড়ে না। রেডি-মেইড কিনলেও চলে। কিন্তু কোট-সার্ট ভাল হওয়া চাই-ই। তাই বাজার ঘুরে একটা তৈরি প্যান্ট কিনলাম। কোটের জন্য গরম কাপড় এবং সার্টের ছিটও কেনা হ'ল। দাম একটু বেশী পড়ল বটে কিন্তু এসব জিনিষ তো আর রোজ রোজ করা হচ্ছে না। তাই সুযোগ যখন একটা এসেছে, তখন ভাল দেখেই একটা কোট করানো যাক। আর কাপড় যখন ভাল কেনা হ'ল তখন কোন খেলো দর্জ্জির কাছে বানাতে দেওয়ারও কোন মানে হয় না। দু'-চার টাকা বেশী লাগবে, তবু কলেজ স্ট্রীটের কোন বড় দোকানে যাওয়াই ভাল। বিশেষ করে হরিশ কাকা যখন অত করে লিখেছেন।

যাচ্ছিলাম কলেজ ষ্ট্রীটের দিকেই। পথে এক জায়গায় সুযোগ মত রাস্তা পার হবার জন্য দাঁড়াতে হ'ল।

'আরে ক্যাব্‌লা যে!' কে যেন পিছন থেকে ডাকল।

ফিরে দেখি, বটু।

বটু আমার ছোটবেলাকার ক্লাস-ফ্রেণ্ড। একসঙ্গে ক্লাস এইট্ পর্য্যন্ত পড়েছি। তার পরে বটু কি কারণে পড়াশুনা ছেড়ে দেয়। আমাদের যোগাযোগ অবশ্য তার পরেও অনেক কাল পর্য্যন্ত ছিল। ইদানীং বছর চার-পাঁচ শুধু দেখা-সাক্ষাৎ ছিল না। এতদিন পরে হঠাৎ বটুকে দেখে বেশ খুসি হ'লাম।

বটু একটা দর্জির দোকানে টুলের উপরে বসে ছিল। গায়ে শুধু একটা ফতুয়া, কাপড় হাঁটু অবধি তোলা। আমাকে ফিরতে দেখে আবার ডাকল, আয় আয় ক্যাব্‌লা। ভিতরে বোস এসে। অনেক দিন তোর সঙ্গে দেখা হয় নি। বছর পাঁচেক হবে, নারে?'

'তা হবে। কিন্তু তুই এখানে কি করছিস?'

'টেলারিংএর ব্যবসা করছি,' বটু হেসে বলল, 'এই তো আমার দোকান।'

অনুযোগ করে বললাম, 'দোকান করেছিস, অথচ আমাদের একবার জানাসনি পর্য্যন্ত!'

বটু কিন্তু অপ্রতিভ হলনা একটুও।

'তোর তো এতদিন নো-পাত্তা। কোথায় ডুব মেরেছিলি তাই জানতুম না। না হ'লে বন্ধু বান্ধবদের প্রায় সবাইকেই বলেছি। আসচেও অনেকে এখানে। তোদের শুভ-ইচ্ছায় বিজ্‌নেস্ একরকম ভালই চলছে।'

'তুই কিন্তু বেশ ভালই আছিস। স্বাধীন ব্যবসা, কোন ঝামেলা নেই।'

বটু হেসে বলল, 'তাই ভাবিস বুঝি! ব্যবসা করা অত সোজা নয় রে ভাই। কি রকম হার্ড কম্পিটিশন চারদিকে। ভাল কথা তুই কি কচ্ছিস আজকাল? কাজ-টাজ কিছু কচ্ছিস, না স্রেফ ভ্যারেণ্ডা ভাজচিস্?'

'ভ্যারেণ্ডা ভাজাই চলছে এখনও,' আমাকে স্বীকার করতেই হ'ল।

বটু উদার ভাবে উপদেশ দিয়ে বলল, বলিস্ কিরে! একটা কিছুতে লেগে পড়। তোর হাতে এটা কিরে? কাপড় কিনেছিস বুঝি! দেখি কি রকম কাপড়!' বলেই আমার হাত থেকে প্যাকেটটা টেনে নিয়ে খুলে ফেলল।

আমি বললাম, 'দিল্লিতে একটা ইণ্টারভিয়্যু আছে, তার জন্য একটা সার্ট আর কোট করানো দরকার'—

বটু আমার কথাটা শেষ করতে না দিয়েই বলল, যাক, ও আমি বুঝে নিয়েছি। তোর ইণ্টারভিয়্যু কবে? কবে রওনা হ'তে চাস্?

'শনিবার দুপুর বেলা তুফান এক্স্প্রেসে রওনা হতে হবে। রোববার বিকেলে পৌঁছুব, সোমবার ইণ্টারভিয়ু।'

বটু আঙ্গুলে কর গুণে হিসাব করে নিয়ে বলল, 'তুই যাবি শনিবার, আর আজ হ'ল গিয়ে সোমবার। তা সব ঠিক হয়ে যাবে। তুই কিচ্ছু চিন্তা করিস নে। আমার এখানে যখন একবার এসে পড়েছিস, তখন আর ভাবনা নেই।'

বটু বলে কি! ওতো দেখচি ধরেই নিয়েছে যে ওর দোকানেই জামা বানাতে দেব। এ রকম উটকো দোকানে কোট সার্ট বানাতে দেবার আমার আদপেই ইচ্ছা ছিল না। তাহ'লে আমাদের পাড়ার "আদর্শ টেলারিং সপ" কি দোষ করেছিল! ভদ্রলোক বলেওছিলেন অনেক করে। তাকে এড়াতে পেরেছি, কিন্তু বটুকে এড়াই কি করে! তাই একটু আমতা আমতা করেই বললাম, 'ভাই তোর এখানে করাতে পারলে ভালই হ'ত। তবে ব্যাপার কি জানিস। ইণ্টারভিয়ু দিতে যাচ্ছি। সাহেবের শুনেছি, পোষাক-আশাকের দিকে খুব কড়া নজর। কাট-ছাট খুব আপ-টু-ডেট না হ'লে হয়ত চাকরীটাই ফসকে যাবে।'

বটু মুরুব্বির চালে বলল, 'এই ব্যাপার! তুই কিন্তু চিরটা কাল গবেটই রয়ে গেলি। আমার দোকানের সাইন-বোর্ড দেখিস্‌নি বুঝি! যা উঠে গিয়ে দেখ।' বলে' আমাকে একরকম ঠেলেই তুলে দিল।

বাহারের সাইন-বোর্ডই বটে।

"সি. এইস্. লাকি টেলরিং মার্ট"

তার নীচেই—"কোট প্যাণ্ট আমাদের বিশেষত্ব।"

বললাম, 'নামটা তো বেশ জবরই দিয়েছিস। কিন্তু সি. এইস্‌টা কিরে?'

আমার কথায় বটু খুসি হয়ে বলল, 'আমার ভাল নাম মনে আছেতো?—চিন্তাহরণ। তারই সি. এইস্।'

'নামটা বদলে দিস্ কিন্তু।'

বটু বিস্মিত হল, 'কেন রে?'

'ভাল করে না দেখলে মনে হয় যেন "চালাকি টেলরিং মার্ট"।' আমি কাজের কথায় চলে এলাম, 'বাজে কথা যাক্। ওতো লিখতে হয় তাই লিখেছিস। কিন্তু তোর দোকানে কি সে রকম ভাল দর্জি আছে?'

দোকানের নামের বিকৃতি শুনে বটু হেসে ফেলেছিল, কিন্তু পরে গম্ভীর হয়ে বলল, 'আচ্ছা এটাতো জানিস, এ্যাজ এ ফ্রেণ্ড, তোর কাজটা যাতে ঠিক মত হয় এটা আমি চাই।'

এরকম মোক্ষম কথার পরে অবশ্য কিছু বলা মুস্কিল। অগত্যা সায় দিতেই হ'ল। বটু কোটের কাপড়টা দেখে বলল, 'বেড়ে কাপড় কিনেছিস তো! তোর পছন্দ আছে বলতে হবে। কত করে নিলে?'

একটু গর্বের স্বরেই বললাম, 'চল্লিশ টাকা গজ।'

'বলিস কি!' বটু আফশোষ করে বলল, তোকে ডাহা ঠকিয়েছে দেখছি। আমার থ্রুতে কিনতি তো ত্রিশ টাকায় কিনিয়ে দিতে পারতুম। যাক, যা হবার তো হয়েছে। কিন্তু যাই বল, তোর সার্টের কাপড়টা কিন্তু ততটা সুবিধের হয়নি। কত করে নিয়েছে?

ভয়ে ভয়ে বললাম, 'আড়াই টাকা।'

'না, এটায় ঠকিস নি। কিন্তু এ কাপড়ের সার্ট তো তোর কোটের সঙ্গে ম্যাচ করবে না!'

'বলিস কি? ম্যাচ যাতে করে সেই জন্যই তো দশটা দোকান ঘুরে এই কাপড়টা কিনেছি। ব্রাউন রংএর কোট, ব্রাউন রংএর স্ট্রাইপ দেওয়া সার্ট, মানাবে না কেন?'

বটু উচ্চাঙ্গের হাসি হাসল, 'সবার কি সব জিনিষের হ্যাক থাকে নাকি! আমি দিন-রাত এই করছি, আমার একটা নজর এসে গেছে। যাক, আমার কাছে যখন এসেছিস তখন ভাববার কিচ্ছু নেই। আমার এখানে যে কাপড় আছে, তারই সঙ্গে বদলে দেব এখন।'

বটু উঠে গিয়ে র‍্যাক থেকে গোটা দুই-তিন সার্টের কাপড় এনে আমার সামনে মেলে ধরল।

'দেখ, এর ভিতরে এইটা ঠিক মানাবে। আমি, ভাই, দোকানে খেলো জিনিষ রাখিনে। তিন টাকা করে গজ—তুই, এ্যাজ এ ফ্রেণ্ড, দু'টাকা বারো আনা করেই দিস্। টাকাকড়ির হিসেব পরে হবে। দেখি তোর মাপটা নিই।' সার্টের কাপড়টা দেখে আমি কিন্তু ততটা প্রসন্ন হ'তে পারলুম না। তা' ছাড়া দামটাও বড্ড বেশী মনে হ'ল। কিন্তু বটু যখন বলছে, এ্যাজ এ ফ্রেণ্ড,—তখন নিশ্চয় ঠিকই বলেছে।

বটু মাপ নিতে নিতে বলল, 'আমি, ভাই, সস্তায় কাজ করে নাম খারাপ করতে চাইনে। তাই কোটের মেকিং চার্জ একটু বেশীই নিয়ে থাকি।' কথাটা শুনে আমি একটু আশ্বস্তই হলাম বরং। কারণ পয়সা যখন বেশী নেয় তখন কাজটা বোধ হয় ভালই করে। ন'ইলে ব্যবসা টিকবে কেন? কত বেশী নেয় সেটা আগে থাকতেই জেনে রাখা ভাল।

'কত করে তোর চার্জ?'

'গরম কোটে পঁয়তাল্লিশ টাকা। অবশ্য লাইনিং টাইনিং ধরেই। তবে তুই, এ্যাজ এ ফ্রেণ্ড, চল্লিশ টাকাই দিস।'

'চল্লিশ টাকা!' আমি রীতিমত অবাক হলাম, 'খুব বড় বড় দোকানেও তো ওই একই দাম নেয় যে রে!'

বটু বিরক্ত হয়ে উঠল। বলল, 'মেলা বাজে বকিস নি, ক্যাবলা। তোদের ওই এক বড় দোষ। বড় দোকান, আর বড় দোকান। বড় দোকানে কি তোর কোটে চারটে হাতা লাগিয়ে দেবে! মূর্খের মত কথা শুনলে গা জ্বালা করে। বলি কাজটা আসল, না নামটা আসল?'

আমার পক্ষেও যুক্তি ছিল, 'ভাল কাজ করে বলেই তারা বড় হতে পেরেছে।' বটু কিন্তু

আমার কথায় কান না দিয়েই বলল, 'আজ হ'ল গিয়ে সোমবার। বিষ্যুদবার বিকেলে—না থাক্, বারবেলায় আর কাজ নেই, সেই শুক্রবার সকালেই সার্টটা পেয়ে যাবি। কোটের ট্রায়ালও ওই সময়ই হয়ে যাবে। কোটটা শনিবার দশটা নাগাদ দিয়ে দেব। তোর কোনও বড় দোকানে এতটা ইণ্টারেষ্ট নিয়ে কাজ করবে না। তাড়াহুড়ো করতে গিয়ে আমার অবশ্য একটু ক্ষতিই হবে। তা হোক, এ্যাজ এ ফ্রেণ্ড, তোর দিক্‌টা আমারো দেখতে হবে তো!'

তারপরে অনেকটা হঠাৎই বলল, 'চা খাবি?'

চা খাবার স্পৃহা ছিল না। বললাম, 'না, এখন আমি উঠি। তাহ'লে শুক্রবার সকালে কথা রইল। দেখিস্ যেন দেরী না হয়।'

বটু আশ্বাস দিয়ে বলল, 'পাগল! আমার একটা দায়িত্ব জ্ঞান নেই? কি যে বলিস!'

শুক্রবার সকালে বটুর দোকানে গেলুম। আমাকে দেখে বটু অভ্যর্থনা করল। 'এই যে এসে গেছিস। তোর সার্টটা হয়ে গেছে। তবে কোটটা এখনও পুরো ট্রায়ালের মত হয়নি। মাঝখানে একটা জরুরী কাজ পড়ে গিয়েছিল কিনা। তবু এখনও একবার দেখে নে। আজ সন্ধ্যার দিকে একবার আসিস। তখন ফাইনাল ট্রায়াল দেওয়া যাবে। কোন বড় দোকানে দেবে এই রকম বারবার ট্রায়াল?'

বটু একজন সহকারীকে বলতে, সে একটা অসমাপ্ত কোট নিয়ে এলো। এখনও কলার লাগেনি। একটা হাতাও বাকী। তাই পরলুম। মনে হ'ল, বড় বেশী টাইট হয়েছে। তাছাড়া হাতাটাও বেশ বড়, প্রায় আঙ্গুলের ডগা পর্যন্ত।

আয়নার দিকে তাকিয়ে বললাম, 'বড্ড টাইট মনে হচ্ছে যে।'

বটু তাচ্ছিল্যের সুরে বলল, 'ঘাবরাস্ নি। সব ঠিক হয়ে যাবে, পাকা সেলাইএর পর দেখবি কেমন ফিট করে। সেলাইএর ভিতরে অনেকটা করে মার্জিন রাখা হয়েছে। দরকার হ'লে বড় করতে অসুবিধা হবে না। যা জিনিষ বানিয়ে দিলুম, দশটি বছর চোখ বুজে গায় দিতে পারবি। তখন বলবি, বানিয়ে দিয়েছিল বটে বটু একটা কোটের মত কোট।'

সার্ট দেখে কিন্তু আমার মনটা বড্ড দমে গেল। কাঁধ দুটোর একটা অনেকখানি ঝুলে পড়েছে, আর অপর দিক্‌টা আবার এতই ছোট যে ছিঁড়ে যাবার যোগাড়। হাত দু'টো এত ছোট যে আর কয়েক ইঞ্চি ছোট হ'লে হাফসার্ট হ'তে পারত। সার্ট দেখে বটু নিজেও লজ্জিত হ'ল। একজন দর্জিকে খুব খানিক ধমকে আমার দিকে ফিরে বলল, এদের উপর একটু নির্ভর করবার জো নেই। কাল দুপুরের দিকে একটু বড়বাজারে গিয়েছিলাম কিছু কাপড় কিনতে। সেই সময়ে এই কাণ্ড করে রেখেছে। যদি না-ই পারবি তো বল সে কথা! তা' তুই ভাবিস নি। একদিক্ দিয়ে কিন্তু ভালই হ'ল, বলতে হবে। তোর মনেও এই কাপড়টা সম্বন্ধে খুঁত খুঁত ছিল। তুই সেদিন চলে যাবার পরে আমারও মনটা একটু কেমন কেমন লাগছিল। তুই অত পছন্দ করে কাপড়টা

কিনেছিলি! এ একরকম ভালই হয়েছে। কাল দুপুরে যে কাপড়টা এনেছি সেটা তোর নিশ্চয়ই পছন্দ হবে। দামও বেশী হবেনা, আড়াই টাকার মধ্যে। এ সার্টটাও তুই নিয়ে যা। রাত্তিরে শোবার সময় কি বাজার টাজারে যেতে গেলে ব্যবহার করতে পারবি। বাজারে আর কে বাহারের জামা পরে যাচ্ছে বল!'

তার মানে আর একটা সার্টের কাপড়ের দাম দিতে হবে! অন্য দোকান হলে ঝগড়া করে নতুন সার্ট আদায় করা যেত। বটু বোধ হয় আমার মনের ভাব আঁচ করেই বলল, 'তোর অবশ্য



অল্প একটু লোকসান হ'ল। কিন্তু তোদের কাছ থেকেও, এ্যাজ এ ফ্রেণ্ড, যদি এটুকু দাবী না করতে পারি তাহ'লে আর বন্ধুত্বের কি দাম রইল!' ভেবে দেখলাম, সত্যিই তো। লোকে বন্ধুবান্ধবের জন্য কত কি করে, আর আমি আট-দশটা টাকার ক্ষতি সইতে পারব না! তবে সার্টের বেলায়ই যদি টেলরিংএর এ-ই নমুনা হয়, তাহ'লে কোটের বেলা তো আরও সাংঘাতিক। ভয়টাকে ঠাট্টার আকারে প্রকাশ করে বললাম, 'কোটের কাটও এই রকমই হবে নাকি?'

বটু এবারে মুখে মুখে হিসাব করতে আরম্ভ করল।

দু' টাকা বারো আনা করে সাড়ে তিন গজ হ'ল ন'টাকা দশ আনা। তা' থেকে আড়াই টাকা হিসাবে তোর সাড়ে তিন গজ বাদ যাবে। তাহ'লে হ'ল চৌদ্দ আনা। এই নতুন সার্টে লাগবে আট টাকা বারো আনা। মজুরী দুটো সার্টের তিন টাকা আর কোটের চল্লিশ টাকা। তাহ'লে সব শুদ্ধ হল বাহান্ন টাকা দশ আনা। পঞ্চাশটা টাকা তো এখন দে। যদি অসুবিধা হয়, বাকী খুচরোটা বরং পরে দিস।' আমি ক্ষীণ প্রতিবাদের সুরে বললাম, দুটো সার্টেরই মেকিং চার্জ ধরে দিলি?' 'কারিকরকে তো দিতে হবে,সেটা ভাবিসনে কেন? নে এখন টাকাটা বার কর।' মৃদু প্রতিবাদ করে বললাম, 'পরে দিলে হয় না? এখন দু'টো চারটে জিনিষ কিনতে হবে যে।'

বটু প্রায় আমার কানের কাছে মুখ এনে নীচু গলায় বলল, 'তোকে, এ্যাজ এ ফ্রেণ্ড, ব্যবসার সিক্রেট বলতে বাধা নেই। এখন হাত একদম খালি। কাল বড়বাজারে সাগরমলের দোকান থেকে যে কাপড় এনেছি তার বাবদ একশ' টাকা দিতে হবে। ওয়ার্ড দিয়েছি, তার একটা দাম আছে তো? তুই বরং কেনাকাটা করবার আগে বাড়ীটা একবার হয়ে যাস।'

শেষ পর্য্যন্ত টাকাটা খসাতেই হ'ল। যাবার সময় বটু বলল, ভাল কথা, তোর আর কষ্ট করে সন্ধ্যার সময় আসতে হবে না। পাঁচটা নাগাদ আমার কারিকরই যাবে তোর বাসায়।'

আমিও ফের স্মরণ করিয়ে দিলাম, 'কিছুতেই যেন এর ব্যতিক্রম না হয়। কাল সকালেই দুটো জিনিষ না পেলে আমাকে কিন্তু পথে বসতে হবে।'

বটু আশ্বাস দিল, 'এ্যাজ এ ফ্রেণ্ড, তুই যখন আমার উপর ভরসা করে আছিস তখন তোকে কিচ্ছু ভাবতে হবে না।'

বেশ একটু বিমর্ষ হয়েই বাড়ী ফিরলাম।

বিকাল নাগাদ কেউ এলো না। পাঁচটা দূরের কথা, সাতটা বেজে গেল তাও কারুর দেখা নেই। শেষে আমিই ফের গেলুম ওর দোকানে।

বটু নেই কিন্তু আমাদের এক বন্ধু রাখাল বসে আছে। রাখাল আমাকে দেখে বলল, 'এখানে কি মনে করে? তুমিও বটুর পাল্লায় পড়েছ নাকি?'

কথাটা ধক করে কানে বাজল।

'মানে?'

'মানে আর কি? তোমার জিনিষপত্র পেয়েছ?'

'এখনও পাইনি। আজ দেবার কথা ছিল।'

রাখাল ঠোঁট এবং জিভের সাহায্যে অদ্ভুত একটা শব্দ করে বলল, তা'হলে আর পেয়েছ! আমি এই দু'মাস হ'ল ওর পিছনে ঘুরচি। পূজোর আগে আমাকে ধরে বললে, আমি যখন টেলরিংএর দোকান করেছি তখন তোমার বাড়ীর পূজোর পোষাক-জামা আমিই করে দেব। মুখে সব কথাতেই বলে, এ্যাজ এ ফ্রেণ্ড, কিন্তু কাজের বেলা ঢুঁ ঢুঁ। পূজো তো কবে হয়ে গেছে, তারপরেও প্রায় দু' মাস হ'তে চলল, একটা পাঞ্জাবী ছাড়া আর কিছু আদায় করতে পারিনি। সে পাঞ্জাবীরও কি কাট্! ভাইবোনগুলো পুরোনো জামা-কাপড় পরে পূজো কাটিয়েছে। ওর কাছে আমার অন্ততঃ শ' দেড়েক টাকার কাপড় আটকা আছে। তার উপরে আবার পঞ্চাশটা টাকা এ্যাডভান্স নিয়েছে।'

আমার তো চক্ষু স্থির! জামাও পেয়েছি আর চাকরীও হয়েছে! রাখাল খানিকক্ষণ অপেক্ষা করে চলে গেল। কারিকর আমাকে বলল, 'আপনিই বা আর কতক্ষণ বসবেন? বাবু তাগাদায় বেরিয়েছেন, কখন ফিরবেন কিছু ঠিক নেই।'

পরের দিন সকালে উঠেই ছুটলাম বটুর দোকানে। বটু আসতে সেই আটটা! ভেবেছিলাম,

ওকে দেখতে পেলেই কড়া কড়া কথা শুনিয়ে দেব। কিন্তু ও আগে থাকতেই সে পথ বন্ধ করে দিলে। আমি কিছু বলবার আগেই আমার হাত দুটো ধরে বলল, 'ভাই ক্যাব্লা, আমি যে কি পরিমাণ লজ্জিত তা তোকে বলে বোঝাতে পারব না। তুমি যদি, এ্যাজ এ ফ্রেণ্ড, মাপ না করিস্'—

ওর সেই 'এ্যাজ এ ফ্রেণ্ড' শুনে না হেসে পারলুম না। বললাম, 'যাক যা হয়েছে, হয়েছে। জিনিষ দুটো রেডি তো ?'

বটু কাষ্ঠ হাসি হেসে বলল, 'তা-ই যদি হবে, তাহ'লে আর এত ভাববার কি ছিল ! কারিকর দুটোই কাল রাত্তিরে পালিয়েছে। আমিও অবশ্য দেখে নেব। এক পাই দেব না বেটাদের। তোর সার্টের সামনের দিক্‌টা হয়ে গেছে, পিছনের পার্টটা লাগান হয়নি। সব ঐ বেটাদের বজ্জাতি। তবে সেজন্য খুব এসে যাবে না। পিছনে দুটো ফিতে লাগিয়ে দিচ্ছি, তাই দিয়ে বেঁধে নিস। সাহেব তো দেখবে তোর সামনের দিক্‌টা। তবে আর চিন্তা কি ?'



বটু বলল, চিন্তা নেই। আমার কিন্তু গলা শুকিয়ে আসছিল। শুকনো গলায় বললাম, 'আর কোটটা ?'

'সেটা আর হয়ে উঠল না ভাই। তা তুই ভাবিস নি। তুই বরং আমার এই কোটটা নিয়ে যা। একটু পুরোণো বটে, কিন্তু কেউ তো আর মাথার দিব্বি দেয়নি যে নতুন কোট পরেই ইণ্টারভিয়ু দিতে যেতে হবে। এটা তোর ঠিক ফিট করবে। এ্যাজ এ ফ্রেণ্ড, তোর একটা বন্দোবস্ত তো করে দিতেই হবে।'

আমার মনের অবস্থা তখন একমাত্র ভগবান্ জানেন।

বটু কিন্তু তার কোটটা খুলে একরকম জোর করেই আমাকে পরিয়ে দিল। বেশ ঢোলা-ঢালা।

হাত দুটো ইঞ্চি দু'য়েক ছোট। মরিয়া হয়ে বললাম, 'বড্ড বেমানান দেখাচ্ছেনা? হাতা দুটো ছোট—তার উপরে বড় বেশী ময়লা হয়ে গেছে।'

বটু এতক্ষণে অনেকটা স্বাভাবিক হয়েছে। সহজ ভাবেই বলল, 'তুই তো একটু ঢোলাই পছন্দ করিস। তা' ছাড়া ঢোলা কোটই তো আজকালকার ফ্যাশান। ছোট হাতও আজকাল খুব চলচে, কারণ তা না হ'লে সার্টের কাফ্ দেখা যায় না কিনা। আজকাল পুরোণো ফ্যাশানের আইডিয়া সব বদলে গেছে। তোকে চমৎকার মানিয়েছে কোটটায়।'

'কিন্তু বড্ড ময়লা যে! কাচানোর তো আর সময় নেই!'

'কি যে বলিস্! কলকাতায় পয়সা দিলে বাঘের দুধ পর্য্যন্ত পাওয়া যায়; আর তোর একটা কোট কাচানো যাবে না? পাশেই ড্রাই-ক্লিনিংএর দোকান আছে। চল আমি বলে দিচ্ছি, আজ বিকেলের মধ্যেই ওয়াস্ করে দেবে। আর রং জ্বলে গেছে বলে তোর মন যদি খুঁত খুঁত করে, তো, পাঁচটা টাকা দিয়ে না হয় রং করিয়ে নে। খয়েরি রং করাস, চমৎকার দেখাবে।'

* * * * *

হাতে টাকাও ছিল না যে অন্য বন্দোবস্ত করি। তাই ওই পোষাকেই যেতে হ'ল। সেই পৃষ্ঠহীন সার্ট, বটুর কোট এবং তদুপরি হরিশ কাকার সুপারিশ—সব এক সঙ্গে মিলে চাকরীটা কিন্তু আমাকে পাইয়েই দিলে।

বছরখানেক পরে এক মাসের ছুটি নিয়ে কলকাতা এসেছিলাম। বটুর দোকানের খোঁজ করেছিলাম। দেখি, সে দোকান উঠে গেছে, তার বদলে কে একজন সেখানে বুক-বাইণ্ডিংএর দোকান খুলে বসেছে।

রাস্তায় একদিন বটুর সঙ্গে দেখা। জিজ্ঞেস করলাম, 'তোর দোকানের কি হ'ল রে বটু?'

বটু বিমর্ষ কণ্ঠে বলল, 'ও আর পোষাল না ভাই। বন্ধুবান্ধবের উপরে ভরসা করেই দোকানটা খুলেছিলাম। কিন্তু, এ্যাজ এ ফ্রেণ্ড, তাদের কাছ থেকে কোন কো-অপারেশন পেলাম না। তাই বাধ্য হয়েই দোকানটা তুলে দিতে হ'ল।

মাত্র ছ' কোটী লেখাপড়া জানে। অর্থাৎ
ভারতের ছত্রিশ কোটী নরনারীর মধ্যে এই ছ' কোটীর মধ্যে আবার
সাধারণভাবে অক্ষর লিখতে ও পড়তে পারে। বাকী ত্রিশ কোটী সম্পূর্ণ নিরক্ষর।
ছ'লক্ষ শুধু পড়তেই পারে লিখতে পারে না।
দেশের সামগ্রিক উন্নতির জন্য শিক্ষার ব্যাপক বিস্তার সর্ব্বাগ্রে প্রয়োজন।



পথ

শ্রীধীরেন্দ্রলাল ধর

অনিল সত্যই চাকরী ছেড়ে দিল।

এই অর্থসংকটের দিনে চাকরী ছেড়ে দেওয়া সহজ কথা নয়, কিন্তু নিজের আদর্শ বজায় রেখে অনিল আপিসে চাকরী বজায় রাখতে পারলো না। প্রথমে কিছুদিন ভাল ভাবেই চলেছিল। মাইনে যাই হোক না কেন, কাজ ছিল হাল্কা। তিন চার ঘণ্টা কাজ করলেই দিনের কাজ শেষ। পাঁচটা পর্য্যন্ত আপিসে থাকতে হোত বটে কিন্তু কাজ আর থাকতো না। অনিল কানাঘুঁষা শুনেছিল বটে যে আপিসে অনেকেই ঘুষ নেয়, কিন্তু কখনও কাউকে ঘুষ নিতে দেখেনি বলে সে গুজবে কান দেয় নি। কিন্তু যেদিন সুনীলবাবু তার এসিষ্ট্যাণ্ট হয়ে এল এবং সামনাসামনি ঘুষ নিতে সুরু করলো, সেদিন অনিল বিস্মিত হোল যত, বিরক্ত হোল তার চেয়ে বেশী। সুনীল বোধহয় ব্যাপারটা আন্দাজ করেছিল, বললো—আপনি এদিকে নজর দেবেন না। আমাদের এটুকু না হলে চলে না, কিই-বা মাইনে পাই বলুন।

অনিল বললো—যা মাইনে পান সেইমত চললেই পারেন, এতো কোট প্যাণ্ট সুটের দরকার কি?

সুনীল বললো—অভ্যাস হয়ে গেছে, এখন আর কি করি বলুন?

অনিল আর কিছু বললো না, কিন্তু কয়েক দিনের মধ্যেই সে দেখলো সুনীলবাবু ঘুষ না পেলে কোন কাজ করে না। একদিন বললো—এভাবে আমার কাছে বসে ঘুষ নেবেন না, যা নিতে হয় বারান্দায় বেরিয়ে গিয়ে নেবেন।

তবু সুনীল সে কথায় কান দিল না।

অনিলের ক্রমশঃ অসহ্য বোধ হোল, একদিন অফিসারকে বললো—স্যার, হয় ঘুষ বন্ধ করুন না হয় সুনীলবাবুকে আমার কাছ থেকে সরিয়ে দিন।

অফিসার হেসে বললেন—ওরা অমন পেয়েই থাকে, ওদিকে আপনি দৃষ্টি দেবেন না।

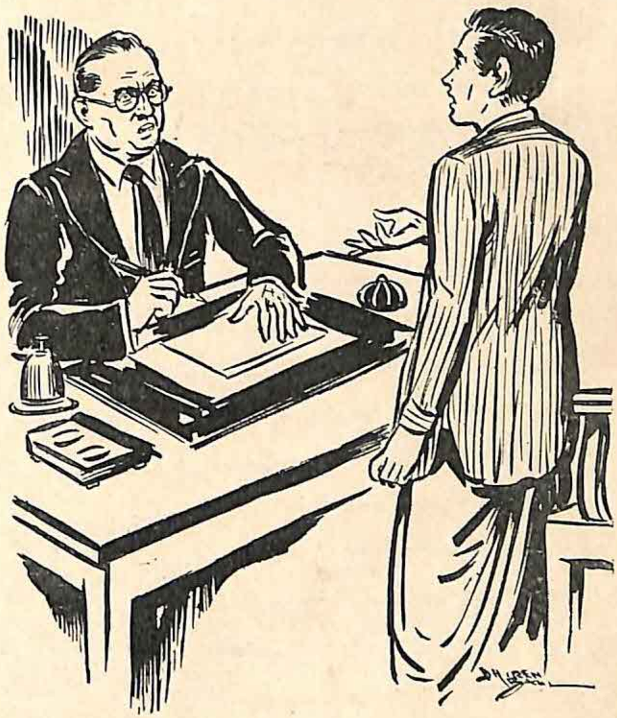
—আমার সামনে বসে ঘুষ নেবে আর আমি জানবো না?

—আপিসের পাওনা-গণ্ডা তারা তো বুঝিয়ে দিচ্ছে, তার উপর তারা যা উপরি করে করুক, সেদিকে দেখতে গেলে আমার তো কাজ চলবে না।

—আপনি বলছেন, তাহলে ওরা ঘুষ নিতে পারে?

অফিসার কটমট করে একবার অনিলের মুখের পানে তাকালেন, তারপর বললেন—আমি কিছু বলছি না, আমি বলছি যে আপনি আপনার কাজ করুন গে, আমাকে কাজের সময় বিরক্ত করবেন না।

অনিল অফিসারের ঘর থেকে বেরিয়ে এলো। সে শুনেছিল যারা ঘুষ নেয় তারা অফিসারের বাড়ীতে নানা জিনিষ ভেট পাঠায়, সেইজন্য অফিসার তাদের উপর প্রসন্ন, এখন বুঝতে পারলো কথাটা মিথ্যা নয়। কিন্তু সে যে আদর্শ অন্তরে নিয়ে দীর্ঘ আট বছর ডিটেনশন ক্যাম্পে কাটিয়ে এসেছে, দেশ স্বাধীন হবার পরে সেই আদর্শকে ভুলে যাবে কেমন করে? ইংরাজ আমলে যে ঘুষ ও দুর্নীতির বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেছে, স্বরাজ পাবার পর সেই ঘুষ ও দুর্নীতিকে সমর্থন করতে হবে? অনিলের অন্তর কিছুতেই সামঞ্জস্য করতে পারলো না, সারাটা দিন সে শুধু ভাবলো, চাকরী ছেড়ে দিলে সে খেতে পাবে না, কিন্তু আদর্শ বিসর্জন দিয়ে সে চাকরীও তো করতে পারবে না।



পরদিন সকালে আপিসে যেতেই সুনীল বললো—কাল আপনি অফিসারকে বলেছিলেন আমার কথা! অফিসার কি বললেন?

—তা শুনে আপনার লাভ?

—আপনি না বললেও আমি সব শুনেছি, অফিসার নিজে আমাকে বলেছেন।

—তাহলে আর আমাকে জিজ্ঞাসা করছেন কেন?

—কত বড় বড় কংগ্রেসী দেখলাম, তা আপনি! আপনি আমার বিরুদ্ধে অভিযোগ করে কি করবেন শুনি? অফিসার যে 'পেন' টা দিয়ে লেখেন, ওটা কে কিনে দিয়েছে জানেন?—আমি। হাতে যে নীলার আংটিটা দেখেন ওটা গত মাসে কিনে দিয়েছি নগদ আড়াই শো টাকা দিয়ে! আপনি

আমার নামে অভিযোগ করে কি করবেন? হুঁঃ! কত হাতীঘোড়া গেল তল্, ব্যাঙে বলে কত জল! মুখটি বুজে চাকরী করে যান, যদি পারেন তো নিজেও দু'পয়সা গুছিয়ে নিন্!

অনিলের মাথার মধ্যে আগুন ধরে গেল, বললো—গুছাবার দরকার নেই, চাকরী আমি ছেড়ে দোব।

—আপনার মত অনেকেই অমন রোজ চাকরী ছাড়ছে, শুনছি।

অনিল সে কথার আর কোন উত্তর দিল না, খস্খস্ করে লিখতে বসে গেল চাকরী ছেড়ে দেবার এক দরখাস্ত।

আধঘন্টার মধ্যে দরখাস্তখানি লেখা শেষ করেই অনিল সেটি নিয়ে গিয়ে দিল অফিসারের হাতে। অফিসার সেটার উপর একবার চোখ বুলিয়ে নিয়ে বললেন—ঠিক আছে।

অনিল জিজ্ঞাসা করলো—কবে এটা মঞ্জুর হবে?

—আজকেই।

—আমি তাহলে যেতে পারি?

—স্বচ্ছন্দে।

অনিল ধীরে ধীরে আপিস থেকে বেরিয়ে এল। একটা দুর্নীতির কেন্দ্র থেকে সে বেরিয়ে আসতে পেরেছে ভেবে সে স্বস্তি পেল, কিন্তু দেড়শো টাকা মাইনের চাকরীটা চলে গেল, অর্থোপার্জনের উপায়টুকু চলে গেল বলে একটা দুশ্চিন্তাও দেখা দিল।

দু'দিন পরে শনিবার অনিল দেশে ফিরলো। বললো—মা, চাকরী ছেড়ে দিয়ে এলাম।

মা চুপ করে মুখের পানে তাকিয়ে রইলেন কিছুক্ষণ, তারপর বললেন—সত্যি বলছিস্?

—হ্যাঁ মা, সত্যিই ছেড়ে দিয়ে এলাম। হাত পেতে ঘুষ নিতে পারবো না, আর সেই ঘুষের টাকায় উপরওয়ালার বাড়ীতে ল্যাংড়া আম আর ইলিস মাছ কিনে দিয়ে আসতে পারবো না, আর আমার পাশে বসে ঘুষ নেবে তা'ও সইতে পারবো না, কাজেই ওখানে চাকরী করবো কি করে?

—সবাই ঘুষ নেয়?

—বেশীর ভাগ।

—যারা নেয় না, তারাও তো আছে।

—তারা মুখ বুজে সব সইতে পারে, আমি পারি না। অন্যায়ের সঙ্গে আপোষ করে চলতে আমার মন চায় না। তাই চাকরীতে একেবারে জবাব দিয়ে এলাম।

—তাহলে এখন কি করবি?

—মনে করেছি গাঁয়েই একটা পাঠশালা খুলে বসবো।

—তাতে আর কি হবে? মাইনে দিয়ে ছেলেকে পাঠশালায় পড়াবার মত লোক এই গাঁয়ে আর কজন আছে?

—মাইনে চাইনে, কলাটা মূলোটা দিতে পারলেও পড়াবো, কিন্তু মানুষ তৈরী করতে হবে, আমাদের দেশে সত্যিকারের মানুষের অভাব পড়েছে।

মা ছেলেকে চিনতেন, মন যা বলছে সেটা সে করবেই, আটটি বছর বন্দী-শিবিরে কাটিয়ে এসেও মনের এই ঋজুতা এতটুকু হ্রাস পায় নি। বললেন—সে যা হয় পরে হবে'খন বেলা হোল স্নান করে দুটি খা।

বেলা তিনটা নাগাদ অনিল বাড়ী থেকে বেরিয়ে পড়লো। গ্রাম ছাড়িয়ে নদীর তীরে শিবমন্দির। মন্দিরের পাশেই পূজারী ঠাকুরের বাড়ী। গুরুপ্রসন্ন দাওয়ায় বসে শিবপুরাণ পড়ছিলেন, অনিল এসে বললো—প্রণাম হই ঠাকুরমশাই!

—জয়স্তু, জয়স্তু—বলে ঠাকুরমশাই এক মুখ হেসে স্নিগ্ধ কণ্ঠে বললেন—বসো, বসো, তারপর এই দুপুর বেলা, কি মনে করে?

—আপনার কাছে একটা কথা বলতে এলাম।

—কি বাবা, বল?

—এই গাঁয়ে আমি একটা ইস্কুল করতে চাই। আপনি কি বলেন?

—ভালো কথা, কিন্তু গাঁয়ে তো ইস্কুল একটা রয়েছে।

—সে থাক না, গাঁয়ে তো এমন অনেক ছেলে আছে, যারা মাইনে দিয়ে ইস্কুলে পড়তে পারে না, আমার ইস্কুল হবে তাদের জন্য।

—বুঝেছি, তুমি ছোট জাতের ছেলেদের কথা বলছ?

—এখন তো আর ছোট জাত বলে কিছু নেই ঠাকুর মশাই, আইনে তো এখন সবাইকে সমান করে দিয়েছে।

—আইন করে কি আর সব কিছু হয়? আইনে কি আর শত শত বছরের সংস্কারকে মুছে দিতে পারবে?

—সেইজন্যই তো আপনার কাছে এসেছি, আপনি একটু অনুগ্রহ করলেই আমি ভরসা পাই।

—বল, আমায় কি করতে হবে?

—নাটমণ্ডপে যদি আপনি ইস্কুল করার অনুমতি দেন।

—দেবতার মন্দিরে সবাইকারই তো অধিকার আছে, তুমি যদি ওখানে ইস্কুল কর, তাহলে আমি আপত্তি করবো কেন? কিন্তু ইস্কুলে পড়াবে কে শুনি?

—আমিই পড়াব।

—তুমি চাকরী করবে না?

—চাকরী ছেড়ে দিয়ে এসেছি।

—চাকরী ছেড়ে দিয়ে এলে? কাজটা তো ভাল করনি বাপু, এই বাজারে সংসার চালাবে কেমন করে?

—হুজন তো মাত্র লোক, মা আর আমি। কোন রকমে চলে যাবে। জমির ধানটা তো পাব, আর উঠানে কয়েকটা লাউকুমড়োর গাছ দিলেই চলবে।

—ও কোন কাজের কথা নয়, পয়সার দরকার সব সময়। অসুখ আছে, কাপড়-জামা আছে, তেলনুন কিনতে হবে, সে সব আসবে কোথা থেকে? তোমরা লেখাপড়া জানো, তিন চারটে পাশ করেছ, একটা কিছু জোগাড় করে নাও। তোমার মত যারা জেল খেটেছে তারা তো অনেকে মন্ত্রী অবধি হয়ে গেছে বলে শুনলাম। আর তুমি চাকরী ছেড়ে গাঁয়ে চলে এলে?

—চাকরী করা আমার পোষালো না ঠাকুর মশাই।

—ওটা কোন কাজের কথা নয়, এখানে একটা ইস্কুল করার চেয়ে দশটাকা উপায় করে যদি গাঁয়ের দশজনকে সাহায্য করতে পার, তাতে গাঁয়ের লোকের অনেক বেশী উপকার হবে।

—কিন্তু আমি এখন গাঁয়ে একটা ইস্কুল করবো বলেই ঠিক করেছি।

—তুমি বাবা ছেলেবেলা থেকেই একগুঁয়ে, তোমার বয়সী কত ছেলে তোমার চেয়ে কম লেখাপড়া জেনে এই বয়সে কেমন গুছিয়ে নিলে, আর তুমি মায়ের একটা ছেলে দেশ দেশ করে আট বছর জেল খাটতে চলে গেলে, তোমাদের ধরনই আলাদা।

—সবাই যদি একই ধরনের হয় তাহলে তো হুনিয়াটা একই রকম হয়ে যায় ঠাকুর মশাই। যাক্, নাটমণ্ডপে যদি ইস্কুল করি আপনার আপত্তি নেই ত?

—আমি আপত্তি করার কে বাবা? নাটমন্দির, নরনারায়ণের কাজে লাগবে, আমি কে?

—অনিল হেসে বললো—এই জন্যই আপনার কাছে সবার আগে এসেছি ঠাকুর মশাই, আপনার আশীর্ব্বাদ নিয়ে এবার আমি কাজে হাত দিতে পারি।

নদীর তীরে কয়েক ঘর জেলে আর চাষী-কৈবর্তের বাস। তাদের সর্দার নন্দ জেলে তখন বাড়ীতেই ছিল। অনিলের ডাক শুনেই নন্দ তাড়াতাড়ি বেরিয়ে এল, বললো—কি হুকুম দাদাবাবু?

—তোদের জন্য একটা ইস্কুল করছি যে, বুড়ো শিবতলার নাটমন্দিরে, তোরা সব যাস্।

—আমরা ইস্কুলে যাব কখন? আমরা কি আপনাদের মত ভদ্দর লোক যে ছেলেমেয়েরা ইস্কুলে পড়বে, আমাদের ছেলেমেয়েরা ততক্ষণ হুটো পয়সার ধান্দায় ঘুরবে, পড়বে কখন?

—শুধু ছেলেমেয়েরা নয় রে তোরাও যাবি, সবাইকারই তো লেখাপড়া শেখা দরকার।

—বলেন কি দাদাবাবু, আমরা এই বয়সে ইস্কুলে বসে পড়বো?

—লেখাপড়া শেখার কি কোন বয়স আছে নন্দ।

—না দাদাবাবু, তা হয় না, তুমি ছোটদেরই পড়াও। সপ্তাহে দুটো দিন তো মোটে তা সময় করে নেবে'খন।

—সপ্তাহে দুদিন নয় রে, সপ্তাহে সাতদিন।

—চাকরী করতে যাবেন না?

—চাকরী ছেড়ে দিয়েছি, এখন শুধু তোদের পড়াবো।

—আমাদের পড়াবার জন্য চাকরী ছেড়ে দিয়েছেন? তা আপনারা সব পারেন বাবু, আপনারা গান্ধীরাজের চেলা তো, আপনারা সব পারেন।

নন্দ তখনই অনিলকে নিয়ে বাড়ী-বাড়ী ঘুরতে বেরুলো, ইস্কুল বসাবে—ছেলে চাই।

পরদিন থেকেই শিবমন্দিরের নাটমণ্ডপে ইস্কুল বসে গেল। জেলেপাড়ায় ছেলে নেহাৎ কম ছিল না, নাটমণ্ডপে রীতিমত ভীড় জমে গেল। ছেলের বাবাও এল, অনিলবাবু কেমন ইস্কুল করেন দেখতে।

অনিলের উপকরণ কিছু ছিল না, কলকাতা থেকে আসার সময় সে একখানি বড় ব্ল্যাকবোর্ড কিনে এনেছিল, সেটি একটি থামের গায়ে ঝুলিয়ে দিলে, তার পাশে একখানি ছোট জলচৌকি পেতে বসে পড়লো, বললো—আমি তোমাদের প্রথমে খানিকক্ষণ রামায়ণ পাঠ করে শোনাব। রামায়ণ মহাভারত না জানলে আমাদের দেশের কথা কিছুই জানা যায় না, আমি তাই রামায়ণ থেকেই তোমাদের শিক্ষা সুরু করতে চাই।

অনিল সুরু করলো রামায়ণ পড়তে। সুর করে খানিক খানিক পাঠ করে আর তার ব্যাখ্যা করে।

পাঁচ-ছ' পৃষ্ঠা পড়তেই ঘণ্টাখানেক কেটে গেল। সন্ধ্যা ঘনিয়ে এলো। একটি হারিকেন লণ্ঠন জেলে ব্ল্যাকবোর্ডের সামনে রেখে, অনিল বললো—এবার আমি তোমাদের দেশের কথা বলবো। তোমরা মনে কর লেখাপড়া শেখা মানে অ আ ক খ শেখা। অ আ ক খ জানতে হয় সত্যি, না জানলে দুনিয়ার খবর পড়া যায় না, কিন্তু সেইভাবে পড়ে শুনে শিখতে ও জানতে যে সময় লাগবে, সেইটুকু সংক্ষেপ করার জন্য আমি তোমাদের জানবার কথাগুলি আগেই মুখে মুখে বলে দিতে চাই, তোমরা যখন প্রথম ভাগ ও দ্বিতীয় ভাগ শেষ করবে, ততদিনে আমার মুখে মুখে শুনে তোমরা আরও অনেক বিষয় শিখে নেবে।

এই বলে অনিল প্রথমে তাদের গাঁ থেকে সুরু করলো, উত্তর পশ্চিম, পূব দক্ষিণ ধরে বোর্ডের উপর গাঁয়ের একখানি মানচিত্র আঁকলো, বললো—আকাশ থেকে যদি আমাদের এই গ্রামখানিকে কেউ দেখে তাহলে সে এমনি দেখবে।

আরও ঘণ্টাখানেক পড়ানোর পর প্রথম দিনের শিক্ষা দান শেষ হোল। সব শেষে অনিল বললো—কেমন লাগলো? পড়তে ইচ্ছা করে?

সকলে সমস্বরে বললো—বেশ ভাল লাগছে, আমরা রোজ আসবো।

—কিন্তু একটা কথা বাপু,—অনিল বললো—খালি হাতে এলে তো আর চলবে না, একখানি করে প্রথম ভাগ বই চাই যে। বই একখানা করে কিনতে হবে।

—কালই কিনতে হবে ?

—দু'পাঁচ দিনের মধ্যে কিনতে হবে।

—কত দাম ?

—আট আনা দাম। গঞ্জের বাজার থেকে কিনে আনতে হবে।

—আমরা তো জানি না।

—তোমাদের জানতে হবে না। যে যে কিনবে আমাকে পয়সা দিও, আমি একবার গিয়ে সব ক'খানা একসঙ্গে কিনে আনবো।

সকলে সায় দিয়ে বললো—সেই ভাল।

প্রথম দিনের সাফল্যে অনিলের মনটা ভারী প্রসন্ন হয়ে উঠলো। চাকরী করা তো শুধু নিজের জন্য, কিন্তু সকলের জন্য কাজ করার পরিতৃপ্তি একান্ত ভাবে উপলব্ধি করলো এই প্রথম।

ফেরার পথে চৌধুরীদের বাড়ীতে একবার গেল। সেখানে গাঁয়ের ছেলেদের সখের থিয়েটারের দল প্রতি সন্ধ্যায় বৈঠক জমায়। আটদশ জন বসে ছিল, অনিলকে দেখেই তারা উৎফুল্ল হয়ে উঠলো, বললো—আপনার কাছেই আমরা যাব মনে করেছিলাম অনিলদা, শুনলাম গবর্ণমেণ্ট নাকি গাঁয়ের যত সখের দল আছে, তাদের থিয়েটার করার টাকা দিচ্ছে। তোমার তো অনেক জানা-চেনা আছে, তুমি আমাদের একটা ব্যবস্থা করে দাও। 'চন্দ্রগুপ্ত' আমাদের অনেকদিন ধরে রিহার্সাল হয়ে তৈরী হয়ে আছে কিন্তু টাকা তুলতে পারছি না বলে অভিনয় হচ্ছে না।

অনিল বললো—আমি তো ভাই ও সম্পর্কে বিশেষ কিছুই জানি না, তবে খবর নিয়ে দেখতে পারি। এখন আমি তোমাদের কাছে এসেছি অন্য কাজে, আমার ইচ্ছা এই গ্রামখানিকে একটু পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করি,—পুকুরের পানা পরিষ্কার করা, জঙ্গল সাফ করা, পথঘাটগুলি ঠিক রাখা,—তোমরা ভাই আমার সঙ্গে একটু হাত লাগাও। সকালবেলা ঘণ্টা তিনেক করে কাজ করলেই গাঁয়ের অবস্থা একেবারে বদলে যাবে।

মাসখানেক ধরে খেটে আপনারা একবার সাফ করবেন কিন্তু আবার একমাস পরে দেখবেন যে-কে সেই।

—তা হবে কেন, আমরা লেগে থাকবো, একবার সাফ করার পর আর নোংরা হতে দোব না। তোমরা ভাই কাল থেকে আমার সঙ্গে হাত লাগাও।

—আপনি আপিস থেকে ছুটি নিয়ে এসেছেন বুঝি ?

—চাকরী ছেড়ে দিয়ে এসেছি, এই গাঁয়ের কাজ করবো বলে।

—কিন্তু গাঁয়ে থাকলে আপনার চলবে কি করে ?

—আমার চলার কথা আমি আর ভাবি না, আমি জানি সকলের ভাল হলে আমারও হবে। সেই জন্যই আমি সময় আর নষ্ট করতে চাই না। আমি কাল থেকেই কাজ সুরু করতে চাই। তোমরা কে কে আমার সঙ্গে কাজ করবে বল।

ক্লাবে যে ক'জন বসে ছিল, সকলে পরস্পরের মুখ চাওয়া-চাওয়ি করলো, সহসা কেউ কোন জবাব দিল না। অনিল বললো—তাহলে তোমরা কেউই আমার সঙ্গে কাজ করতে চাও না?

একজন বললো—আমি তো এখনও ভাত খাইনি, সবে পালাজ্বর থেকে উঠেছি।

আরেকজন বললো—আমারও তো ম্যালেরিয়া, আমারও তো জল সইবে না।

আরেকজন বললো—আমরা ভাই কোদাল চালাতে পারবো না।

অনিল সকলের মুখের পানে তাকিয়ে আবহাওয়া বুঝে নিল, বললো—তোমরা না পার ভাই, আমি একাই কাজ করবো, নাহলে জেলেপাড়ার ছেলেদের সঙ্গে নেব এখন।

বিরক্তভাবে অনিল ঘর থেকে বেরিয়ে এল। বাড়ীর চৌকাঠ পার হতেই একটা কথা তার কানে এসে বিঁধলো, সে থমকে দাঁড়ালো। ঘরের মধ্যে কে যেন বলছে—উনি দুশো টাকা মাইনের চাকরী ছেড়ে দিয়ে গাঁয়ে কাজ করতে এসেছেন, আমি একথা বিশ্বাস করবো? গবর্ণমেণ্ট পাঠিয়েছে আরো বেশী মাইনেতে, পরে তোমরা তখন শুনতে পাবে। ওরা তখন জেল খেটেছিল এখন ওদের সুযোগ সুবিধা খুব বেশী। ইউনিয়ন বোর্ডকে যে কাজ করতে হবে উনি আমাদের দিয়ে সেই সব কাজ করাতে চান। ওর সঙ্গে বেগার দিয়ে লাভ কি? ততক্ষণ একটু গড়ালে শরীরটা ভাল থাকবে।

অনিলের আর শুনতে ইচ্ছা করলো না, সে পা চালালো।

বাড়ীতে মা সব শুনে বললেন—ছোটলোকদের দিয়ে বরং কাজ পাবি, কিন্তু ভদ্রলোকদের দিয়ে কাজ পাবি না। ভদ্রলোকের ছেলেরা যদি খাটিয়ে হবে, তাহলে ওদের নিজেদেরই বাগান পুকুরের আজ এমন অবস্থা হবে কেন? ওরা আড্ডা দেবে, তাসপাশা খেলবে, যাত্রা করবে, কাজ করলে ওদের অপমান হয়।

অনিল বললো—কাল নিজেই কাজ সুরু করবো।

মা বললেন—তুই একা কতটুকু কি করবি?

—একা কি করতে পারি আগে দেখি, না পারলে জেলেপাড়ার ছেলেদের ডাকবো।

সত্যই অনিল পরদিন সকালেই লেগে গেল, কোদাল হাতে নিয়ে ঢুকলো তাদের বাড়ীর পিছনে সরকারদের বাগানে। সমস্ত বাগানটা আগাছায় ভরে গেছে। অনিল একপাশ থেকে সুরু করলো আগাছা কোপাতে। মা বললেন—দেখিস বাপু এ বাগানটায় সাপ আছে।

অনিল বললো—কিছু ভেবো না, মানুষের সাড়া পেলে সাপ পালিয়ে যায়।

ঘণ্টাখানেকের মধ্যে অনিল বাগানের একদিকে প্রায় পনেরো কুড়ি হাত পরিষ্কার করে ফেললো।

অনভ্যাসের কাজ, কোমর কন্‌কন্ করতে লাগলো, গায় ঘাম দেখা দিল। কোদাল রেখে একটা গাছের নীচে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে অনিল হাঁপাতে লাগলো।

সহসা পিছনে খন্‌খনে গলায় রমণীকণ্ঠ শোনা গেল—কি গো ছেলে, এসব আবার কি হচ্ছে।

অনিল দেখলো সরকার বাড়ীর বৃদ্ধা গৃহিণী এসে দাঁড়িয়েছেন, হেসে বললো—জঙ্গল সাফ করছি। নিজের বাড়ীর পাশ থেকেই সুরু করলাম।

—এ সব তো দিনমজুরের কাজ বাবা, এসব কি আর ভদ্রলোকদের সাজে।



—দিনমজুররাও তো আমাদের মত মানুষ, তারা যা পারে আমরাই বা তা পারবো না কেন?

—কিন্তু বাবা এতে তো আমার ক্ষতি হবে, বাগান পরিষ্কার থাকলে গাছে তো একটা আম কাঁঠালও থাকবে না। জঙ্গল হয়ে আছে তাতেই ছোঁড়াদের কত উপদ্রব! এ বাগান বাবা তোমাকে সাফ করতে হবে না।

—আমি তো সারা গ্রামকে সাফ করবো বলে ঠিক করেছি।

—সে বাবা, আর পাঁচজনের যা করতে হয় করগে, আমার বাগান থাক্।

—কিন্তু ঠাকুমা…

—কিছু না বাবা, কিছু না, যা করেছ বেশ করেছ, আর দরকার নেই বাবা, তুমি বেরিয়ে এসো।

অনিল কিছুতেই বুড়ীকে বুঝাতে পারলো না, শেষ পর্য্যন্ত হতাশ হয়ে কোদাল হাতে নিয়ে সে বেরিয়ে এল।

মা বললেন—দেখলি তো, কাদের তুই ভাল করবি, বল ত?

—কাজ যখন সুরু করেছি তখন শেষ না করে ছাড়বো না। এদিকে কিছু না করতে পারি জেলেপাড়া থেকে কাজ সুরু করবো—বলে জামাটা গায়ে চড়িয়ে অনিল তখনই বেরিয়ে পড়লো।

নদীর ধারে বুড়ো শিবতলার পাশ দিয়ে জেলেপাড়া যাবার পথ। মন্দিরে গুরুপ্রসন্ন পূজার

আয়োজন করছিলেন, অনিলকে দেখতে পেয়ে ডাকলেন, বললেন—আজ থেকে তুমি ভাই অন্য জায়গায় ইস্কুল বসাবার ব্যবস্থা কর, এখানে আর ইস্কুল হবে না।

অনিল অবাক্ হয়ে গেল, বললো—কি হোল বলুন তো?

—চৌধুরীদের ছোটবাবু সকালে এসেছিলেন এদিকে বেড়াতে, বলে গেলেন, ছোটলোকদের ইস্কুল বসালে তিনি পূজার মাসিক বরাদ্দ ত্রিশ টাকা বন্ধ করে দেবেন, আমার তো ভাই, ওই জীবিকা।

অনিল ক'মিনিট চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল, তারপর বললো—হঠাৎ একথা উঠলো কেন?

—উনি বললেন, ছোটলোকেরা লেখাপড়া শিখলে আর ভদ্রলোকদের মানতে চাইবে না, চাষ-আবাদ করতে চাইবে না, ছোটলোকদের নিয়ে অত মাতামাতি করা ঠিক নয়।

অনিল বললো—বেশ, ঠিক আছে, আজ থেকে আমি অন্য জায়গায় ইস্কুল বসাবার ব্যবস্থা করছি!

অনিল তখনই গেল নন্দ জেলের বাড়ীতে, বললো—আজ থেকে তোর দাওয়াতেই ইস্কুল বসবে, চৌধুরীদের ছোটবাবু নাটমন্দিরে ইস্কুল করতে নিষেধ করেছে।

নন্দ বললো—ছোটবাবু তো আমার কাছেও এসেছিলেন আজ সকালে, বলে গেলেন—লেখাপড়া তোদের কোন্ কর্মে লাগবে শুনি? ওসব ঝুট্‌ঝামেলা যদি কর বাবু, তাহলে পাড়া-ঘরে দু'চার পয়সা যে মাছ বেচো তা বন্ধ করে দোব। আমি তো বাবু খুব ভরসা পাই না। উনি জমিদার, জলে বাস করে তো আর কুমীরের সঙ্গে ঝগড়া করা চলে না।

—আর তো জমিদার বলে কিছু নেই, জমিদারী সব তো সরকারী হয়ে গেছে।

—তাহলেও বাবু, জমিদার জমিদারই আছে।

অনিল বুঝলো এদের বুঝানো সহজ নয়। পুরুষানুক্রমে যা চলে আসছে সে ধারণা বদলাতে সময় লাগবে। বললো—তাহলে গাছতলাতেই আজ থেকে ইস্কুল বসাবো, ইস্কুল বন্ধ হবে না।

নন্দ বললো—কিন্তু ছেলেরা আসবে কি?

—দেখা যাক!—বলে, অনিল চিন্তিত মুখে জেলেপাড়ার ভিতরে গিয়ে ঢুকলো।

জেলেপাড়ার ভিতরেও কেমন যেন একটা থম্‌থমে ভাব। আগের দিনের মত তেমন উৎসাহ সে আর কারুর মুখে দেখলো না। কয়েকটা বাড়ী ঘুরে সে ফিরে এল, বললো—মা, ইস্কুল বোধ হয় আজ থেকেই বন্ধ করতে হোল।

মা সব শুনে বললেন—চৌধুরীদের ছোটবাবু হঠাৎ ইস্কুলের পিছনে লাগলেন কেন বুঝলাম না।

অনিল বললো—দেখি, আমি কিন্তু এতো সহজে হাল ছাড়বো না।

বুড়ো শিবতলা থেকে একটু এগিয়ে নদীর তীরে একটি বটগাছ ছিল, অনেক দিনের পুরাণো বট, নীচে খানিকটা চাতাল বাঁধানো। সেই বটগাছের নীচে হ্যারিকেনটা জেলে সন্ধ্যাবেলা অনিল যখন রামায়ণ খুলে বসলো, তখন কয়েকজন বুড়োবুড়ী ছাড়া আর কাউকেই সে দেখতে পেল না, অনিল বললো—আর কেউ আসবে না?

এক বুড়ী বললো—ছোটবাবু সবাইকে আসতে বারণ করেছেন।

অনিল বললো—লেখাপড়া শেখা তো অন্যায় কিছু নয়, তিনি বারণ করলেন কেন?

—তা তো জানিনে বাবা, তবে তিনি বলে গেছেন যে লেখাপড়া শিখলে এ গাঁয়ে আমরা আর বাস করতে পারবো না, তাই ছেলেরা ভয়ে আসে নি। তা না আসুক বাবা, আমরা তো এসেছি, তুমি আমাদের পাঠ শোনাও, আমরা রোজ আসবো।

অনিল পড়তে সুরু করলো। কিন্তু আজ আর পড়া তেমন জমলো না, অনিল কেমন যেন অন্যমনস্ক হয়ে পড়লো। ঘণ্টাখানেক পড়ে সে পাঠ বন্ধ করলো, বললো—আজ এই অবধি থাক, আবার কাল হবে।

বুড়োবুড়ীরা চলে গেল, অনিল লণ্ঠনটা হাতে নিয়ে পথে নামলো।

অনিল ফিরে এসে বললো—গাঁয়ে কাজ করতে এসে ভুল করলাম। সত্যি, এখানে করার কিছু নেই।

—আজ কেউ আসেনি বুঝি!

—না, ছোটবাবু সবাইকে বারণ করেছেন।

—তুই একবার ছোটবাবুর সঙ্গে গিয়ে না হয় দেখা কর।

—না, তার দরকার নেই।

চাতালের অন্ধকার কোণটিতে বসে অনিল নানাকথা চিন্তা করতে লাগলো। পরাধীনতার আমলে দেশের মঙ্গল কিছু করতে হলে বিদেশী শাসকেরা শঙ্কিত হয়ে উঠতো, বাধা দিত, কিন্তু দেশ স্বাধীন হবার পরেও দেশের লোকের কাছ থেকে এই বাধা পেতে হবে এ যে অপ্রত্যাশিত।

অনিল রাত্রে ভাল করে ঘুমাতে পারে না। মা বলেন—এখানে এসব কিছু হবে না, শুধু শুধু দিন নষ্ট করে লাভ কি? আর মিছিমিছি মন খারাপ করবি কেন, তার চেয়ে বরং কলকাতায় চলে যা, কোন একটা কাজ জুটিয়ে নিবি।

—হুঁ—বলে অনিল জামাটা গায়ে চড়িয়ে দিলে, বললে—আজ হাটবার, হাট থেকে একবার ঘুরে আসি।

অন্যমনস্কের মত অনিল হাটের দিকে চললো। কিছুদূর গিয়ে যখন সে বামুন-পাড়ার চৌমাথা পার হচ্ছে এমন সময় ডাক শুনলো—অনিল, নাকি?

অনিল ফিরলো। পণ্ডিত মশাই দাওয়ায় বসে খবরের কাগজ পড়ছেন, অনিল ভিতরে গিয়ে পণ্ডিত মশাইকে প্রণাম করলো। পণ্ডিত মশাই বললেন—আজ মঙ্গলবার, তুমি এখানে? আপিসে ছুটি নিয়েছ বুঝি?

—না, চাকরী ছেড়ে দিয়েছি।

অনিল পণ্ডিত মশাইকে বললো সব কথা। সব শুনে পণ্ডিত মশাই বললেন—এতো সহজেই ভেঙে পড়লে চলবে কেন? তোমরা না দেশের জন্য জেল খেটে এসেছ! অন্যায়ের বিরুদ্ধে তোমরা

যদি রুখে দাঁড়াতে না পার, তাহলে, কারা দাঁড়াবে বল ? এই যে গোয়ায় সত্যাগ্রহ চলছে, মরছে কত লোক, তবু তো ছাড়ছে না। তোমরা তো বাবা ওই দলেরই মানুষ, বিদেশীর বিরুদ্ধে লড়তে পার, আর দেশের কুসংস্কারের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে পারবে না ?

গোয়ার সত্যাগ্রহের কথাটা অনিল ভুলেই গিয়েছিল। তাড়াতাড়ি কাগজখানি টেনে নিল। অর্ধসাপ্তাহিক বসুমতী। আমীরচাঁদ নিহত হয়েছেন, সত্যাগ্রহ আরো জোরালো হয়ে উঠেছে। বাংলাদেশেও সত্যাগ্রহী সংগ্রহ করার অভিযান সুরু হয়েছে। আবেদন বেরিয়েছে কাগজে। অনিল কাগজখানি রেখে অন্যমনস্কের মত বললো—দেখি, কি করা যায় !

হাটে আর অনিল গেল না, বাড়ী ফিরলো, বললো—মা, আমি আজ কলকাতায় চললাম।

মা বললেন—হঠাৎ ?

—সেখানে কাজ পাব। নূতন কাজের সন্ধান পেয়েছি আজকের কাগজে।

অনিল সেই দিনই সন্ধ্যার ট্রেনে কলকাতায় চলে এল।

কলকাতায় দ্রুত স্বেচ্ছাসেবকবাহিনী তৈরী হোল। তারপর যাত্রা করলো লোওা। লোওা ষ্টেশনে স্বেচ্ছাসেবকবাহিনীকে নাগরিকরা সম্বর্ধনা জানালো। ফুলের মালা পরিয়ে দিল। পরদিন সকালেই স্বেচ্ছাসেবকবাহিনী যাত্রা সুরু করলো গোয়ার উদ্দেশ্যে। গোয়ার উপকণ্ঠে সাংবাদিকরা তাদের ফটো তুললো, নাগরিকরা সম্বর্ধনা জানিয়ে বললো—আপনারা জাতির সেবক, স্বাধীনতার সৈনিক ! জয় হিন্দ্ ! হাতে তেরঙা নিশান নিয়ে স্বেচ্ছাসেবকেরা যাত্রা সুরু করলো। পিছনের জনতাকে পিছনে ফেলে স্বেচ্ছাসৈনিকের দল অগ্রসর হোল।

মাইল কয়েক পথ অতিক্রম করে তারা নগরে প্রবেশ করলো, নাগরিকেরা চিৎকার করে উঠলো—জয় হিন্দ্ !

ঠিক সেই সময় পথের আরেক দিক্ থেকে ছুটে এল ক'জন সৈনিক, স্বেচ্ছাসৈনিকদের আঘাত করলো বন্দুকের কুঁদো দিয়ে। আত্মরক্ষা করার একটা চেষ্টা জাগলো অনিলের মনে, মনে হোল এর চেয়ে গাঁয়ে বসে থাকাই বোধ হয় ভাল ছিল। ঠিক সেই মুহূর্তে অনিলের পূর্ববর্তী সৈনিক যশোবন্তজী আহত হয়ে ঘুরে পড়লো। আঘাতের অপেক্ষা না রেখেই অনিলও ধড়াস্ করে পড়ে গেল মাটির উপর। বন্দুকের কুঁদোর একটা আঘাত এসে পড়লো তার কাঁধে। মনে পড়লো এই রকম ঠিক একই জায়গায় সে লাঠির আঘাত পেয়েছিল বিয়াল্লিশের আন্দোলনে। তারপরেই একজন সৈনিক তার বুকের উপর একখানি পা তুলে দিল। পাঁজরগুলো মড়মড় করে ভেঙে গেল নাকি ! অনিলের নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে গেল। কতক্ষণ পরে কে জানে, অনিলের মনে হল কে যেন তার হাত ধরে টেনে নিয়ে যাচ্ছে। মনে হোল একটু জল চায়, বড় তৃষ্ণা, কিন্তু মুখ দিয়ে কথা বেরুলো না। পর্তুগীজ সৈনিক, তাকে পথের একপাশে টেনে সরিয়ে দিল। অনিলের ঘাড়টা লটকে পড়ল এক পাশে।



দেখা

বিমলাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

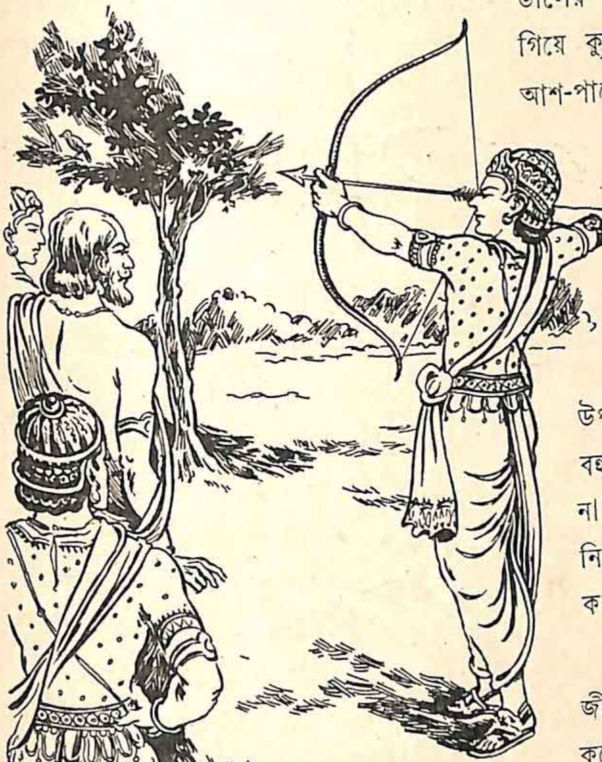
চোখের কাজ হল দেখা, যেমন মুখের কাজ হচ্ছে খাওয়া। কিন্তু মুখ হা করে কতকগুলো খাবার পেটের মধ্যে চালান করে দিলেই কি খাওয়া হয়? চাই জিভের স্বাদ, চাই ভোজনের ইচ্ছা ও তৃপ্তি। তবেই হয় পুষ্টি, তবেই খাওয়া সার্থক।

তেমনি কতো জিনিসই তো আমরা দেখি, নিত্য দেখে যাচ্ছি। তার কিছুটা মনে রাখি বা মনে রাখবার চেষ্টা করি। বাকিটা মিলিয়ে যায়, মুছে যায় বা আমরা শীঘ্র ভুলে যাই। তার কারণ আমরা ঠিক মত দেখতে জানি না কিংবা দেখিনা, ভাসা-ভাসা দেখি। যাকে বলে, চোখ খুলে রাখি মাত্র। বাইরের জিনিষগুলো চোখের পর্দায় এসে পড়ে। মন বা বুদ্ধি যদি জাগ্রত না থাকে, তা হলে সে দেখা কাজের দেখা নয়। বই খোলা আছে চোখের সামনে, চোখ দেখে যাচ্ছে—এই পর্যন্ত। কিন্তু মগজে কিছুই ঢুক্‌ছে না, পিঁপড়ের সারের মতন অক্ষরগুলো শুধু ভেসে ভেসে যাচ্ছে। এটা তোমরা অনেক সময়ে নিশ্চয়ই লক্ষ্য করেছ। কেন এমন হয়? কারণ, দেখার সঙ্গে বোঝার দরকার। আর বুঝতে গেলেই মনের দরকার। এখানে মন পদার্থ টি নেই। তাই অন্যমনস্ক হয়ে পড়তে গেলে পড়ার জিনিস মাথায় ঢোকে না। যখন চোখ মেলে দেখি, তখন সেটা দৃষ্টি। যখন মন দিয়ে দেখি, তখন সেটা হয় ধারণা। তাই মন সেটাকে ধরে রাখে, ভোলে না।

কি ভাবে দেখলে সেই দেখাটা সত্যিকারের দেখা হয়, প্রকৃত পক্ষে কাজের জিনিস হয়, সেইটেই হল বড় কথা। দেখা জিনিসটা হল চোখের কাজ ও অভ্যাস। কিন্তু তার পিছনে আছে, এখুনি যা বললুম, মনের কাজ অর্থাৎ সজাগ দৃষ্টি। সেটা একাগ্রতার ফলে জন্মায়। এই দৃষ্টিটুকু শিক্ষা ও সংযমের সাহায্যে আরও ভালো ভাবে তীক্ষ্ণ করে ফুটিয়ে তোলা যায়। চর্চা করলে স্মৃতি-শক্তি বাড়ানো যায়, এটা তোমরা নিশ্চয়ই জানো। পুরাকালে যখন লেখার প্রচলন ছিল না, ঋষিতুল্য পণ্ডিতরা শাস্ত্র রচনা করে মুখে মুখে শিখিয়ে দিতেন শিষ্যদের। এইভাবে শিষ্য থেকে প্রশিষ্যের দল শাস্ত্র কণ্ঠস্থ করে ফেলেছিলেন। শ্রুতি আর স্মৃতির মধ্যেই প্রাচীন কালের বেদ, মহাকাব্য, পুরাণ, শাস্ত্র প্রভৃতি বিদ্যাগুলি টিঁকে ছিল। পরবর্তীকালে লিপিবদ্ধ হয়ে পুঁথির আকারে সেগুলি চিরকালের সামগ্রী হয়ে রইল। তা হলে দেখা যাচ্ছে, অভ্যাসের দ্বারা স্মৃতিকে প্রবল ধারণা-শক্তিতে পরিণত

করা যায়। তেমনি অনবরত চর্চা করলে দৃষ্টির তীক্ষ্ণতা বাড়ানো যায়। তন্ময়তা বা অভিনিবেশের ফলে দৃষ্টি সজাগ হয়ে ওঠে। অন্য অনেকের চোখে যেটা এড়িয়ে যায়, নিবিষ্ট মন নিয়ে দেখতে শিখলে সেটা ধরা পড়ে। অনেক খুঁটিনাটি দরকারী জিনিস দেখতে জানেন শিল্পী ও বৈজ্ঞানিক, কেননা তাঁদের দৃষ্টি ধারালো। একেই বলে অন্তর্দৃষ্টি।

মহাভারতে কৌরব রাজকুমারদের অস্ত্রশিক্ষার পরীক্ষার গল্পটা মনে আছে তো? গাছের ডালের ওপর বসানো নকল পাখীটিকে দেখতে গিয়ে কুরুবংশের রাজপুত্রেরা একে-একে বললেন, আশ-পাশের অনেক জিনিস তাঁরা দেখতে পাচ্ছেন। কিন্তু অর্জুন এক-মন নিয়ে দেখেছিলেন কেবলমাত্র ঐ পাখীর মাথাটিকে। দ্রোণাচার্যের শিক্ষা ও নির্দেশ তাই সফল হয়েছিল প্রিয় শিষ্যের দৃষ্টি-সাধনায়। এই যে তীক্ষ্ণ, সংহত, অভ্রান্ত দৃষ্টি—যা একটি জিনিসের উপর ঝুঁকে পড়ে বাহ্যজ্ঞানহীন হয়ে, এটা বহুদিনের সাধনার বস্তু। অভ্যাস বা অনুশীলন না করলে এ দৃষ্টি খোলে না। অনন্য মন নিয়ে না দেখলে সত্যিকারের জ্ঞান অর্জন করাও যায় না।



জীবনে, বিশেষ করে অধ্যয়ন-ব্রতী ছাত্র-জীবনে, এই একাগ্রতার প্রয়োজন ও দাম কতোখানি, তা আর বলে দিতে হবে না।

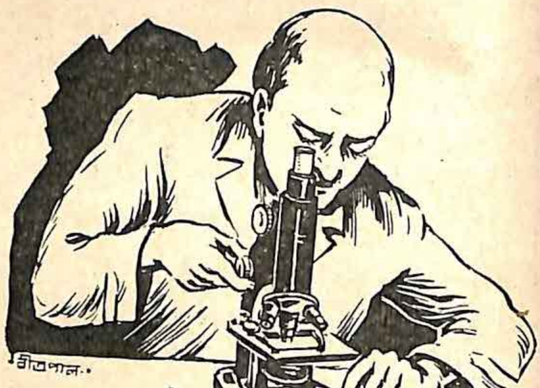
দরবেশ আর উটের গল্প যদি পড়ে থাকো, তা হলে তোমাদের মনে পড়বে দরবেশের আশ্চর্য ক্ষমতার কথা। পথের ধূলোয় পদ-চিহ্ন আর রাস্তার শুধু একধারে ছড়ানো শস্য-কণাগুলি নজর করে দরবেশ অনুসন্ধানী বণিকদের বলে দিতে পেরেছিল যে দলভ্রষ্ট উটটি ছিল কানা এবং খোঁড়া!

আর কনান ডয়েলের অমর সৃষ্টি শার্লক হোম্‌সের কার্যকলাপের সঙ্গে যদি তোমাদের পরিচয় হয়ে থাকে, তা হলে বুঝবে যে পর্যবেক্ষণ-শক্তির নমুনায় তাঁর তদন্ত-কাহিনীগুলি ভোজবাজির মতই অদ্ভুত। সাধারণ লোকে যা দেখছে, যে চোখ দিয়ে দেখছে, তিনিও তাই করছেন। তার বেশি কিছু নয়। কিন্তু হোম্‌সের দৃষ্টি-শক্তি এতই তীক্ষ্ণ যে একটা টুপি, লাঠি কিংবা ঘড়ি দেখে তিনি

তার মালিকের চেহারা, চরিত্র, অভ্যাস প্রভৃতি খুঁটিনাটি খবরগুলো আশ্চর্য নির্ভুলভাবে বলে দিতে পারেন। লোকের তাক লেগে যায়। কিন্তু যখন লোকে বুঝতে পারে তাঁর অনুসন্ধানপদ্ধতির কৌশলটা আসলে কি, তখন তারা ভাবে, এটা কত সহজ! সবই চোখের সামনে ধরা রয়েছে, অথচ এই রকম করে জিনিসটা তো দেখিনি, বুঝিনি! সত্যিই সহজ, কেননা দেখার চেয়ে সরল ও স্বাভাবিক কাজ কি আর থাকতে পারে? তবু ঐ বিশেষভাবে, হোম্‌সের মতন, মন দিয়ে চেয়ে দেখাটাই হল কঠিন কাজ।



এই পর্যবেক্ষণ শক্তি যার যত ধারালো, বিচার-বুদ্ধি তার ততই উন্নত ও মার্জিত, অনুমান এবং সিদ্ধান্তগুলো তার ততই নির্ভুল ও সত্য। বিজ্ঞানে এই পর্যবেক্ষণের বিশেষ মূল্য ও প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করা হয়েছে। কোনো একটি বৈজ্ঞানিক সত্যে পৌঁছুবার আগে তথ্য সংগ্রহ এবং নিরূপণ করা দরকার। তা করতে হলে প্রথমে নিরীক্ষণ অর্থাৎ ভালো করে দেখা আবশ্যক হয়। তারপর তথ্য সংগ্রহের পালা শেষ হলে গ্রহণ-বর্জনের পদ্ধতি প্রয়োগ করতে হয়। অর্থাৎ বিভিন্ন তথ্য একত্র জড়ো করে যেগুলি দরকারী সেগুলিকে নির্বাচন করে কাজে লাগাতে হয়। এর পর নানা রকম পরীক্ষার সাহায্যে অনুমানটিকে যাচাই করে নিলে তবে একটা স্থির সিদ্ধান্ত প্রমাণিত হয়। বৈজ্ঞানিক গবেষণার প্রথম সিঁড়ি হল তাই পর্যবেক্ষণ, বিজ্ঞানের ভাষায় অব্‌জারভেশ্যন। খুব সাধারণ একটা দৃষ্টান্ত দিতে গেলে হরেক রকম রোগের বীজাণু নিয়ে যে সব রিসার্চ বা গবেষণা হয়েছে, তার কথা উল্লেখ করতে হয়। গোড়ার দিকে, নিরীক্ষণ করা



প্রয়োজন। তারপর সন্ধানী দৃষ্টির সাহায্যে বৈজ্ঞানিকরা অনেক প্রকার রোগের তথ্য খুঁজে, উপসর্গ নজর করে' নানা পরীক্ষার মধ্য দিয়ে আবিষ্কার করেছেন—কোন্ কোন্ রোগের বীজাণু কি ভাবে মানুষের দেহে বাসা বাঁধে এবং তার প্রতিকারই বা কি। এই পরীক্ষাই হল এক্‌স্‌পেরিমেণ্ট।

অতএব দেখা যাচ্ছে, বৈজ্ঞানিক যে কোনো কাজই করুন, নিরীক্ষা আর পরীক্ষার মধ্য দিয়েই তাঁকে এগুতে হবে। এবং এ দুটি কাজেই সতর্ক আর একাগ্র দৃষ্টি না থাকলে কিছুই করবার জো নেই।

বৈজ্ঞানিকের চোখে যে দৃষ্টি অর্থাৎ যে চোখ আর মন নিয়ে গণিত, রসায়ন, পদার্থবিদ্যা, নৃতত্ত্ব ও সমাজ বিজ্ঞানের পণ্ডিতরা অনুসন্ধান আর গবেষণায় অগ্রসর হন, সেটা হ'ল সজাগ বিশ্লেষণের দৃষ্টি। প্রকৃতির মধ্যে, মানুষের মধ্যে, সমাজের মধ্যে খণ্ড খণ্ড তথ্যগুলিকে সেই দৃষ্টির সাহায্যে ভালো করে বাছাই ও যাচাই করাই তাঁদের প্রধান কাজ। এ ছাড়া আর এক রকমের দৃষ্টিও আছে। তার কাজ টুকরো টুকরো ভাগ করে দেখা নয়। সেটি হল সমগ্র দৃষ্টি, যার সাহায্যে দেখা জিনিসগুলোকে একত্র করা হয়। এই সব তথ্য বা সত্যকে একত্র করে দেখা ও বোঝার নাম সমীকরণ, সন্নিবেশ। জগতে বিচিত্র সৃষ্টি। সেই সৃষ্টির বিভিন্ন অংশে যে সব প্রকাশ্য পদার্থ রয়েছে, যারা নিত্যই বদলাচ্ছে, তাদের মধ্যে থেকে একটা বড় অখণ্ড সত্যের সন্ধান বা আভাস পেয়েছেন বহু জ্ঞানী, কবি ও শিল্পী। তাঁদের দৃষ্টিও কম জোরালো নয়। বৈজ্ঞানিক দৃষ্টির সঙ্গে তাঁদের দেখার তফাৎ এইখানে যে তাঁদের দৃষ্টির সীমা খণ্ডিত নয়, কয়েকটি পরীক্ষাধীন তথ্যের মধ্যে আবদ্ধ নয়,—আরও বিস্তৃত এবং ব্যাপক। তাই বহু বিচিত্রের ভিতর তাঁরা একের সন্ধান পান, নিখিল জগতে তাঁরা একই বিরাট সত্যকে চরম উপলব্ধি করেন। কবি শিল্পীর ধ্যান বা অন্তর্লোক শুধু কল্পনার বিলাস নয়। একটি বিশেষ ধরণের মানস দৃষ্টি বা গভীর অনুভূতি। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের চোখে এ দৃষ্টি ছিল আর ছিল আচার্য জগদীশচন্দ্রের।



আবার সকল সৌন্দর্য ও শিল্প-ধারণার মূলে আছে এই দৃষ্টি। এটা অন্তর দিয়ে দেখবার ভঙ্গী। নানা ভাবে, নানা সময়ে, সেই সৌন্দর্যকে দেখে ধীরে ধীরে রস গ্রহণ করতে হয়, তবেই জন্মায় সৌন্দর্য-জ্ঞান। কেউ বা একবার দেখা মাত্রই আনন্দে উত্তেজনায় অধীর। কেউ বা শান্ত নীরব দৃষ্টি দিয়ে দেখেন, সংযত হয়ে আপনাকে প্রকাশ করেন। কিন্তু সকল সৌন্দর্য-প্রিয় ব্যক্তিই আনন্দময় রসঘন দৃষ্টিতে দেখেন এই জগতের বিচিত্র রূপকে, মানুষের হৃদয়ের বিচিত্র ভাবনা-অনুভূতিকে। এক ইংরেজ কবি তাই চমৎকার বলেছেন, 'Look thy last on all things lovely,'—অর্থাৎ চোখ ভরে দেখে নাও জীবন ও জগতের নিত্য সৌন্দর্য-স্রোত। হয় তো এই শেষ দেখা, আর এমন সুযোগ না-ও মিলতে পারে।

এই দেখাটাই চরম আনন্দ, সকল শিক্ষা আর সৃষ্টির প্রেরণা। অনেক অনেক দিন ধরে উঁচু দরের গান না শুনলে যেমন ভালো গাইয়ে হওয়া যায় না, শ্রুতি ঠিক হয় না, কান তৈরি হয় না, তেমনি অনেক ভালো ছবি না দেখলে কিংবা প্রকৃতিকে ঠিক মত ভালোবেসে না দেখলে ও বুঝলে

সত্যিকারের শিল্পী ও কবি হওয়া যায় না। বহু মানুষকে তেমনি আবার না চিনলে সত্য অভিজ্ঞতা জন্মায় না, মানুষের হৃদয় আর চরিত্র নিয়ে সাহিত্য রচনা করাও সম্ভব হয় না। কবি শিল্পী ও সাহিত্যিক



আমাদেরই মতন চোখ দিয়ে দেখেন সত্যি। কিন্তু দৃষ্টির ভঙ্গী অনন্য বলেই তাঁরা যে সব জিনিস বুঝতে পারেন, যে সুর রঙ ও কথা দিয়ে সৌন্দর্য-সৃষ্টি করেন, আমরা তা কিছুতেই পারি না।

সমাজে মানুষের নিত্য সংস্পর্শে থেকে যে লোক চোখ খুলে রাখে, সে-ই জেতে। কেন না জীবনের জটিল পথে চোখ বুজে চলার মত নির্বোধ কাজ আর কিছু নেই। যার দৃষ্টি সজাগ, যে তলিয়ে দেখতে জানে, অল্প চেষ্টাতেই সে অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা করে নেয়। সাংসারিক ব্যক্তিই বলো আর কবি শিল্পী কিংবা জনগণের নেতাই বলো, যাঁর চোখ খোলা এবং যার দূর-দৃষ্টি আছে, তিনি চট করে বিপদে পড়েন না। সজাগ দৃষ্টি-ব্যবহারের ফলে তাঁর ধারণা-শক্তি হয় তীক্ষ্ণ এবং স্পষ্ট। এঁদের মধ্যে আবার যে মানুষ নীরবে দেখার কাজ সারেন, সহসা মতামত ব্যক্ত করেন না, তিনিই হলেন বিজ্ঞ ও বিচক্ষণ ব্যক্তি। ঠিক মত দেখা ও বোঝাটাই আসল। খামোকা বেশি কথা বলা কিছু কাজের কথা নয়।

এতক্ষণ ধরে এই যে বিশেষ ধরনের দেখার কথা বললুম, সেটা শিক্ষা ও সাধনার ব্যাপার। কি ভাবে কোন্ জিনিস দেখতে হয়, এটা যদি তোমরা শেখো, তা হলে লাভবান্ হবে। তীক্ষ্ণদৃষ্টি ভালো ক্রিকেট খেলোয়াড়ের মতই ঠিক সময়টিতে নির্ভুল কৌশলে ব্যাট্ চালিয়ে নিজেদের জীবনে উইকেট বাঁচাতে শিখবে, 'রান' তুলতেও পারবে।......



কি দিয়ে মারলো? দেখি ত!



পুকুরে মাছ আছে দেখছি।



বাহবা! বেশ খাওয়া যাবে!

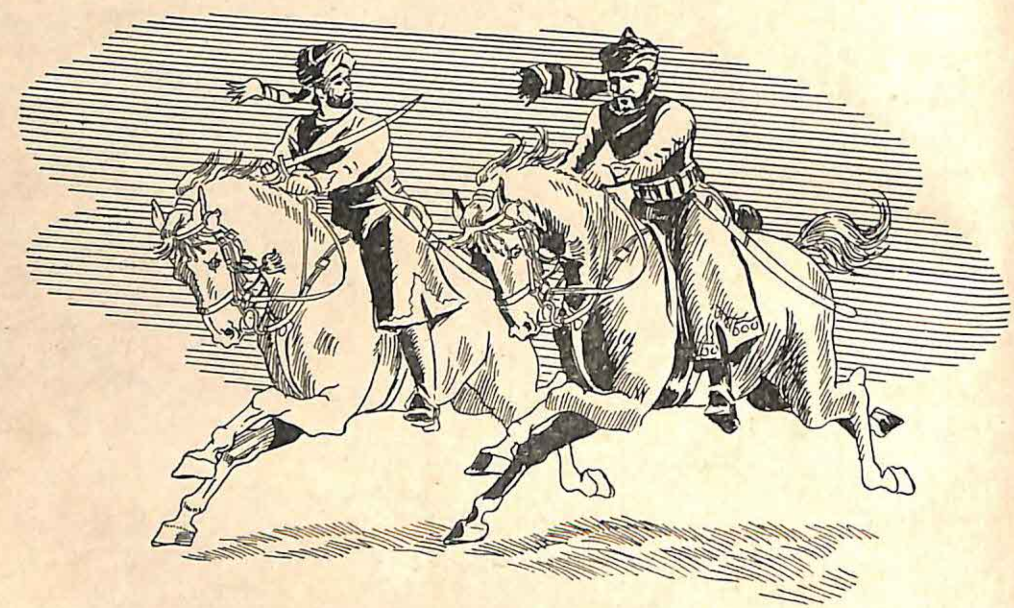


শের শাহ্ ও বৈরাম খাঁ

শ্রীকালিদাস রায়

কণোজের কালসমর হয়েছে শেষ
হুমায়ুন আজ সম্বলহারা পথে পথে দরবেশ।
নিরুপায় হয়ে বৈরাম খান ঘুরিয়া ছদ্মবেশে
বাদশার খোঁজে, সঙালে এসে শেষে
আশ্রয় নিল মিত্রতা স্মরি মিত্রসেনের দ্বারে
সেথা কিছুদিন রাজকীয় দরবারে
হয়ে সে রহিল ছদ্মবেশেই মুসাফির একজনা।
সেখানেও ছিল শের শা'র চর, গোপন তা' রহিল না।
শের শা লিখিল—"দুটো মাথা কার ঘাড়ে ?
মোর দুশমনে রাখিবে গোপনে ? পাঠাইয়া দাও তারে
নহিলে পাইবে উচিত মতন সাজা,
রাজ্যও যাবে গর্দ্দানও যাবে, রাজা।"
শের শা'র সাথে পারে কি যুঝিতে নিরীহ মিত্রসেন ?
শের শা'র হাতে বৈরামে সঁপিলেন।

শেরশা তাঁহারে দোস্ত্ বলিয়া করিলেন মুলাকাত
বলিলেন, "হলে আজ হতে তুমি আমার ডাহিন হাত।
হুমায়ুন আজ পথের ফকির সম্বল নাই তার,
দিলাম তোমারে মোর ফৌজের ভার।"
বীর বৈরাম দৃপ্তকণ্ঠে কয়,
"মোগল হইয়া পাঠানের দাস জীবন থাকিতে নয়।"
হ'ল ক্ষণিকের দোস্তির অবসান
মোগলবীরের কারাগারে হ'ল স্থান।



গোয়ালিয়রের শাসনকর্ত্তা আবুল কাসেম বীর
বন্ধু সে ছিল মোগলের সেনানীর,
কারাগার হ'তে উৎকোচ দানে তারে উদ্ধার করি'
পলাল দুজনে দুইটি ঘোড়ায় চড়ি;
গভীর আঁধার রাতে
হায় অদৃষ্ট, দেখা হ'ল পথে রক্ষিগণের সাথে।

হাঁকিল তাহারা, "কোথা যাও, হও খাড়া"।
আবুল কাসেমে বৈরাম ভাবি বন্দী করিল তারা।
বৈরাম বলে—"কেন হেন ভুল করো ?
আমি বৈরাম আমারে তোমরা ধরো।"
কাসেম বলিল—"মিথ্যা একথা, আমিই ত বৈরাম,
ও মোর ভৃত্য দিতে চায় জান, রহমন ওর নাম।"
সুপুরুষ দেখি আবুল কাসেমে নিয়ে গেল তারা ধরি'
সেই গোলমালে বৈরাম গেল সরি'।

শের শাহ্ রেগে কয়,
"আবুল কাসেমে ধরিয়া আনিলি বৈরাম এত নয়।...
আবুল কাসেম সহায় হয়েছ শত্রুর পলায়নে ?
এর কি দণ্ড ভেবে কি দেখেছ মনে ?"
কাসেম বলিল—"মৃত্যুদণ্ড! তাই জাঁহাপনা চাহি
বৈরাম বেঁচে একদা ফিরাবে মোগলের বাদশাহি।"
বলিলেন শের, "রও গিয়ে কারাগারে
বৈরাম যদি ফিরাইতে কভু পারে
মোগলের বাদশাহি
লভিবে তখনি মৃত্যুদণ্ড, রেহাই তোমার নাহি।"

অন্য লোকে স্বদেশকে একটা জড় পদার্থ, কতগুলো মাঠ-ক্ষেত্র-বন-পর্ব্বত-নদী বলিয়া জানে; আমি স্বদেশকে মা বলিয়া জানি, ভক্তি করি, পূজা করি।

—**শ্রীঅরবিন্দ**



রাজনারায়ণের দেউল

শ্রীভবানী মুখোপাধ্যায়

ঠাকুর দেবতারও সুসময় দুঃসময় আছে। পুরাণের পাতায় ত' এমন কত কাহিনী ছড়িয়ে আছে। বৈদিক যুগে মর্ত্যের মানুষ আর স্বর্গের দেবতাদের মধ্যে একটা যোগাযোগ ছিল। শান্তির আশায় মানুষ ছুটতো দেবতার কাছে, পূজার নৈবেদ্য, মূল্যবান্ উপচার নিয়ে দেবার্চনা করতো, আনন্দ পেত। তখনকার দিনে বড়ো বড়ো মঠ-মন্দির দেউল বানিয়ে দেবতার প্রতিষ্ঠা হ'ত, ভাস্কর্যের অপরূপ নিদর্শন, মণি-মাণিক্যের বিচিত্র সমাবেশ, চারিদিকে ভরে থাকতো স্বর্গীয় সুষমা। দক্ষিণ ভারতের বিরাট মন্দির আর কাশীর গঙ্গার তীরে এখনও এমন সহস্র নিদর্শন ছড়ানো রয়েছে।

আমাদের বাংলাদেশের সর্বত্র ছড়ানো আছে কত প্রাচীন দেউল আর মন্দির। সংস্কারের অভাবে অনেক ধ্বংস হয়েছে, জীর্ণ হয়েও কিছু এখনো টিকে আছে, আর বিধর্মীর অত্যাচারে লুণ্ঠিত হয়ে কিছু ধ্বংস হয়েছে। সে রামও নেই আর সে অযোধ্যাও নেই। মন্দিরের মাথায় বটগাছ—অশ্বত্থগাছ মৌরসীপাট্টা নিয়ে কায়েম হয়ে বসেছে,—রত্নালঙ্কার লুণ্ঠিত, আর বিগ্রহ কোথাও আছেন, কোথাও বা অদৃশ্য। ভাস্কর্যের নিদর্শন সামান্যই আছে, প্রত্নতাত্ত্বিকরা খুলে নিয়ে গেছে, বিদেশের হাটে চড়া দামে বিক্রী হয়েছে।

নালিপুরের রাজারা এমনই অনেক মন্দির প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। তখন দিন কাল ভালো ছিল, দেবসেবায় কোনো ত্রুটী ছিল না। কালক্রমে সেই মন্দির আজ ধ্বংসপ্রায়; দেববিগ্রহ নাকি ছিল সোনার, সে মূর্তি নেই। রাজা রাজনারায়ণের বংশধর—ছোট তরফের ইন্দ্রনারায়ণ অনুগ্রহ করে অষ্টধাতুর ছোট একটি দশভূজা মূর্তি এই দেউলে প্রতিষ্ঠা করেছেন,—আজো সেই মূর্তি পূজা হচ্ছে, তবে তেমন জৌলুষ নেই। দেবীর নামানুসারে গ্রামের নাম হয়েছে বিশালাক্ষীতলা। পূজার চারদিন একটু জমে, নইলে পুরোহিত ঠাকুর ছাড়া সামান্য দু'চারজন ভক্ত নিয়মিত আসা যাওয়া করেন। রাজপরিবার থেকে একটা বরাদ্দ আছে, আর পাঁচজনের প্রণামী, এতেই দেবীর পূজার্চনা হয়ে থাকে।

সে বছর কিন্তু যাত্রীর সংখ্যা বেশ বেড়ে গেল। ভুলুয়া বাবা হঠাৎ শীতের মাঝামাঝি এই মন্দিরে এসে আস্তানা নিলেন। ভুলুয়াবাবা সিদ্ধপুরুষ, ত্রিকালজ্ঞ সন্ন্যাসী, যাকে যা বলেন ঠিক ঠিক ফলে। কত রোগীর রোগ সারলো, কত বেকারের চাকরী হল, কত মামলাবাজ মামলা জিতলো কে তার হিসাব রাখে? রোগা মানুষটি, পাকা দাড়ি, মাথায় জটা, সহসা বয়স অনুমান করা যায় না, সৌম্য, শান্ত, মূর্তি। পরনে গৈরিক। নাটমন্দিরে ব্যাঘ্রচর্মের ওপর আসন করে বসেছেন। সারা দিন রাতই যেন সমাধিস্থ থাকেন, মাঝে মাঝে কয়েকটি কথা বলেন, সামনে ধূনী জ্বলছে। একটি শীর্ণ চেলা তাঁর পরিচর্যা করছে, সে-ই সব করছে, মাঝে মাঝে সামান্য একটু দুধ গুরুজীকে অনেক অনুনয় বিনয় করে দেয়। সাধুজী যেন অনশনেই আছেন, খাদ্যে কোনো আগ্রহ নেই।

মন্দিরের দুজন প্রাচীন পুরোহিত তাঁকে অতিশয় শ্রদ্ধা করে। মন্দিরের পক্ষেও তাঁর এই উপস্থিতি পরম প্রয়োজনীয়। প্রতিদিন অসংখ্য যাত্রী আসছে, খুচরো প্রণামী পড়ছে বেশ। যোগীর নাম মুখে মুখে গ্রামে গ্রামে ছড়িয়ে পড়ছে, তাঁর অলৌকিক শক্তির কথাও সেই সঙ্গে প্রচারিত হচ্ছে। যোগীবর সৎ উপদেশ দেন, মনের কথা টেনে বলেন, ভবিষ্যৎ সম্পর্কে সতর্ক করেন। শুধু তাঁর চরণ-কমল স্পর্শেই নাকি পরম শান্তি পাওয়া যায়।

মূল দেউলে বিশালাক্ষীর অষ্টধাতু মূর্তি, অন্ধকারেও জ্বলছে, সামনে ঘৃতের প্রদীপ দিনরাত জ্বলে। পুরাতন মূর্তির সঙ্গে ছোটখাট মূর্তিগুলিও ভেঙে চুরে গেছে, রাজারা এই ছোট মূর্তিটি প্রতিষ্ঠা করে মন্দিরের পবিত্রতা বজায় রেখেছেন। ভারী সুন্দর মূর্তি, চোখ দুটিতে বহুমূল্য পাথর বসানো, চক্‌চক্‌ করে দিনরাত। কপালে সোনার মুকুট, জড়োয়ার কাজ করা। প্রতিদিন পূজারীরা সযত্নে দেবীর পূজার্চনা করেন, চন্দনে লিপ্ত করে লাল জবা আর শ্বেতচম্পকে দেবীর বেশ করা হয়। ভুলুয়াবাবা রাতের আরতির সময় এসে দাঁড়ান, কিছু বলেন না, শুধু দুচোখ বেয়ে জল পড়ে।

মাঝে মাঝে ভীড় বাড়লে ভুলুয়াবাবা বাইরে পঞ্চবটীতলায় গিয়ে বসেন, অল্পস্বল্প ধর্মকথা আলোচনা করেন, কোনোদিন বলেন না কিছুই, ধ্যানস্থ হয়ে থাকেন। শ্রোতারাও নীরবে বসে চলে যায়, বলে, কি অপরূপ শান্তি পেলাম।

সেদিন সারাবেলা ধরে বৃষ্টি হয়েছে, শ্রাবণের অমাবস্যা এগিয়ে আসছে, পূজারীরা তারই আয়োজনে ব্যস্ত। ভক্ত যাত্রীর সংখ্যাও কম, নাটমন্দিরে ভুলুয়াবাবার সামনে দু'চারজন বসে ছিল। আরতি সেরে পূজারীরাও এসে বসেছেন, বাবার কাছে দুচার কথা শুনবেন। রাত অনেক হল, একে একে লোকজন কমছে, সহসা ভুলুয়াবাবার মুখভঙ্গী কেমন কঠোর হয়ে উঠল। তিনি চঞ্চল হয়ে উঠলেন। তারপর মৃদু হেসে আবার চোখ বুজলেন। বোধকরি সমাধিস্থ হলেন।

যাত্রীরা চলে যাওয়ার পর অনেকক্ষণ পর্যন্ত পূজারীরা বাবার কাছে নীরবে বসে রইল। তারা বেশ আনন্দে আছে, বড় পেতলের থালায় প্রণামী জমেছে অনেক,—নৈবেদ্যও কিছু কম নয়।

ছোট পূজারী উঠলেন, ঘৃতের প্রদীপটা উস্‌কিয়ে দিতে হবে। এই প্রদীপ কোনোদিন নেভানো হয় না। সেই প্রথম দিন থেকেই সমানে জ্বলছে।

সহসা বৃদ্ধ পূজারীর আর্তনাদ শোনা গেল। হাঁফাতে হাঁফাতে নাটমন্দিরে ছুটে এসে বল্লেন—"বাসুদেব! সর্বনাশ হয়েছে, অষ্টধাতুর দেবীমূর্তি নেই,—কেউ চুরি করেছে!"

ছোট পূজারী বাসুদেব তৎক্ষণাৎ উঠে দাঁড়ালো, আতংক ও ভয়ে কম্পিতকণ্ঠে বলে ওঠে—"বলেন কি মহারাজ, দেবীমূর্তি নেই। দেবীর অলঙ্কারের লোভেই কেউ এ কাজ করেছে।"

পরস্পরের মুখের পানে গভীর হতাশায় নীরবে তাকায়। মূর্তির অভাবে হয়ত মন্দিরটাই ধ্বংস হয়ে যাবে, দেবোত্তরের বাঁধা বরাদ্দ হিসাবে রাজবাড়ী থেকে যে মাসোহারা আসে তাও বন্ধ হয়ে যাবে। সহসা বৃদ্ধ পুরোহিত জয়দেবের মাথায় এক বুদ্ধি খেলে যায়। ভুলুয়াবাবার পায়ে লুটিয়ে পড়ে জয়দেব।

তিনি কেমন স্তব্ধ হয়ে বসে আছেন, কোনো কিছুই বল্‌ছেন না। জয়দেব আর্তকণ্ঠে বলে—"বাবা, আপনি একটা উপায় করে দিন। আপনি আরতির পর একটু বিচলিত হয়ে উঠেছিলেন লক্ষ্য করেছি, আপনি নিশ্চয়ই সব জানেন বাবা!"

শূন্যদৃষ্টিতে জয়দেবের মুখের পানে তাকিয়ে থাকেন ভুলুয়াবাবা, যেন অন্য জগৎ থেকে মাটির সংসারে নেমে আস্‌তে তাঁর কষ্ট হচ্ছে।

তিনি অনেকক্ষণ পরে বল্লেন—"প্রতিমার অন্তর্ধানে কি তুমি খুব কাতর হয়েছ, জয়দেব? ঠিকই বলেছ আজ আরতির পর আমি একটু চঞ্চল হয়েছিলাম, আমার সামনেই বেঁটে মত একটি লোক বসেছিল,—মাথায় বড় বড় চুল, কাঁধে গামছা, সে-ই যাওয়ার সময় নিয়ে গেছে, কিন্তু তার এতটুকু উপকার হবে না। কিন্তু তুমি এত উতলা হচ্ছ কেন জয়দেব, দেবী নিজেই নিজের ব্যবস্থা করবেন। এ বিশ্বাস তোমাদের আছে ত?"

পুরোহিতদ্বয় কিন্তু এমনই কাতর হয়েছে যে ভুলুয়াবাবার এই নিঃস্পৃহ অনাসক্তি তাদের মনঃপূত হল না। অনেক পরামর্শের পর দু'মাইল দূরে নবগ্রামের ফাঁড়িতে খবর দিতে ছুটলো বাসুদেব। ঘণ্টাখানেক পরে একাই ফিরে এল। হাবিলদার সাহেব অন্য কেসের ব্যাপারে পাশের গ্রামে তদন্তে গিয়েছেন, তারপর দিন রাজনারায়ণের দেউলে তদন্তে আস্‌বেন।

পরদিন ভোর হতে না হতেই হাবিলদার সাহেব সেই জীর্ণ দেউলে এসে হাজির। প্রকাণ্ড চেহারা, ইয়া গোঁফ, জামার হাতার লাল ফিতায় পদমর্যাদার চিহ্নজ্ঞাপক তিনটি দাগ। সঙ্গে একটি পাহারাওলা। উভয়ে সারা মন্দিরপ্রাঙ্গণ বিশেষভাবে দেখলো, তারপর যে বেদীতে দেবী প্রতিষ্ঠিত ছিলেন সেই বেদীটাও দেখা হল।

সব দেখেশুনে হাবিলদার প্রধান পুরোহিত জয়দেবকে বল্লেন—"রাজা সাহেব এ খবর পেলে

রেগে অগ্নিশর্মা হবেন। এ যে সারাদেশের অমঙ্গল। আচ্ছা,—ঐ যে বেঁটে মত লোকটা মূর্তি নিয়ে পালিয়েছে তাকে তোমরা দেখেছ স্বচক্ষে ?"

পুরোহিতরা হাবিলদারকে নিয়ে ভুলুয়াবাবার কাছে গেল। আবার ধ্যানভঙ্গ করে ভুলুয়াবাবা চোখ খুল্‌লেন, পুনরায় সেই কথাই বল্‌লেন। হাবিলদার নোট বইটিতে সব কথা বিস্তারিত লিখল।

হাবিলদার প্রশ্ন করলেন—"ঠিক সেই সময় আপনি কোথায় ছিলেন; এখানে বসে ত' আর কিছু দেখা সম্ভব নয়।"

ভুলুয়াবাবা গম্ভীর গলায় বল্লেন—"এখান থেকে ত' নড়িনি বাবা, এখানে বসেই সব দেখ্‌তে হল।"

চতুর্দিকে স্তব্ধতা বিরাজ করে, এরপর আর কথা কওয়া চলে না, সাধুজীকে কে বল্‌বে যে আদালতে এই কথা হাকিম গ্রাহ্য করবে না, এ সাক্ষ্যের দাম নেই। পুরোহিতরা কিন্তু সাধুজীকে শ্রদ্ধা করে খুব, তাই এর বেশী আর প্রশ্ন করতে সাহস পায় না। যোগীরা যে ত্রিকালদর্শী এ বিশ্বাস তাদের আছে।

মুখের পান বাইরে ফেলে হাবিলদার আবার এগিয়ে এসে ভুলুয়াবাবাকে প্রশ্ন করে—"বাবা, আপনি যা বল্‌লেন তাতে ত' আমাদের কাজ হবে না, আর কিছু যদি বলেন। আপনি যার কথা বলছেন তাকে ধরা শক্ত, কোথায় তাকে খুঁজবো, কত বেঁটে মানুষ রয়েছে চারদিকে।"

সাধুজী কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বল্লেন—"আরো খবর চাও, কেথায় গেল জানতে চাও, তা বলতে পারি অবশ্য।"

আগ্রহভরে হাবিলদার বলে ওঠে—"বলুন মহারাজ। আমাদের কাজের সুবিধা হবে। এই চুরির কিনারা না হলে আমার চাকরী নিয়ে টানাটানি হবে।"

হাবিলদারের বিরাট চেহারার দিকে সস্নেহভঙ্গীতে তাকালেন ভুলুয়াবাবা, চোখ দুটিতে অপরূপ প্রশান্ত দৃষ্টি। বল্‌লেন ঃ "চোর কোথায় গেল জান্‌তে চাও,—তা অবশ্য বলা যায়।"

হাবিলদার অলৌকিক কাণ্ডকারখানায় তেমন বিশ্বাসী নন, তবু সাধুর কণ্ঠস্বরের অদ্ভুত দৃঢ়তায় তার বুকটা কেঁপে ওঠে, ভুলুয়াবাবার পা দুটি জড়িয়ে হাবিলদার বলে, "তা'হলে একটু সন্ধান দিন মহারাজ, আমরা খুঁজে দেখি।"

মাথা নীচু করে যোগী নিজের বুড়ো আঙুলের দিকে স্থিরদৃষ্টিতে অনেকক্ষণ তাকিয়ে রইলেন। বোধহয় ধ্যানস্থ হলেন, কিংবা নখদর্পণে সব কিছু দেখে নিলেন, তারপর গম্ভীর গলায় বল্‌লেন ঃ

"মন দিয়ে শোনো, বড় রাস্তা ধরে সোজা উত্তরদিকে যাও, মাইলটাক যাওয়ার পর বিরাট তেঁতুল গাছের কাছে তেমাথায় দাঁড়াবে, সেই তেঁতুলগাছটা পরশু রাতের ঝড়ে পড়ে গেছে। তার পাশ দিয়ে একটা সরু পায়ে চলা পথ জঙ্গলের দিকে গেছে। সেই পথ ধরে গেলে ছোট্ট গ্রাম, জেলেদের গ্রাম বোধ হয়। ঐখানেই তাকে পাবে, দেবীর মূর্তি নিয়ে বেশীদূর যেতে পারেনি।"

পাহারাওলা এই অঞ্চলে অনেক দিন আছে, সে বলে উঠে: "আমি ঐ রাস্তা চিনি, জেলেপাড়ার গ্রামও জানি, ওলাউঠার মহামারীর পর গাঁ-টা ফাঁকা হয়ে গেছে।"

তরুণ পূজারী বাসুদেব চুপি চুপি হাবিলদারকে বলে: "আশ্চর্য! অথচ বাবা আজ পনের দিন নাটমন্দির ছেড়ে কোথাও যান নি।"

সহসা ভুলুয়াবাবা আবার বলে উঠলেন: "একটা কথা বলা দরকার, লোকটা বোধকরি এতক্ষণে বেঁচে নেই। সে যখন এখানে ছিল তখনই বুঝেছি তার কর্ম শেষ হয়ে এসেছে, দেব-দেবীর সঙ্গে চালাকী চলে না বাবা,—দাম সে নগদ পেয়ে গেছে।"

এই কটি কথা বলেই ভুলুয়াবাবা আবার সমাধিস্থ হ'লেন। বৃদ্ধ পূজারী বাসুদেবকে বল্‌লেন, "তুমি বরং পুলিশের সঙ্গে যাও, আমার আর হাত পা চল্‌ছে না। সদানন্দটাও নেই যে ঘরদোর দেখ্‌বে।"

বাসুদেব বল্‌ল—"সদানন্দ কি দেশে গেছে?"

বৃদ্ধ পূজারী বল্‌লেন—"কি জানি! মাঝে মাঝে বেটার কি যে হয়। কখন যে পালিয়েছে বলে যায়নি।"

বাসুদেব চুপ করে রইলেন।

ভুলুয়াবাবার নির্দেশমত পথ খুঁজে পাওয়া গেল। পথটা কিছুকাল ব্যবহার না হওয়ায় কাঁটা লতায় ভরে গেছে, দু'এক জায়গায় আগাছা বেশ বড়ো হয়েছে। পথ চল্‌তে চল্‌তে হাবিলদার ভিজে মাটিতে পায়ের ছাপ লক্ষ্য করতে লাগ্‌লেন। সম্প্রতি কেউ সে পথে গেছে।

হাবিলদার বলে ওঠেন—"সাধু বাবা ঠিকই বলেছেন। কেউ এই পথে গেছে, পায়ের ছাপ দেখে মনে হয় বেঁটে খাটো পাতলা চেহারা।

অতি সঙ্কীর্ণ পথ, তিনজন পিছু পিছু চলেছেন, সহসা থেমে হাবিলদার বলে ওঠে—"শকুন উড়ছে দেখেছ? কাছাকাছি কিছু একটা মরেছে। ওরা ঠিক টের পায়। গরু বা মোষ হবে।

সামনে একটা পরিত্যক্ত জীর্ণ কুটির। কোনো বাড়ি থেকে ধোঁয়া উঠছে না বা শিশুদের কলরব শোনা যাচ্ছে না। শ্মশানের শান্ত নীরবতা। প্রাচীন বটগাছের তলায় কয়েকটি মনসা গাছ, রঙ-করা কলসী, পোড়ামাটির নাগ দেবতা। গ্রামের তেমাথায় এই ধরণের দেবতাস্থান বিরল নয়। ঠিক তার সামনেই মাথা নীচু করে কে একজন ভক্তের মত বসে আছে।

কাছাকাছি যেতেই একটা শিয়াল ছুটে পালাল। লোকটির কাঁধে গামছা। ভুলুয়াবাবা ঠিকই বলেছেন, সামনেই সেই অষ্টধাতুর দেবীমূর্তি, সূর্যালোকে রত্নালঙ্কার জ্বল্‌ছে। লোকটি কিন্তু মৃত। পুঁটলীর মত স্তব্ধ হয়ে আছে।

হাবিলদার চেঁচিয়ে ওঠে—"মহারাজ ঠিকই বলেছিলেন, একেবারে বামাল শুদ্ধ ধরা পড়েছে। "কিন্তু লোকটা মরলো কিসে। এযে আরেক ঝামেলা।"

বাসুদেব মহানন্দে এগিয়ে এলেন, কিন্তু দু'পা এগিয়েই থমকে দাঁড়ালেন। "আরে এযে সদানন্দ !"

হাবিলদার প্রশ্ন করলেন—"ওকে জানেন নাকি ?"

"হ্যাঁ, ও আমাদের দেউলের পুরানো পরিচারক।"

পাহারাওলা বল্লে—"ওকেই খুঁজে পাওয়া যায়নি ! এ কথা আগে বল্‌তে হয়।"

বাসুদেব কোনো উত্তর না দিয়ে আরো এগিয়ে মৃতদেহ দেখ্‌তে লাগ্‌লেন, তারপর বল্‌লেন—"সারা অঙ্গে কে যেন কালী লেপে দিয়েছে। সাপে কামড়েছে। এতদিন থেকেও বেটা লোভ সাম্‌লাতে পারলি না। দেবীর জিনিষ কি এত সহজে হজম করা যায়।"



হাবিলদার এতক্ষণে গোঁফে চাড়া দিলেন। বল্লেন—"রাজাবাবুদের কাছে একটা খবর দিয়ে দিতে হবে।"

বাসুদেব গম্ভীর গলায় বল্লেন—"জানো হাবিলদার সাহেব, আর একবার ঠিক এই কাণ্ড হয়েছিল, পঞ্চাশ বছর আগে ডাকাতরা যখন এই মূর্তি চুরি করে নিয়ে যায় তখন তাদের সর্দারকেও সাপে কামড়েছিল। মন্দির ভেঙে গেলে কি হয়, রাজনারায়ণের দেউলে দেবী স্বয়ং বাস করেন। সদানন্দ বেটা সব জেনেও এই কাণ্ড করলে।"

হাবিলদার হেসে বল্‌লেন—"লোভে পাপ, পাপে মৃত্যু, কিন্তু আপনার ভুলুয়াবাবা নিশ্চয়ই সব দেখেছিলেন, নইলে এত খবর জানবেন কি করে ?

বাসুদেব অদৃশ্য দেবতার উদ্দেশ্যে প্রণতি জানালেন।



দর্জিগিরি সহজ নয়

শ্রীধীরেন বল

ফটিককে নিয়ে কি করা যায়? স্কুল ফাইনালে এবারও ফেল করল ফটিক!

ফটিকের মা বলেন: দু' দু'বার তো দেখা হলো, ও পাশ করা যখন তোর অদেষ্টে নেই, তখন তুই দর্জিগিরিই শেখ ফটিক। গজেন বল্‌ছে ওতেই তুই বেশ উন্নতি কর্‌তে পারবি!

ফটিক জবাব দেয় না। মাথা নীচু করে গুম্ মেরে বসে থাকে।

গোবরা বলে: পাশ করবার জন্যে যখন তোর এতো আগ্রহ, তখন দু'বার ফেল করাতে হয়েছে কি? আবারো পড় তুই। কথায় বলে—Failure is the pillar of success. এগুলো ত ফেল নয়, এ তোর জয়স্তম্ভ!

ফটিক কি বল্‌তে গিয়ে একবার মুখ তোলে, কিন্তু কিছু না বলে আবার মুখ নীচু করে।

মা বলেন: তা' দু' দু'টো জয়স্তম্ভ ত হলো বাবা, আর বেশী স্তম্ভ বাড়িয়ে লাভ কি? স্তম্ভ একটাই বেশ!

গজেন বলে: সত্যিই ত মাসীমা, আর স্তম্ভ বাড়াতে গেলে, আপনারা শুধু হতভম্বই হয়ে যাবেন।

গোবরা বলে: King Bruce কি করেছিলেন জানো?

মা বলেন: তিনি কটা স্তম্ভ তুলেছিলেন বাবা?

গোবরা বলে: তিনি আঠারো বার —

বাধা দিয়ে মা বলেন: রক্ষে করো বাবা! আর কাজ নেই—

গজেন বলে: হ্যাঁ, এরপর আরো স্তম্ভ বাড়াতে গেলে আপনারাই শুধু নন, আমরা শুদ্ধু স্তম্ভিত হয়ে যাবো মাসীমা!

ফটিক বলে: দর্জিগিরি শিখতে আমার ত কোনো অমত নেই। ও খুব সহজেই শিখে যাবো বেশ লাভের ব্যবসা। কিন্তু গজেনের মামার ওখানে—

গজেন বলে ঃ গজেনের মামাকে 'কিন্তু' করলে চল্‌বে না ফটিক ! জানিস তো—'মাষ্টার টেইলর' বল্‌তে সহরে আজকাল আমার মামাকেই বোঝায় ! কত নাম-ডাক তার !

মা প্রশ্ন করেন ঃ সেখানে শিখ্‌তে কত দিন লাগে ?

গজেন বলে ঃ তা—বছর তিন-চার ত বটেই—

ফটিক বলে ঃ বলিস কি ? দর্জিগিরি শিখতে এক বছরই আমার যথেষ্ট ।

মা বলেন ঃ কালই তুমি গজেনের মামার ওখানে যাওনা। গেলেই সব মীমাংসা হয়ে যাবে।

গজেন বলে ঃ হ্যাঁ, তবে আমাদের সুরেনদা—মামার বড় সাকরেদ—মামার সব বিদ্যেই সে আয়ত্ত করে ফেলেছে। তার সঙ্গে যদি একটা প্রাইভেট ব্যবস্থা করে নিতে পারো, তার মর্জি হলে, অনেক আগেই হয়ত দর্জি হয়ে বেরিয়ে আস্‌তে পারবে। তবে বাপু, হাতটি তোমার দরাজ করতে হবে, দরজাও বল্‌তে পারো।

ফটিক বলে ঃ বেশ, তাই হবে ? কি বলো, মা ? দরকার হলে কর্জ করেও দর্জি হতে দ্বিধা করবো না।

গজেন বলে ঃ তা বেশ ! তবু কিন্তু মনে রেখো—দর্জিগিরি সহজ নয় !

নিউ বেঙ্গল টেলারিং হাউস।

চৌরঙ্গীর ওপর বিরাট দোকান গজেনের মামার। গজেনের মামা নিবারণবাবু মাষ্টার টেইলর। শিক্ষার্থী হিসাবে অনেকগুলি ছেলে এখেনে কাজ শেখে।

বেশ রাশভারী লোক নিবারণবাবু। মুখভর্তি এক জোড়া গোঁফের আড়ালে কখন্ কোন্ শুভ মুহূর্তে যে তিনি হাসেন বা আনন্দ করেন তা নিউ বেঙ্গল টেলারিং হাউসের কোনো হতভাগ্য শিক্ষার্থীই কখনো টের পায় না.। বাংলার বাঘ আশুতোষের ছবিটির মতো সব সময়ে তা গোঁফের আড়ালেই ঢাকা থাকে। বাইরে থেকে ধরা পড়ে না। সুতরাং নিবারণবাবুর মুখের দিকে চাওয়াও বারণ। কারণ বা অকারণে কখন যে তিনি চটে যাবেন—বলা যায় না।

ফটিককে দেখে নিবারণবাবু ভুরু কুঁচকে বাজখাঁই গলায় গজেনকে শুধোলেন ঃ এটিই বুঝি তোমার বন্ধু ফটিকচন্দ্র ?

গজেন বলে ঃ আজ্ঞে হাঁ। ফট্‌কেও বল্‌তে পারেন।

ঃ হুঁ, টেলারিং শিখ্‌তে চাও ? ফটিককে শুধোলেন নিবারণবাবু।

ফটিক বলে ঃ আজ্ঞে হাঁ।

ঃ বেশ ! তবে মন দিয়ে শেখো। বড় সাধনার কাজ, মনে রেখো।

এইটুকু মিষ্টিকথায় ফটিক গলে গেলো। জিজ্ঞেস করে বসল ঃ কত দিনে শিখ্‌তে পারবো স্যর ! গজেন প্রমাদ গণলে ! কিন্তু আশ্চর্য ! নিবারণবাবু একটুও রাগলেন না, দাঁত বের করে

খুব এক চোট প্রাণ খুলে হাসলেন। বোধ হয় জীবনে এই প্রথম। তারপর গম্ভীর গলায় ফটিককে বল্লেন : মনে রেখো ফটিক, এ ফট্‌কাবাজি নয় যে, রাতারাতি কার্যসিদ্ধি! ধৈর্য চাই, বুঝলে—ফটিক না ফট্‌কে—ধৈর্য চাই!

ফটিক জিজ্ঞাসা করে : তবু মোটামুটি কতদিন লাগতে পারে, স্যর?

মামার ভুরু জোড়া আবার কুঁচকে যায়। গলার স্বর গম্ভীর হয়। মামা বলেন : জেনে রাখো—দর্জিগিরি সহজ নয়। প্রথম এক মাস তোমাকে ছুঁচে স্থতো পরানো শিখতে হবে।

ফটিক বলে : ছুঁচে স্থতো পরানো আমি জানি।

: জানো? তবে তো দর্জিগিরি শেখা তোমার হয়েই আছে। ডেঁপো ছেলে, যাও যাও কাজ শেখোগে! প্রথম মাসে শিখ্‌বে ছুঁচে স্থতো পরানো, পরের মাসে শিখ্‌বে কি করে ছুঁচ ধরতে হয়, পরের মাসে কাঁচি—

: তার পরের মাসে বুঝি কাপড় ধরা শিখবো? ফটিক প্রশ্ন করে?

: হ্যাঁ হে ছোকরা! কি নাম যেন বল্‌লে—ফট্‌কে, না ফচকে? এখন ওপরে যাও, সেখানে প্রথম সাতদিন শিখবে কি ভাবে বস্‌তে হয়, কি ভাবে উঠ্‌তে হয়, আর কি ভাবেই বা লোকের সঙ্গে কথা কইতে হয়?

গজেন হিড় হিড় করে টেনে ফটিককে ওপরে নিয়ে গেল।

ওপরের ঘরে স্থরেনের সঙ্গে ফটিকের আলাপ করিয়ে দেয় গজেন। ফটিক ক্ষেপে গেছে। দর্জিগিরি সহজ নয়—তা'বলে এই এটমের যুগে তার গতি শামুকের মতো হবে কেন? একমাস ধরে যদি ছুঁচে স্থতো পরানো শিখ্‌তে হয়, তবে সেলাইটাই বা কলে হবে কেন? হাতেই হোক সেলাই। একমাস ধরে সেলাই হোক না একটা জামা।

স্থরেন হেসে বলে : তুমি বুঝি খুব তাড়াতাড়ি কাজটা শিখ্‌তে চাও ফটিক?

ফটিক বলে : তা-তো চাই। কিন্তু আপনারা যদি একমাসে ছুঁচে স্থতো পরানো শেখান, আর একমাসে ছুঁচ ধরা, একমাসে কাঁচি ধরা, একমাসে কাপড় ধরা—তাহলে আমার মানুষ-জন্মে দর্জিগিরি শেখা স্বপ্নই থেকে যাবে। পরজন্মে বাকিটুকু শেষ কর্‌তে হবে।

গজেন তীব্র গলায় বলে : পাগলামি করিস নে ফটিক! গাছে না চড়তেই এক কাঁদি। ধৈর্য ধরে শেখ, এজন্মেই হবে, পরজন্মের জন্যে আর বাকি থাক্‌বে না কিছু।

স্থরেন হেসে বলে : বেশ তো ফটিক, তুমি কত দিনের ভেতরে কাজটা পূরো শিখতে চাও?

: এক বছরে। দৃঢ় গলায় ফটিক বলে।

স্থরেন বলে : বেশ, তোমাকে আমি এক বছরেই সব শিখিয়ো দেবো। ছুঁচে স্থতো পরানো থেকে শুরু করে ছুঁচ ধরা, কাঁচি ধরা, কাপড় ধরা, স-অ-ব!

গজেন বলে : বোতামের ঘর বাঁধা, ড্রইং করা, ফিতে, শেপ-কাঠ, আঙুলস্তান, কল, ইস্তিরি কিছুই বাকি থাক্‌বে না তোমার!

সুরেন হেসে বলে : এক বছর পরে ফটিকচন্দ্র, দি মাষ্টার টেইলর।

আনন্দে গদগদ হয়ে ফটিক সুরেনের পায়ের ধুলো মাথায় নেয়।

তিনমাস হতে চল্‌লো ফটিক নিউ বেঙ্গল টেলারিং হাউসে দর্জিগিরি শিখ্‌ছে। এখানকার নিয়ম অনুসারে ওর এখন বোতামের ঘর বাঁধা শেখবার কথা, এবং নিবারণবাবুকে দেখ্‌লে সে বোতামের ঘর বাঁধতেই লেগে যায়। কিন্তু আড়ালে আড়ালে সে সুরেনদার কাছে পেনি, ফ্রক, ইজার, হাফ প্যান্ট, ফুলপ্যান্ট, সার্ট, পাঞ্জাবী, চাই কি সেদিন একটা সাধারণ কোটও কেটে ফেলেছে। অবিশ্যি কাপড়ে নয়, খবরের কাগজের ওপর কাঁচি চালিয়ে। আনন্দে অধীর হয়ে ফটিক আব্দার করে : সুরেনদা', আজ কিন্তু আমাকে ডবল ব্রেষ্ট কোট কাটা শেখাতে হবে।

সুরেন হেসে বলে : শেখাবো বৈ কি? নিশ্চয়ই শেখাবো। সামনে পূজোর আগেই তোমাকে পাকা দর্জি বানিয়ে তবে ছাড়্‌বো। কিন্তু যা খিদে পেয়েছে ফট্‌কে, কাঁচি ধর্‌বো এমন শক্তি পর্যন্ত আঙুলে নেই।

ফটিক ইঙ্গিত বোঝে। হেসে বলে : বেশ তো, টিফিনের সময় অনন্ত কেবিন।

সুরেনদা' খুলে নেয় একতাড়া আস্ত খবরের কাগজ, ফিতে আর রঙীন চক। ডবল ব্রেষ্ট কোট কাটা শিখে ফেলে ফটিক সেই দিনই।

একদিনের ঘটনা—পাঞ্জাবীতে একটা পাশ পকেট লাগিয়ে সুরেন কি কাজে একটু বাইরে গেছে, ফিরে এসে দেখে বাকি আর একটা পকেটও লাগানো কম্‌প্লিট। ফটিককে চটাতে পারে না সুরেন। কি করে? আবার সেটা খুলতে লেগে যায়।

কোনো জামার ড্রইং করে, তা ফেলে রেখে এদিক্ ওদিক্ নড়্‌তে পারে না সুরেন। ছাত্র সেটা কেটে কম্‌প্লিট করে রাখে কোন্ ফাঁকে। সুরেনের হয়েছে সাপের ছুঁচো গেলার দশা!

দর্জিগিরি সহজ না হলেও, ফটিক তাকে সহজ করে নিয়েছে। ফটিক সুরেনের পক্ষে জীবন্ত আতঙ্ক!

একদিন দোকানঘর থেকে বাজখাঁই গলায় নিবারণবাবু হাঁকেন : কাল যে কাজগুলো ডেলিভারী দেওয়া হয়েছিল, তার ভেতরে কি এ পাঞ্জাবীটাও ছিল সুরেন?

: আজ্ঞে হ্যাঁ স্যর!

: ওটা কেটেছি আমি, সেলাই করেছ তুমি?

: আজ্ঞে হ্যাঁ।

: দেখ্‌তো, ভদ্রলোকের গায়ে কেমন ফিট্ করেছে ওটা?

একটা কিম্ভূত-কিমাকার পাঞ্জাবী না কি একটা আলখেল্লার মতো গায়ে দিয়ে এক খদ্দের ভদ্রলোক দাঁড়িয়ে মিটিমিটি হাস্‌ছেন।

স্থরেন হাসবে, না কাঁদবে ? তার চক্ষু ত ছানাবড়া !

না আছে কোনো কাটিং, না আছে সেলাই ! একেবারে যাচ্ছে-তাই। পাঞ্জাবীটা গায়ে পরার পর ভদ্রলোককে ঠিক একটা সঙের মতো দেখাচ্ছে !

স্থরেন বোবা, কোনো জবাব দিতে পারে না সে। নিবারণবাবুর ধমক খেয়ে তার হুঁশ্‌ ফিরে আসে।

ওপরের ঘরে এসে গুম্‌ মেরে বসে থাকে সে।



ফটিক ভয়ে ভয়ে শুধোয় ঃ কি হলো স্থরেনদা' ?

স্থরেন বলে ঃ হবে আবার কি 'ছুনিয়া-না-মানে' পাঞ্জাবী সেলাই করার বখশিস পেলাম।

এই ঘটনার পর দশ-দিনও যায়নি ? হঠাৎ আবার নিবারণবাবুর আকাশ-ফাটানো চীৎকার !

ঃ স্থরেন !

তটস্থ হয়ে স্থরেন এসে নিবারণবাবুর কাছে দাঁড়ায় !

ঃ এ সার্টটাও কি তোমার সেলাই স্থরেন ?

ঃ আজ্ঞে হাঁ !

ঃ কেটেছি নিশ্চয়ই আমি ?

ঃ আজ্ঞে হাঁ।

ঃ চলো, এবার আমরা কলকাতার দোকান গুটিয়ে রাঁচিতে গিয়ে দোকান খুলি গে। পসার ভালো হবে সেখানে।

স্থরেন বুঝতে পারে না ব্যাপার কি ?

নিবারণবাবু সার্টটা সুরেনের দিকে ছুঁড়ে দিয়ে বলেন ঃ দেখো, এ সার্টটার যেমন কাটিং, তেমনি সেলাই! আস্ত পাগল না হলে এমন কাটিং আর এমন সেলাই হাত থেকে বোরোয় কারো? দেখ তো, কোন্ দেশী জামা এটা? আজকাল এখানে হচ্ছে কি?

ঃ আজ্ঞে কি করে বলবো, কি হচ্ছে? আমি ত ঠিকই সেলাই করে রেখেছিলাম।

ঃ আমিও ত ঠিকই কেটে রেখেছিলাম। কিন্তু বুঝতে পারলাম না কি করে রাতারাতি তা এমন বদ্‌খৎ হয়ে গেল!

ঃ আজ্ঞে, কিছুই ত বুঝছি না স্যর! সেই ছিট ঠিকই আছে, কিন্তু সেই কাটিংও নয়, সেই সেলাইও নয়!

ঃ বিরক্তভাবে নিবারণবাবু বলেন ঃ তোমার ঘরে নিয়ে গিয়ে বুঝ তে চেষ্টা করো! যাও! এই তোমাকে দ্বিতীয়বার 'ওয়ার্নিং দেওয়া হলো—মনে রেখো! শুক্‌নো মুখে নিজের ঘরে এসে বসে সুরেন।

টিফিনের সময় সুরেনকে আড়ালে ডেকে নিয়ে গজেন বলে ঃ সুরেনদা', একটা কথা বলবো?

নীরবে গজেনের মুখের পানে তাকায় সুরেন।

ঃ আমার সন্দেহ হয় এসব ফট্‌কের কাজ।

ঃ কোন্ সব?

ঃ এই যাচ্ছে তাই জামা সেলাই।

ঃ লুকিয়ে?

ঃ হাঁ।

ঃ লুকিয়ে কখন করবে ও?

ঃ বাড়ীতে বসে। হালে ও একটা সেলাই কল কিনেছে কিনা!

ঃ কিন্তু এ ছিটটা ছিল খদ্দেরের দেওয়া। নিবারণবাবুর কাটিং, আর সেলাই করেছিলাম আমি নিজে। একেবারে জামা কম্‌প্লিট মায় প্যাকিং।

ঃ কিন্তু সুরেনদা'—

ঃ গজেন ইতস্ততঃ করে।

ঃ কি বল্‌তে চাও, বলো।

ঃ কাল বাড়ী ফেরবার পথে ফটকে আমাকে সঙ্গে নিয়ে ছিটের দোকানে গিয়েছিল।

ঃ তাতে কি?

ঃ এখান থেকে কুড়িয়ে ঐ ছিটের একটা নমুনা সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিলো। বল্‌লে—ঠিক ঐ রকম ছিটটাই আমার মেজদার জন্যে চাই।

সুরেন মহা চিন্তায় পড়ে।

ঃ আমাদের সেই সেলাইকরা জামাটা তবে ব্যাগে করে বাড়ী নিয়ে গেছে সে ?

ঃ তাই সম্ভব। তবে আজ দোকানে এসেই তৈরী জামার প্যাকেটগুলো নিয়ে নাড়াচাড়া করতে দেখেছি তাকে !

রহস্যের ভেতরে তলিয়ে যায় সুরেন। তবু প্রশ্ন করেঃ এতে ওর লাভ ?

ঃ পরীক্ষা করে দেখছে, ওর তৈরী জামা আমাদের দোকানের তৈরী জামার সঙ্গে বাজারে চল্‌তে পারে কিনা !

ঃ সর্বনাশ, এ ধরণের ছাত্র আর দু'একজন থাকলে ত নিউ বেঙ্গল টেলারিং হাউস দুদিনেই লাটে উঠবে !

পরদিন ফটিককে ডেকে সুরেন বলেঃ আজ থেকে তোমার কাজ শেখা কম্‌প্লিট ফটিক। ক্ষণজন্মা ছেলে, তাই দর্জিগিরি শিখ্‌তে তোমার পূরো এক বছরও লাগল না। মাত্র চার মাসের ভেতরেই তুমি আমাদের সকল বিদ্যে আয়ত্তে এনে ফেলেছ! স্বয়ং নিবারণবাবু তোমাকে উপাধি দিয়েছেন 'মাষ্টার টেইলর'। ঘরে ফিরে এবার তুমি নিজেই দোকান দিতে পারো। সামনে পূজোর মরসুমে যাতে নিজে নিজেই বেশ কিছু কামাই করতে পারো, এই কথা মনে করেই আমরা তোমার মতো একজন গুণীকে আমাদের এখানে আর আবদ্ধ রাখ্‌তে চাই না। তোমাকে এখানে আর আস্‌তে হবে না, আজ থেকে তোমার ছুটি !

আনন্দে গদগদ হয়ে ফটিক বলেঃ বেশ বেশ! সুরেনদা', আমিও সেই রকম পরিকল্পনা মনে এঁটে একটা সেলাইয়ের কল কিনে ফেলেছি। আমার সে দোকানের তাহলে একটা নামকরণ করে দিতে হবে আপনাকে।

সুরেন বলে ঃ বেশ তো! নাম দাও দুনিয়া-না-মানে টেলারিং হাউস। বেশ সিনেমা ঢঙের নাম! ভালো না ?

খুশী হয়ে ফটিক বলেঃ বেশ নাম! আজকাল অনেক সাড়ীরও সিনেমা ঢঙের নাম আছে। যেমন, পথিক সাড়ী, আনারকলি সাড়ী, মানে না মানা সাড়ী।

সুরেন বলে ঃ তবে তো ভালই হলো। যাও, দোকান খুলে দাও গিয়ে এবার।

ফটিক তাদের বাইরের ঘরেই তার দোকান খুলে বসেছে। সুরেনদার কথামতো তার দোকানের নাম দিয়েছে—দুনিয়া-না-মানে টেলারিং হাউস। প্রোঃ শ্রীফটিকচন্দ্র মাষ্টার-টেইলর। শিশু এবং বালক-বালিকাদের পোষাক নির্মাণে সুদীর্ঘ দিনের অভিজ্ঞ কাটার।

এর পরের ঘটনা সংক্ষিপ্ত। ফটিক তার পাড়ার বাড়ী বাড়ী ঘুরে অনেক কাজ জোগাড় করে এনেছে। নিজেই মাপ-জোক নেয়, নিজেই কাটে, নিজেই সেলাই করে।

পূজোর আর দেরী নেই। পরশু থেকে পূজো শুরু। একা মানুষ সে, এক হাতে পেরে উঠ্‌বে কেন ? দম নেবার ফুরসুৎ পায় না, রাত জেগে কাজ করে। কাল সবগুলি কাজ ডেলিভারী না দিলেই নয়। খদ্দেররা এসে এসে ফিরে যাচ্ছে। কথা দিয়েছে সে—কাল সকালে অবশ্য সব কাজ ডেলিভারী দেবে।

সকাল থেকে ফটিকের দোকানে পাড়ার ছেলেমেয়েদের দারুণ ভিড়। কালই পূজো, এখুনি রঙীন জামাগুলি চাই তাদের। অন্য পাড়ার ছেলেমেয়েরা এরি মধ্যে রঙীন জামা পরে পরে রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়াচ্ছে।

ফটিক নম্বর মিলিয়ে মিলিয়ে এক এক করে জামা বের করে, আর পরিয়ে দেয় এক একজনকে। জামা পরে আনন্দে নাচ্‌তে নাচ্‌তে বাড়ীর পানে ছোটে তারা। গর্বভরা আনন্দে ফটিক একদৃষ্টে চেয়ে থাকে তাদের যাওয়ার পথের পানে।

সেদিক্ পানে চেয়ে থাকতে থাকতে ফটিকের নজরে পড়ে আর একদল সেই পথেই ছুটে আসছে এই দিকেই। ব্যাপার কি ? এরি মধ্যেই কি ছেলেমেয়েদের মুখে মুখে ছড়িয়ে পড়লো তার সুনাম। ফটিক লক্ষ্য করে সেই সব ছেলেমেয়ের অভিভাবকের দল এঁরা। ছুটে আসছে সবাই তার দোকান লক্ষ্য করে।

ঃ ওহে! এ-কী করেছ ? এ জামা কি হনুমানে গায় দেবে ? এ যে মাপ-জোখের কোনো বালাই নেই!

ঃ ওহে ফটিক! আমার ছেলে কি শুয়োর ? বুক-গলা যে সব সমান! দেখতো, কোনো পাশ বালিশের ওয়াড়ের সঙ্গে বদল হয়েছে বুঝি!

ঃ এ কি মশাই গঙ্গা ফড়িংএর জামা ? এত সরু হাতার ভেতরে প্যাঁকাটি ছাড়া কিছু যে গলতে চায় না!

ঃ ওহে, ছেলে কি আমার খোঁড়া নাকি ? প্যাণ্টের এক পা ছোট, এক পা বড় ?

একটা যণ্ডা গোছের হিন্দুস্থানী ঘুষি বাগিয়ে হেঁড়ে গলায় বলে ঃ এ কি ইয়ার্কি পায়া হায় মোশয় ? এ যদি জামা হয়, তব হাম্‌ভি যম আছে। ছোড়েগা নেহি!

চারদিক থেকে সবাই হৈ হৈ করে পঙ্গপালের মতো ছেঁকে ধরলো ফটিককে! ফটিক ঠেকাবে কাকে ?

একটা উঁচু রকে দাঁড়িয়ে সে সবাইকে উদ্দেশ করে বলে ঃ আপনারা ক্ষেপে যাবেন না স্যর! খদ্দের দেবতা! তবু বলি, আমার এ দুনিয়া-না-মানে স্টাইল! দুনিয়ার কেউ যদি নেহাৎ এ স্টাইল পছন্দ না করে, ফেরৎ দিয়ে যান জামাগুলি। কাল সকালে এসে দাম ফেরৎ নেবেন।

দেখতে দেখতে বারান্দায় জামার একটা গাদা জমে গেল। জামা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে গেছে সবাই। শ্রান্ত অবসন্ন ফটিক হাতপা ছড়িয়ে শুয়ে পড়ে সেই গাদার ওপরে।

ঃ কি রে ফট্‌কে! মস্ত বড় জামার পাহাড় বসিয়েছিস দেখছি। অনেক কাজ করেছিস পূজোয়! পথ দিয়ে যেতে একটা ঢুঁ মেরে গজেন বলে।



ঃ হাঁ ভাই, সবই পূজোর অর্ডার!

ঃ এবার ডেলিভারী দিবি বুঝি?

ঃ না, ডেলিভারী নিলাম! ছুনিয়া - না-মানে টেলারিং হাউসের স্টাইল ছুনিয়ার কেউ মেনে নিলে না। সব অচল হয়ে গেল।

ঃ এখন কি করবি এগুলো?

ঃ একটু সাহায্য করবি ভাই, একটা রিক্সায় তুলে কলেজ স্কোয়ারে নিয়ে যাবো।

ঃ সেখানে সব জলে ফেলে দিবি বুঝি?

ঃ না, ফুটপাথে ফেলে ছু'ছু' আনায় সব নীলাম করে দেবো। চলবে না?

ঃ না চলে, ট্রেনে চাপিয়ে দিবি। টিটাগরের কাগজের কলে নিশ্চয়ই চলবে। ছেঁড়া ন্যাকড়ার দাম আছে সেখানে।

সহানুভূতির সঙ্গে গজেন বলে।

রিক্সায় যেতে যেতে গজেনের কানের কাছে মুখ এনে বড় করুণ সুরে ফটিক বলেঃ সত্যি ভাই, দর্জিগিরি সহজ নয়!!



ধর্মধ্বজ ও ইন্দ্রাণী (জাতক হইতে)



পিতৃ-সিংহাসন

শ্রীগৌরগোপাল বিদ্যাবিনোদ

সুযোগ্য পুত্র বাহুকে সিংহাসনে অভিষিক্ত করে মহারাজ বৃক বৃদ্ধবয়সে বানপ্রস্থ অবলম্বন কর্‌লেন। বৃক ছিলেন সূর্য্যবংশের একজন কীর্ত্তিমান রাজা, এবং ভগবান শ্রীরামচন্দ্রের অন্যতম পূর্ব্বপুরুষ। অযোধ্যাই ছিল তাঁর রাজধানী।

বাহু ছাড়াও মহারাজ বৃকের 'তালজঙ্ঘ' ও 'হৈহয়' নামে আরও দুই পুত্র ছিল। এরা পরস্পর সহোদর; বাহু এদের বৈমাত্রেয় ভাই। একই দিনে তালজঙ্ঘ এবং বাহুর জন্ম হলেও মাত্র দু'একঘণ্টা আগে ভূমিষ্ঠ হওয়ার জন্য জ্যেষ্ঠপুত্র হিসাবে পিতৃ-সিংহাসনে দাবী ছিল তালজঙ্ঘেরই। কিন্তু বিদ্যায়-বুদ্ধিতে, গুণে-শীলে, শৌর্য্যে-বীর্য্যে, রাজোচিত যোগ্যতায় বাহুই ছিলেন পুত্রদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। তাই মহারাজ বৃক জন্মের ক্ষণ-তারিখকে প্রাধান্য না দিয়ে বাহুকেই অযোধ্যার সিংহাসন দান করেন। অবশ্য তালজঙ্ঘ এবং হৈহয়কেও তিনি রাজ্যের দুইটি বিশিষ্ট অংশ দান করে যান।

কিন্তু এ ব্যবস্থা কি তালজঙ্ঘ কি হৈহয়—কারুরই মনঃপূত হলোনা। এর মধ্যে তারা যেন পিতার পক্ষপাতিত্বই দেখতে পেলে। তবে বনবাসী পিতার ব্যবস্থার বিরুদ্ধে কিছু কর্‌বার উপায় না পেয়ে তাদের যত আক্রোশ গিয়ে পড়লো মহারাজ বাহুর ওপর।

বাহুর প্রতি তারা মনে প্রাণে ভীষণ ঈর্ষান্বিতই হয়ে উঠলো!

বাহুর মনে কিন্তু দ্বেষ-হিংসার লেশমাত্রও ছিল না। ভাইদের তিনি প্রীতির চক্ষেই দেখতেন। ভাইরা তাঁর সঙ্গে যোগ দিয়ে বংশের গৌরব ও মর্য্যাদা বৃদ্ধি করুক,—নিজেরাও সমৃদ্ধ হোক,—মহারাজ বাহু আন্তরিকভাবেই এই কামনা করতেন। কিন্তু হিংসার আগুন যাদের বুকে একবার জ্বলেছে,—তারা কি আর কল্যাণের পথ দেখতে পায়?—লোকে বাহুর যত গুণগান করে, তালজঙ্ঘ ও হৈহয়ের বিদ্বেষও ততই প্রবল হ'য়ে ওঠে। ক্রমে ক্রমে তারা যেন বাহুর ঘোর শত্রু হয়েই দাঁড়ালো। তবে বাহুও তো আর দুর্ব্বল হস্তে রাজদণ্ড ধারণ করেন নি? কাজেই সহসা তাঁর কোন অনিষ্ট করাও ছিল তাদের পক্ষে সুকঠিন!

দেবতাদের নির্দ্দেশে মহারাজ বাহু সত্যবতী নামে এক অপূর্ব্ব সুন্দরী ও পরম গুণবতী কন্যাকে বিবাহ করেছিলেন। রাণী সত্যবতীর জন্ম হয়েছিল দেবী-অংশে; এবং সত্যই তিনি ছিলেন দেবীস্বরূপা। যোগ্য স্বামীর সুযোগ্যা সহধর্ম্মিণীরূপে তিনি মহারাজ বাহুর জীবনে প্রচুর শক্তি এবং আনন্দেরই সঞ্চার করতেন।

দেখতে দেখতে কয়েকটি বৎসর পরম শান্তিতেই কেটে গেল।

বাহুর সুশাসনে এবং সুপালনে ইতিমধ্যে রাজ্যের যথেষ্ট উন্নতি হয়েছে। বিশাল সাম্রাজ্যের সর্ব্বত্রই যেন এক অখণ্ড শান্তি ও শৃঙ্খলা বিরাজ করছে। কোথাও কোন বিশৃঙ্খলা বা উপদ্রব নেই। বহুতর চেষ্টা করেও তালজঙ্ঘ ও হৈহয় বাহুর কোন অনিষ্ট করবার সুযোগ পায় নি। অক্ষম ঈর্ষ্যার আগুনে তারা যেন জ্বলে পুড়ে মরছে। দূর নিভৃত পল্লীর মধ্যেও প্রজারা রাজা-রাণীর জয়গান কর্‌ছে।

এমন সময় একদিন মহর্ষি অগস্ত্য এসে মহারাজ বাহুর আতিথ্য গ্রহণ কর্‌লেন। রাজা-রাণী বহু সম্মানে এবং সমাদরে ঋষিবরকে অভ্যর্থনা করে তাঁর পরিচর্য্যায় ব্রতী হলেন। তাঁদের ভক্তি-শ্রদ্ধায় পরম তুষ্ট হয়ে মহর্ষি বল্‌লেন,—মহারাজ বাহু, আমি তোমার কীর্ত্তির কথা অনেক শুনেছি। তুমি সূর্য্যবংশের গৌরব বৃদ্ধি করেছ। তোমার বিনয় এবং সৌজন্য তোমার মত শক্তিমান্ মহান্ নৃপতিরই যোগ্য। আমি তোমাদের ওপর বিশেষ প্রীত হয়েছি। তুমি কি বর চাও বল।

বাহু বিনীত কণ্ঠে বললেন—মহর্ষি, আপনার কৃপায় আমার কোন অভাব নেই। মানুষের আকাঙ্ক্ষা উচ্চ হোক,—কিন্তু কামনা প্রবল না হওয়াই মঙ্গলের। আপনি আশীর্ব্বাদ করুন,—আমার যেন একটি সুপুত্র লাভ হয়।

মহারাণী সত্যবতী এ-সময় সন্তান-সম্ভবা ছিলেন। মহর্ষি তাঁর দিকে কিছুক্ষণ চেয়ে থেকে বললেন,—মহারাজ, আমি দিব্যচক্ষে দেখ্‌তে পাচ্ছি, রাণীর গর্ভে এক কুল-পাবন পুত্রের উদ্ভব হয়েছে, সে কালে রাজচক্রবর্ত্তী হবে। প্রবল প্রতাপে বিশাল সাম্রাজ্য শাসন করে সে কীর্ত্তি-গরিমায় অমরত্ব লাভ কর্‌বে। সে হবে শত্রুদমন দুর্দ্ধর্ষ বীর। পিতৃশত্রুগণকে দমন করে সে মধ্যাহ্ন সূর্য্যের মত ভাস্বর হ'য়ে উঠবে।

আনন্দে ও আশায় বিহ্বল হয়ে রাজা-রাণী দু'জনেই মহর্ষিকে ভূমিষ্ঠ হয়ে প্রণাম করলেন।

মহর্ষি অগস্ত্যের আগমন এবং তাঁর ভবিষ্যৎ বাণীর কথা কিন্তু কোন না কোন সূত্রে তালজঙ্ঘ এবং হৈহয়ের কানে গিয়ে উঠ্‌লো। শুনেই তো তাদের ঈর্ষার আগুনে যেন আহুতি পড়লো। তা' ছাড়া, 'বাহুর পুত্র পিতৃশত্রুদের দমন করবে'—এই সংবাদে কেমন একটা আতঙ্কও জেগে উঠ্‌লো তাদের মনে।...যেহেতু 'বাহুর পুত্রের পিতৃশত্রু' ব'লতে তারা নিজেদেরই বুঝে নিলে; এবং এই ধারণার মধ্যে অস্বাভাবিকতাও কিছু ছিল না। বাহু তাদের শত্রু না হোক,—তারা তো বাহুর শত্রুই হয়ে উঠেছিল!

সুতরাং কেমন করে রাণী সত্যবতীর গর্ভস্থ পুত্রের জীবননাশ করতে পারা যায়,—এই হ'লো তাদের অবিরাম চিন্তা,—এমন কি 'জপতপ' বললেও চলে। এ জগতে কারো কল্যাণ বা উপকার করাই কঠিন, কিন্তু অপকার করার পথ সহস্রদিকে পড়ে আছে। বিশেষ যারা খল এবং কুটিল তাদের তো কোন কিছুতেই বাধে না। তালজঙ্ঘ এবং হৈহয়ও ভাবতে ভাবতে তাদের প্রতিহিংসা সাধনের একটা উপায় স্থির করে ফেললে।...মুখে তাদের ক্রূর হাসি ফুটে উঠ্‌লো।

এরপর তারা কয়েকদিন মহারাজ বাহুর সঙ্গে রীতিমত মেলা-মেশা আরম্ভ করলে।...যেন বাহুর তারা কতই না শুভাকাঙ্ক্ষী এবং কতই না অনুগত! বাহু শক্তিমান, বাহু বীর, বাহু মহৎ,—তাই তাঁর অন্তরও ছিল সরল! তিনি ভাবলেন,—ভাইদের সুমতি হয়েছে।...জগতে ভ্রাতৃপ্রীতির চেয়ে অমূল্য বস্তু আর কি আছে? ভাই যদি হিংসা না করে,—তবে সংসারে তার চেয়ে বন্ধুই বা কে?... সুতরাং ভাইদের প্রীতির ভাব দেখে মহারাজ বাহু পরম আনন্দিত হলেন।

কিছুদিন পরে তালজঙ্ঘ তার প্রাসাদে একটি প্রীতিভোজের আয়োজন করলো। আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব অনেককেই নিমন্ত্রণ করলো সে এই ভোজ-সভায়। মহারাজ বাহুকে তো সে নিজে এসে সপরিবারে নিমন্ত্রণ করে গেল। তা'ছাড়া বিশেষ হৃদ্যতা এবং ঐকান্তিক আগ্রহ দেখিয়ে এ কথাও জানিয়ে গেল যে,—রাণীকে নিয়ে বাহু নিমন্ত্রণ-সভায় যোগ না দিলে, সে যারপরনাই দুঃখিত হবে।

আহা, ভাই অত করে অনুরোধ করে গেল,—বাহুর মত ভ্রাতৃবৎসল কি সে আমন্ত্রণ অগ্রাহ্য করতে পারেন?—নির্দ্দিষ্ট দিনে তিনি ভাই এবং ভ্রাতৃবধূদের জন্য নানাবিধ মূল্যবান উপহার নিয়ে মহারাণী সত্যবতীকে সঙ্গে করে তালজঙ্ঘের প্রাসাদে গিয়ে উপস্থিত হলেন।

রাজা-রাণীকে পেয়ে তালজঙ্ঘ এবং হৈহয়ের আনন্দ যেন আর ধরে না! তারা পরম সমাদরে রাজদম্পতিকে অভ্যর্থনা করলো। মহারাজ বাহু তাদের আপ্যায়নে পরম তুষ্ট হলেন। কিন্তু কি করে বুঝবেন তিনি—মধুর আবরণ দিয়ে তালজঙ্ঘ এবং হৈহয় তলে তলে বিষের ছুরি শানাচ্ছে!

আয়োজন অবশ্য ভুঁড়িভোজেরই হয়েছিল। আহারাদির পর রাজা-রাণী সকলকে যথাযোগ্য বিদায়-সম্ভাষণ জানিয়ে অযোধ্যার রাজ-প্রাসাদে ফিরে এলেন। কিন্তু প্রাসাদে ফিরেই রাণী সত্যবতী

সহসা অসুস্থ হয়ে পড়লেন। স্বামীকে ডেকে বিরসকণ্ঠে বললেন,—দেখ, আমার শরীরটা কেমন করছে! পেটের মধ্যেও যেন মোচড় দিচ্ছে। আমার মনে হয়,—ওরা আমার খাবারের সঙ্গে কিছু মিশিয়ে দিয়েছিল!

'অ্যাঁ—অ্যাঁ!'—দারুণ আতঙ্কে চমকে উঠে বাহু বললেন,—"বল কি? বল কি?...তা এতক্ষণ বলনি কেন?"

"খেতে খেতে আমার কেমন একটু সন্দেহ হয়েছিল। কিন্তু—"

মহারাজ বাহুর আর—"কিন্তু, তবু" ইত্যাদি শোনবার মত ধৈর্য্য ছিল না। অতিমাত্রায় ব্যস্ত হ'য়ে তিনি সেই মুহূর্ত্তেই রাজবৈদ্যকে অন্তঃপুরে ডেকে পাঠালেন। রাণী সত্যবতীর অস্বস্তি তখন একটু ক'রে বেড়েই উঠছে।

আহ্বানমাত্র রাজ-বৈদ্য অন্তঃপুরে এসে রাণীকে দেখলেন।...চিকিৎসা-শাস্ত্রে এবং রোগনির্ণয়ে এঁর অভিজ্ঞতা ছিল অসাধারণ। রাণীকে পরীক্ষা করে তিনি বললেন,—হ্যাঁ, রাণীমার শরীরে বিষের লক্ষণই দেখছি।...কিন্তু চিন্তা নেই,—বিষের ক্রিয়া সবে সুরু হয়েছে মাত্র,—আমি উপযুক্ত অমোঘ ঔষধের ব্যবস্থা করছি। মহারাণী কিছুক্ষণের মধ্যেই সুস্থ হ'য়ে উঠবেন।...ওরা রাণীমার গর্ভস্থ সন্তানের অনিষ্ট করবার চেষ্টা করেছে। কিন্তু রাখে হরি, মারে কে?—বলেই তিনি তাড়াতাড়ি এক মাত্রা ঔষধ তৈরী করে রাণীকে খাইয়ে দিলেন।

সৌভাগ্যক্রমে ঔষধ মন্ত্রের মত কাজ করলো।...কিছুক্ষণের মধ্যেই রাণী অপেক্ষাকৃত সুস্থ হয়ে উঠলেন।—এবং আর এক মাত্রা ঔষধ প্রয়োগ করতেই তার শরীরের অবস্থা স্বাভাবিক হয়ে এলো। ভগবানকে ধন্যবাদ দিয়ে—বাহু, রাজবৈদ্যকে প্রচুর পুরস্কারে পুরস্কৃত করলেন। কিন্তু ভাইদের এই বিশ্বাসঘাতকতায় সমগ্র সংসারেরই ওপর তাঁর যেন একটা বিতৃষ্ণা জেগে উঠলো। ...অবশ্য কথাটা তিনি বাইরে কোনরূপে প্রকাশ পেতে দিলেন না।...

তালজঙ্ঘ ও হৈহয় যখন দেখলো, তাদের পৈশাচিক ষড়যন্ত্র রাণী সত্যবতীর কোন অনিষ্ট করতে পারেনি, এবং তিনি সম্পূর্ণ সুস্থই আছেন, তখন তারা অন্যপথ ধরলে।

কথায় বলে,—খলের চাতুরীর অভাব নেই।—এদের দু'জনের প্রবৃত্তিরও নিবৃত্তি ছিলনা, মাথায় বুদ্ধিও খেলতো অনেক রকম।...কিন্তু এবার বাহুর ধ্বংস সাধনের জন্য তারা যে পথ ধরলে, তা একেবারে সাংঘাতিক।

তখনকার দিনে—'অর্জ্জুন' নামে এক প্রবলপরাক্রান্ত রাজা ছিলেন। তাঁর রাজধানী ছিল মাহিষ্মতীপুর। রাজা কৃতবীর্য্যের পুত্র বলে তাঁকে সকলে বলতো কার্ত্তবীর্য্য অথবা কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুন। দেবাদিদেব শিবের বরে তিনি ছিলেন জগতে অজেয়। পুরাণে আছে,—তিনি ছিলেন 'সহস্রবাহু, অর্থাৎ তাঁর হাত ছিল হাজারটা। অবশ্য হাত যে সত্যিই হাজারটা ছিল, তা নয়, তবে তিনি এমনি অনন্তকর্ম্মা পুরুষ ছিলেন যে,—মানুষের হাজারটা হাত থাকলেই সেরূপ হওয়া সম্ভব। তাই

গৌরবার্থে লোকে তাঁকে 'সহস্রবাহু' ব'লতো। পুরাণে এমন অনেক রূপক কথা আছে,—এইভাবে বুঝে দেখলে, সেগুলিকে আজগুবি ব'লে উড়িয়ে দেওয়া যায় না।

রাজা কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুন শিবের কাছে অনেক বর পেয়েছিলেন। শিবের বরে তাঁর রথ ত্রিভুবনের যেখানে ইচ্ছা, সেইখানেই যেতে পারতো। তালজঙ্ঘ ও হৈহয়ের মাতৃকুলের সঙ্গে তাঁর কি যেন একটা সম্পর্কও ছিল। দু'ভাই একদিন তাঁর কাছে এসে—নানা মিথ্যা কথা বলে তাঁকে মহারাজ বাহুর বিরুদ্ধে উত্তেজিত করে তুললো। এবং একথাও জানালো যে—তিনি যদি এই সময় বাহুকে আক্রমণ করে—তাঁকে রাজ্যচ্যুত না করেন, তবে বাহুই খুব শীঘ্র একদিন তাঁর মাহিষ্মতীপুর আক্রমণ করবে।

ষড়যন্ত্র ব্যর্থ হলো না। উত্তেজিত রাজা কার্ত্তবীর্য্য শীঘ্রই একদিন তালজঙ্ঘ ও হৈহয়ের সহযোগে অযোধ্যা আক্রমণ করলেন।

রাজা বাহু তো অবাক! কার্ত্তবীর্য্যের সঙ্গে তাঁর কোন বিরোধিতা ছিল না। তাঁর মত একজন রাজাধিরাজ মহাবীর—সহসা বিনা কারণে তালজঙ্ঘ হৈহয়ের সঙ্গে যোগ দিয়ে তাঁর রাজ্য আক্রমণ করতে পারেন, এমন অসম্ভব কথা তিনি ভাবতেও পারেন নি। কিন্তু আক্রমণ যখন করেছেন, তখন সে আক্রমণ তো প্রতিরোধ করতেই হবে। তিনিও বীর, তিনিও শক্তিমান, —প্রাণ থাকতে তিনি এ অন্যায়ের কাছে নতি স্বীকার করবেন না।

সুতরাং দুই পক্ষে ভীষণ যুদ্ধ বাধলো। একা বাহু সিংহবিক্রমে প্রতিপক্ষের সম্মিলিত শক্তিকে বার বার ব্যর্থ করে দিতে লাগলেন। বাহুর বাহুবলের পরিচয় পেয়ে অত বড় বীর কার্ত্তবীর্য্যও স্তব্ধ হ'য়ে গেলেন। কিন্তু কার্ত্তবীর্য্য ছিলেন শিবের বরে অজেয় আর তাঁর সৈন্যবলও ছিল বাহুর চেয়ে অনেকগুণ বেশি। ফলে একাদিক্রমে বারোদিন ধরে যুদ্ধ চালিয়েও শেষ পর্য্যন্ত বাহুকে কার্ত্তবীর্য্যের কাছে পরাজয় স্বীকার করতে হলো।

পরাজিত বাহু লজ্জায় ক্ষোভে সন্তান-সম্ভবা রাণী সত্যবতীকে নিয়ে—গোপনে রাজপ্রাসাদ ত্যাগ করে গভীর অরণ্যে চলে গেলেন। অতঃপর কার্ত্তবীর্য্যের নির্দ্দেশক্রমে তালজঙ্ঘ অযোধ্যার সিংহাসনে বসলো, এবং পিতার কাছে সে-রাজ্যের যে অংশ পেয়েছিল, তা হৈহয়কে দান করলে। দুই ভাইয়ের কাছ থেকে কার্ত্তবীর্য্য প্রচুর উপঢৌকন পেলেন।

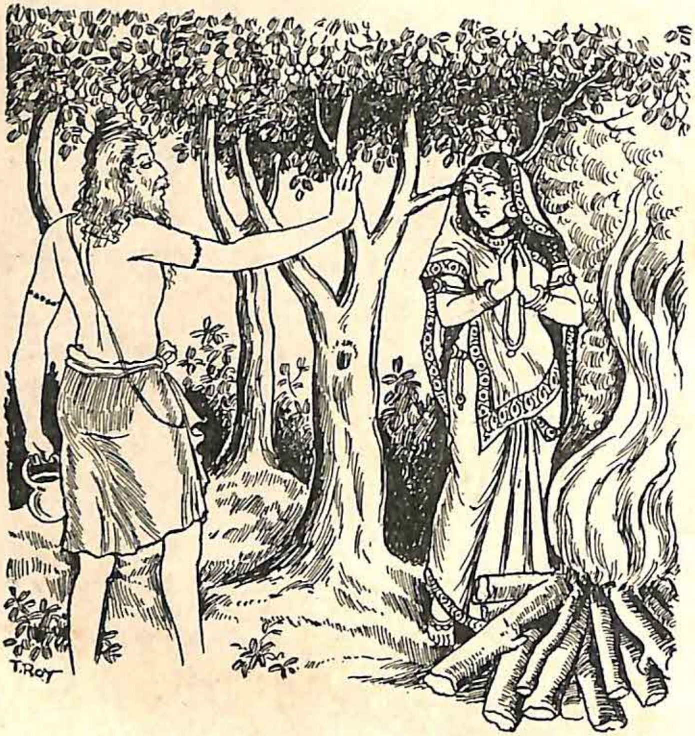
মহারাজ বাহু কিন্তু যুদ্ধে অতিশয় ক্লান্ত হয়েছিলেন।—এবং প্রায় সর্ব্বাঙ্গেই গুরুতর আঘাত পেয়েছিলেন। ফলে বনে এসে কয়েকদিনের মধ্যেই তিনি প্রাণত্যাগ করলেন।

রাণী সত্যবতী পড়লেন অকূল পাথারে। রাজ্য-ধন-মান-সম্মান সবই গেছে, আবার স্বামীও চলে গেলেন! গভীর দুঃখে রাণীর দু'চোখ ফেটে জল পড়তে লাগলো।...জীবনের ওপরও তাঁর ধিক্কার জন্মালো। তিনি স্বামীর সঙ্গে সহমৃতা হ'য়ে সকল জ্বালার অবসান করবার সংকল্প করলেন।

শীঘ্রই বনের চারিদিক থেকে শুকনো কতকগুলো কাঠ যোগাড় ক'রে রাণী এক অগ্নিকুণ্ড জ্বেলে ফেললেন। তারপর প্রাণের সমস্ত মমতা দিয়ে স্বামীর দেহ অনেক কষ্টে বুকে তুলে—চিতার ওপর শুইয়ে দিয়ে নিজে যেই আগুনের মাঝে ঝাঁপিয়ে পড়তে যাবেন, অমনি পেছন থেকে মহর্ষি ঔর্ব্ব ব্যগ্রকণ্ঠে ডেকে বললেন, ও-কি, ও-কি মা!...তুমি যে সন্তান-সম্ভবা! তোমার কি সহমৃতা হওয়া চলে ?

রাণী চমকে উঠে পেছন ফিরে চেয়ে মহর্ষিকে দেখেই অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে বললেন,—পিতা !

'আমি সব জানি মা!'—প্রগাঢ় স্নেহে মহর্ষি বললেন,—কিন্তু তোমার সহমৃতা হওয়া তো চলবে না। তোমার গর্ভে তোমার স্বামীর আত্মজ রয়েছে। তার জীবন নষ্ট করার কোন অধিকার তোমার নেই।



"কিন্তু বাবা, আমি যে এ-দুঃখ সহ্য করতে পারছি না।"

মহর্ষি-ও অশ্রুসিক্ত কণ্ঠে উত্তর দিলেন, কিন্তু সহ্য যে করতে হবে মা! তোমার পুত্র রাজ-চক্রবর্ত্তী হবে। সে পিতৃ-হত্যার প্রতিশোধ নিয়ে স্থর্য্য-বংশের গৌরব বৃদ্ধি করবে। তোমার স্বামীর স্বর্গত আত্মা তার কীর্ত্তি-গরিমায় পরিতৃপ্ত হবে। সসাগরা ধরণীর একচ্ছত্র অধীশ্বর হয়ে সে তোমার মুখোজ্জল কর্‌বে।

রাণী অনেকটা আশ্বস্ত হলেন। কিন্তু তবুও চিন্তিতভাবে বললেন,—কিন্তু পিতা, এই দুর্গম বনে আমি নিঃসহায়া—নিরাশ্রয়া নারী কেমন ক'রে—"

সহসা বাধা দিয়ে মহর্ষি বললেন,—"কোন চিন্তা নেই মা! তুমি আমার আশ্রমে চল। সেখানে তুমি নিরাপদে থাকবে। আজ থেকে তুমি আমার কন্যা। তোমার পুত্রের জন্মের পর—আমি তাকে পরমযত্নে লালনপালন ক'র্‌বো। তাকে বিবিধ শাস্ত্রে এবং শস্ত্রবিদ্যায় কৃতবিদ্য করে তুল্‌বো।...চল মা কল্যাণী,—সতীর স্পর্শে আমার আশ্রম পবিত্র হোক।

সর্ব্বত্যাগী তপঃক্লিষ্ট ঋষির জীর্ণ শীর্ণ দেহে এত স্নেহ! কৃতজ্ঞতায় রাণীর সমগ্র অন্তর ভ'রে উঠলো। তিনি আর না-বলতে পারলেন না। পরম নিষ্ঠায় স্বামীর চিতা প্রদক্ষিণ করে—চিতাভূমির মাটি মাথায় নিয়ে মহর্ষি ঔর্ব্বের পিছু পিছু রাণী তাঁর আশ্রমে এসে উপস্থিত হলেন।

যথাসময়ে মহর্ষির আশ্রমে রাণী এক সর্ব্বাঙ্গসুন্দর—সর্ব্ব-সুলক্ষণ পুত্র প্রসব করলেন। নবজাত শিশুটিকে দেখে মহর্ষির কি গভীর আনন্দ! অনেকক্ষণ ধরে শিশুটির সর্ব্বাঙ্গ নিরীক্ষণ ক'রে মহর্ষি ঔর্ব্বের দৃষ্টি সহসা উজ্জ্বল হয়ে উঠ্লো। কৌতূহল-ভরা কণ্ঠে তিনি বলে উঠ্লেন, দেখ মা, দেখ। তোমার স্বামীর ভাইরা তোমাকে যে বিষ খাইয়েছিল,—সে বিষ তোমার পুত্রের গায়ে লেগে রয়েছে এবং এখনও ঠিক তেমনি আছে, অথচ তোমার কোন অনিষ্ট হয়নি; ভগবানের কি অপার মহিমা!

ঋষি কিছুক্ষণের জন্য ভগবৎ-প্রেমে তন্ময় হয়ে পড়লেন। পরে আবার ব'ললেন,—তোমার পুত্র যখন বিষ অর্থাৎ গরলসহ ভূমিষ্ঠ হ'য়েছে, তখন আমি এর নাম রাখলাম,—'সহগরল' অর্থে 'সগর'।

রাণী মুগ্ধদৃষ্টিতে শিশুর দিকে চেয়ে ব'ললেন, বাবা আপনার আদেশ শিরোধার্য্য। বলা বাহুল্য, অতঃপর মহর্ষি ঔর্ব্ব পরম যত্নে এবং প্রগাঢ় স্নেহে শিশু ও জননীর রক্ষণাবেক্ষণ করতে লাগলেন।

দেখতে দেখতে এক—দুই—তিন ক'রে দীর্ঘ ষোলটি বৎসর চলে গেল।

সগর এখন ষোড়শ বর্ষীয় সুন্দর স্বাস্থ্যবান কিশোর!...এই ষোল বৎসর মহর্ষির যেন সগরকে গড়ে তুলতেই অতিবাহিত হয়েছে। সগরকে তিনি শুধু নানাশাস্ত্রেই নয়—তার ভবিষ্যৎ ভেবে তাকে ধনুর্ব্বেদ বা শস্ত্রবিদ্যাতেও রীতিমত পারদর্শী ক'রে তুলেছেন। পুত্রের মুখের দিকে চেয়ে আজ রাণী সত্যবতীর মাতৃপ্রাণ আশা-ভরসায় ভ'রে ওঠে।

সিংহ-শিশু সিংহই হয়। অবিরাম সামগানে মুখরিত ফলমূলাহারী ঋষির আশ্রমে প্রতিপালিত হলেও ক্ষত্রিয়সন্তান সগর ক্রমশঃ ক্ষাত্রতেজেই উদ্দীপ্ত হয়ে উঠেছে।...তার ধমনীতে যে রক্ত প্রবাহিত, সেই রাজ-রক্ত যেন মুহুর্মুহু তাকে আহ্বান কর্‌ছে শৌর্য্যবীর্য্যের সাধনার দিকে। মন তার ছুটে যায় শাস্ত্র ছেড়ে শস্ত্র-চালনায়।

প্রথম প্রথম সে মহর্ষি ঔর্ব্বকেই তার পিতা মনে কর্‌তো।...কিন্তু জ্ঞান হবার সঙ্গে সঙ্গে তা সে ভুল গেছে!...অথচ কি যে তার আসল পরিচয়,—কোথা হ'তে কেমন ক'রে—কোন্ সূত্রে বনবাসী ঋষির স্নেহচ্ছায়ায় সে বেড়ে উঠলো, এ সে অনেক ভেবেও ঠিক করতে পারেনি।... রাজরাণী মায়ের দিকে চেয়েও সে বিভ্রান্ত হয়ে উঠতো। শতদুঃখেও স্বামী-হারা সত্যবতীর সর্ব্বাঙ্গে যে মহিমা ফুটে উঠ্‌তো, তা যেন রাজেন্দ্রাণীরই যোগ্য। মায়ের মুখের দিকে চেয়ে সে ভুলেও ভাবতে পারতো না যে,—মা তার ঋষি-পত্নী—অথবা বনবাসিনী তপস্বিনী!—আবার

মহর্ষি ঔর্ব্ব তাদের কে, এ কথা ভাবতে গিয়ে—তিনি যে-কি নন, এই চিন্তাতে সে বিহ্বল হ'য়ে উঠতো!

আগে আগে সে মাকে নিজেদের সম্বন্ধে নানা প্রশ্ন করেছে কিন্তু রাণী সত্যবতী সে সব প্রশ্ন কোনরূপে এড়িয়ে চলেছেন, আসল কথা ছেলের কাছে বলতে তাঁর ভরসা হয়নি। কি জানি, ছোট ছেলে, হঠাৎ উত্তেজনাবশে কখন কি ক'রে বসে, বলা তো যায় না!

কিন্তু আর বেশিদিন সগরকে দ্বন্দ্ব-দ্বিধার মধ্যে ফেলে রাখা সত্যবতীর পক্ষে সম্ভব হলো না। সগর ক্রমশঃই সত্য তথ্য জানবার জন্যে অধীর হ'য়ে উঠছে দেখে, তিনি একদিন তাঁদের দুরদৃষ্টের ইতিহাস সবিস্তারেই পুত্রের কাছে বর্ণনা করলেন। বলতে বলতে রাণীর চোখ দিয়ে যেন শ্রাবণের ধারা ঝরে পড়তে লাগলো!

আর সগর?—ক্ষোভে, রোষে, অভিমানে উত্তেজনায় তার কণ্ঠ যেন রুদ্ধ হ'য়ে গেছে। বুকের মধ্যে যেন এক প্রচণ্ড আগ্নেয়গিরি বিস্ফোরণের পূর্ব্বে কেঁপে কেঁপে উঠ্‌ছে!—উঃ, মানুষ এত শঠ, এত ক্রূর, এত নির্ম্মম হতে পারে! বিশেষ তার রাজাধিরাজ পিতার বনবাসে শোচনীয় মৃত্যু—রাজেন্দ্রাণী জননীর নিঃসহায়-নিরাশ্রয়ভাবে ঋষির আশ্রয়-গ্রহণ এবং গৌরবময় বিশাল সূর্য্যবংশের সন্তান হয়ে বনের মাঝে ঋষির আশ্রমে তার জন্ম, ইত্যাদি বিষয় সে যত মনে করছে,—ততই সে যেন আর নিজেকে সংযত রাখতে পার্‌ছে না!

রাণী সত্যবতী তখন পুত্রের মুখের দিকে চেয়ে আতঙ্কে স্তব্ধ হয়ে উঠেছেন। হায়, হায় কেন ব'লতে গেলেন তিনি ও সব কথা? এখনই হয়ত সগর কোন একটা অঘটন ক'রে বস্‌বে!

কিন্তু না, সগর সহসা সেরূপ কিছুই করলো না। এক গভীর দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে সে ধীরে ধীরে মায়ের কাছ থেকে উঠে গেল।

পরদিন থেকে সগর এক অদ্ভুত কাজে মগ্ন হয়ে পড়লো। বনের মধ্যে বহু বন্যজাতির বাস ছিল। তারা সকলেই সগরকে খুবই ভালবাসতো।...তাদের মধ্যে যত বলিষ্ঠ তরুণ ছিল, সগর তাদের নিয়ে এক দল বেঁধে—সকলকে শস্ত্রবিদ্যা শিক্ষা দিতে সুরু করলো।

এই বন্য তরুণেরা ছিল যেমন শক্তিমান, তেমনি সাহসী, আবার তেমনি নির্ভীক ও দুর্দ্ধর্ষ। কিন্তু সগরকে তারা সানন্দেই দলপতি বলে মেনে নিল। দেখতে দেখতে তারা শস্ত্রবিদ্যায় নিপুণ হ'য়ে উঠ্‌লো এবং প্রত্যেকেই সগরের এমনি অনুগত হয়ে উঠলো যে, সগরের আদেশে তারা যেন প্রাণ দিতেও কুণ্ঠিত নয়।

এ-সব দেখে শুনে সত্যবতীর প্রাণে নানা আশঙ্কা জেগে উঠলেও, মহর্ষি ঔর্ব্ব সগরকে অনুৎসাহিত করলেন না। বরং সাগ্রহে তাকে একদিন এক বিশাল ধনু দিয়ে—উৎসাহিত করে বললেন, বৎস সগর, এ-ধনু দেবরাজ ইন্দ্র-দত্ত।...আমি সাধনা করে পেয়েছিলাম, এখন তুমি নাও। এর সাহায্যে তুমি সর্ব্বত্র জয়ী হতে পার্‌বে।

ঋষি-দত্ত ধনুক এবং তাঁর উৎসাহ-আশীর্ব্বাদ পেয়ে—সগরের বুক আশা-ভরসায় ভ'রে উঠ্‌লো, এবং শীঘ্রই একদিন সে কাউকে কিছু না বলে—তার বন্য বাহিনী নিয়ে বীরোচিত দর্পে এবং নির্ভয়েই অযোধ্যার অভিমুখে যাত্রা কর্‌লো।

এদিকে দৈবও কিন্তু তার প্রতি অনুকূল হ'য়ে উঠেছিল। তালজঙ্ঘ ও হৈহয়ের কু-শাসনে এবং অত্যাচারে রাজ্যের প্রজারা তাদের প্রতি অত্যন্ত চটে গিয়েছিল। মনে মনে সকলেই ধ্বংস কামনা করছিল তাদের।—কাজেই সগরের এই অভিযান এক বিস্ময়কর ব্যাপার হয়েই দাঁড়ালো।

পথে যেতে যেতে সে অযোধ্যারাজ্যের অন্তর্গত যে-কোন জনপদে ঢুকে তার পরিচয় দেয়, এবং তার উদ্দেশ্য ব্যক্ত করে, সেখানকার যুদ্ধ-জানা লোক একেবারে তাদের যার যা অস্ত্র নিয়ে বেরিয়ে এসে সগরের দলে যোগ দেয়। এমনি করে সগর যখন রাজধানীর প্রান্তে এসে পৌঁছল— তখন তার সেই ক্ষুদ্রবাহিনী এক বিরাট বাহিনীতে পরিণত হয়েছে।



ওঃ, সগরের তখন কি আনন্দ! হাতে ইন্দ্র-দত্ত ধনু,—বালসূর্য্যসম দীপ্তিমান্ বন্য বীরের বেশে সজ্জিত বিশালবাহিনীর অধিনায়করূপে সগরকে কি অপূর্ব্ব সুন্দরই না দেখাচ্ছিল।...অতর্কিতেই অযোধ্যা আক্রমণ করে সে রীতিমত যুদ্ধঘোষণা করে বসলো।

ফলে নিজের জ্যেঠা ও কাকার সঙ্গে সগরের যে ভীষণ যুদ্ধ বাধলো, তা, আর বর্ণনার নয়। কিন্তু তালজঙ্ঘ ও হৈহয় তাদের সমগ্র শক্তি নিয়ে প্রচণ্ডভাবে বাধা দেওয়া সত্ত্বেও সগরের সে দুর্ব্বার আক্রমণের বেগ প্রতিহত করতে পারলো না। উপরন্তু এমনই এক মজা হলো যে,—যে মুহূর্ত্তে রাজধানীর প্রজারা জানতে পারলো, এই দেবকুমারসম তেজস্বী তরুণ বীর তাদের পরম সদাশয় রাজা বাহুর একমাত্র বংশধর—তখনি তারা সগরের পক্ষে যোগ দিয়ে বিপুল উল্লাসে সমস্বরে তাকেই রাজা বলে স্বীকার ক'রে নিলে।

ব্যস্, তারপর আর কি ? পিতৃ-সিংহাসন অধিকার ক'রেই সগর রাজ-প্রাসাদের মধ্যে ঢুকে পড়লো ; অনেক খোঁজাখুঁজি করেও কিন্তু সে তালজঙ্ঘ বা হৈহয়—কাউকেই সেখানে দেখতে পেলো না। মোট কথা ব্যাপার গুরুতর বুঝে তারা যুদ্ধ ছেড়েই পালিয়েছিল বনের দিকে। রাজ-অন্তঃপুরস্থ মহিলাদের প্রতি যথেষ্ট সম্মান দেখিয়েই সগর তাদের অভয়দান করলে।

তালজঙ্ঘ এবং হৈহয়কে কিন্তু তার চাইই। যে দুরাত্মারা একজন সন্তান-সম্ভবা নারীকে হত্যা করবার মত নীচ প্রবৃত্তি রাখে—যাদের জন্য তার মাতা-পিতার এত দুর্দ্দশা, তাদের পাপজীবন সে রাখবে না। সে দিকে দিকে তাদের সন্ধানে লোক পাঠিয়ে দিল।

এমন সময় রাণী সত্যবতীসহ মহর্ষি ঔর্ব্ব অযোধ্যায় উপস্থিত হয়ে সগরকে বললেন, বৎস, তালজঙ্ঘ ও হৈহয় তোমার ভয়ে বনে পালিয়ে গিয়ে মুনি-ঋষিদের আশ্রয় নিয়েছে। তুমি সে ঘৃণিত পশুদের রক্তপাত করে আর নিজের গৌরবের হানি ক'রো না।

প্রগাঢ় ভক্তিভরে ঋষিকে প্রণাম করে সগর বললে,—মহর্ষি আমি আপনার দাস।

এরপর মহর্ষি ঔর্ব্বই সগরকে যথাশাস্ত্র অযোধ্যার সিংহাসনে অভিষিক্ত করলেন।...রাজমাতা সত্যবতীর আজ কি আনন্দের দিন! গৌরবে তাঁর বুক ফুলে উঠতে লাগলো।...কিছুদিন পরেই মহারাজ সগর অশ্বমেধ যজ্ঞ করে রাজ-চক্রবর্ত্তিত্ব লাভ করলেন।

পুরাণে আছে মহারাজ সগরের পুত্রেরাই সমুদ্র খনন ক'রেছিলেন বলে—সমুদ্রের আর এক নাম 'সাগর'।......

ধরা পাখির ছড়া

—অনিল ভট্টাচার্য

কাঠ কুড়োতে বনে গেলুম
পেয়ে গেলুম ফুল,
ফুলের মাঝে ফুলটুসি যে,
কানে চিকন দুল।

ফুলটুসিকে নিয়ে এলুম
কোথায় দেবো ঠাঁই,
বনের পাখি রাখি এমন
খাঁচা কোথায় পাই।

যারে পাখি, ফুলের পাখি
ফুলে চলে যা,
খাবি দাবি কল কলাবি
বনে চলে যা।





পরিবর্তন

শ্রীসমর সরকার

আজ নবদ্বীপে আনন্দের সীমা নাই—বহুদিন পরে প্রভু শ্রীনিত্যানন্দ শচীমাতাকে দর্শন করিতে নবদ্বীপে আসিয়াছেন। নবদ্বীপের বাতাসে আজ হরিধ্বনির আভাস, বিহঙ্গের কলতানে, অলির গুঞ্জরণে হরিনামের রণন। প্রতি ঘরে ঘরে প্রভু ভক্তদের সঙ্গে লইয়া ভাবে বিহ্বল হইয়া হরি-সংকীর্তন করিয়া বেড়াইতেছেন। তাঁহার সহিত সকল নরনারী যোগদান করিয়া নবদ্বীপের আকাশকে হরিনামের মধুর আবেশে পূর্ণ করিয়া দিতেছেন। ক্ষুধাতৃষ্ণার প্রতি কাহারও ভ্রূক্ষেপ নাই—শোক, ভয় দূরে চলিয়া গিয়াছে—নবদ্বীপে এখন আছে শুধু আনন্দ, অনাবিল আনন্দ।

আহা, প্রভু শ্রীনিত্যানন্দের কি অপূর্ব, পরম-মোহন আনন্দ-মূরতি—দেখিলে চক্ষুর পলক পড়ে না। তাঁহার সর্বাঙ্গ গোরোচনাচন্দনে লেপিত হইয়া মনোরম হইয়া উঠিয়াছে। শ্রীঅঙ্গে ও মস্তকে পরম বিচিত্র রঞ্জিত পট্টবস্ত্র শোভা পাইতেছে, তাহার উপর বহুবিধ মাল্যের বিলাস। কণ্ঠে নানাপ্রকারের মণিমুক্তা স্বর্ণহার দুলিতেছে, কর্ণে মুক্তাখচিত স্বর্ণকুণ্ডল ঝল্‌মল্‌ করিতেছে। শ্রীহস্তে স্বর্ণনির্মিত বাজু ও বলয়, দশ অঙ্গুলিতে অঙ্গুরীয়। শ্রীচরণে রজত নূপুর শোভা পাইতেছে—তাঁহার গজেন্দ্রগমনের সহিত উহা পরম মধুর ধ্বনিতে বাজিয়া উঠিতেছে। আবার তিনি বাল-গোপালের

ন্যায় রঙ্গও করিতেছেন। তাঁহার কটিতেই বেত্র বংশী ও পাচনি বিরাজ করিতেছে। তিনি লীলাবশে হস্তে লৌহদণ্ড ধরিয়া আছেন। তিনি যেদিকেই চাহিতেছেন সেইদিকে কৃষ্ণরস যেন মূর্ত হইয়া উঠিতেছে।

এই সময়ে নবদ্বীপে এক ব্রাহ্মণকুমার বাস করিত। জাতিতে ব্রাহ্মণ হইলে কি হয় তাহার মত চোর-দস্যু ঐ অঞ্চলে আর কেহ ছিল না—সে ছিল সকলের 'মহা-সেনাপতি।' সে এত দুর্মতি ও নিষ্ঠুর ছিল যে প্রয়োজনবোধে সে নরহত্যা করিতেও কুণ্ঠিত হইত না। তাহার হৃদয়ে দয়ার লেশমাত্র ছিল না। সে দিবারাত্র দস্যুদের সহিত বিচরণ করিত ও কিরূপে নূতন শিকার সংগ্রহ করিতে পারে সেই পরামর্শ করিত।

প্রভু শ্রীনিত্যানন্দের সর্বাঙ্গে মহামূল্য অলংকার দেখিয়া সে লোভাতুর হইয়া উঠিল। কেমন করিয়া অলংকারগুলি অপহরণ করা যায় ইহাই হইল তাহার প্রধান চিন্তা। শেষে সে স্থির করিল যে সে প্রভুর প্রিয় ভক্ত হইবার ভান করিবে।

ইহার পর সে প্রভুর নিত্যদাস হইয়া উঠিল। সে ছায়ার ন্যায় তাঁহার অনুগামী হইল, ভক্তিসহকারে তাঁহার সেবা করিতে লাগিল। কিন্তু প্রভু যে অন্তর্যামী! দুষ্ট ব্রাহ্মণের অন্তরের গোপন অভিসন্ধি তাঁহার অগোচর রহিল না। ব্রাহ্মণ যে কি জন্য তাঁহার এত অনুরক্ত হইয়া উঠিল তাহা তিনি ধ্যানযোগে জানিতে পারিলেন।

শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু হিরণ্য পণ্ডিত নামে এক ব্রাহ্মণের গৃহে একাকী বাস করিতে লাগিলেন। দুষ্টমতি দস্যু ব্রাহ্মণ দেখিল এমন সুযোগ আর মিলিবে না। সে তাহার অনুচর দস্যুগণকে লইয়া মন্ত্রণা করিতে বসিল।

সে বলিল—'এইবার আমাদের সকলের দুঃখ ঘুচিল। চণ্ডীমাতা আমাদের নিধির সন্ধান দিয়াছেন। এই যে সন্ন্যাসী নবদ্বীপে রহিয়াছেন, তাঁহার অঙ্গে লক্ষ লক্ষ টাকা মূল্যের অলংকার রহিয়াছে। সোনা, মুক্তা, হীরা, কসা ভিন্ন অন্য পদার্থ ঐ অলংকারে নাই। তিনি ত' হিরণ্যের গৃহে একাকী বাস করেন. সুতরাং এক দণ্ডের মধ্যেই তাঁহার নিকট হইতে সমস্ত কাড়িয়া লওয়া অতি সহজ। আজ গভীর রাত্রির অন্ধকারে আমরা ঢাল, খাঁড়া ইত্যাদি অস্ত্রে সজ্জিত হইয়া সন্ন্যাসীর গৃহে হানা দিব।'

দস্যুদিগের নিকট ইহাপেক্ষা উত্তম প্রস্তাব আর কি থাকিতে পারে! তাহারা তৎক্ষণাৎ দ্বিরুক্তি না করিয়া দলপতির প্রস্তাবে সম্মতিজ্ঞাপন করিল।

রাত্রি গভীর হইলে গাঢ় অন্ধকারে দস্যুদল খাঁড়া, ছুরি, ত্রিশূল ইত্যাদিতে সুসজ্জিত হইয়া গন্তব্যস্থানে যাত্রা করিল। তাহারা সকলে একত্রে নিত্যানন্দের বাসস্থানে না গিয়া প্রথমে একজন চর পাঠাইয়া দিল।

নিত্যানন্দ প্রভু তখন তাঁহার ভক্তগণের সহিত বসিয়া শ্রীকৃষ্ণের প্রসাদ সেবা করিতেছেন।

ভক্তগণের হরিধ্বনিতে চারিদিক মুখরিত হইয়া উঠিয়াছে। অনেকে হরিনামে সম্বিৎ হারাইয়া উন্মাদপ্রায় হইয়াছেন। তাঁহাদের কেহ বা সিংহনাদ করিতেছেন, কেহ বা গর্জন করিতেছেন, কেহ বা পুলকে উচ্ছল হইয়া করতালি দিয়া অট্টহাস্য করিতেছেন। রাত্রি গভীর হইলেও কাহারও চক্ষে নিদ্রা নাই—সকলেই কৃষ্ণানন্দে মত্ত হইয়া নিদ্রা ত্যাগ করিয়াছে।

গোপনে এই সকল দেখিয়া আসিয়া চর দস্যুদলের নিকট সংবাদ দিল। দস্যুরা বলিল, 'আমরা খানিকক্ষণ অপেক্ষা করি—ভোজন শেষ হইলে তাহারা যখন নিদ্রা যাইবে তখন আমরা একযোগে সেইখানে হানা দিব।'

দস্যুরা এক বৃক্ষতলে বসিয়া আকুল আগ্রহে যথাসময়ের জন্য অপেক্ষা করিতে লাগিল। লোভে তখন তাহাদের হৃদয় লোলুপ হইয়া রহিয়াছে—আর কিছুক্ষণের মধ্যেই তাহারা নিত্যানন্দ প্রভুর রত্নালংকার হস্তগত করিতে পারিবে। ইতোমধ্যেই তাহাদের মধ্যে অলংকার বণ্টন আরম্ভ হইয়া গেল। একজন বলিল, 'সোনার তাড়বালাটি আমি লইব'; আর একজন বলিল, 'আমি লইব মুক্তার মালাটি'; কেহ বলিল, 'আমাকে কর্ণের গহনাখানি দিও'; কেহ বলিল, 'সোনার হারটিতে আমার প্রয়োজন আছে'; 'আবার কেহ বলিল, 'রূপার নূপুরটি আমার থাকিবে।' এইভাবে নানাজনে নানা আলোচনা করিতে লাগিল ও অদূরভবিষ্যতে স্ব স্ব সৌভাগ্যের সম্ভাবনায় উৎফুল্ল হইয়া উঠিল।

নিত্যানন্দ প্রভুর নিকট কিছুই অগোচর রহিল না। তিনি দস্যুদের অন্তরের কথা সবই জানিতে পারিয়া মৃদুহাস্য করিলেন।

কিছুক্ষণ পরে দস্যুগণ সকলেই গভীর নিদ্রাবোধ করিল। নিদ্রা প্রবল হইয়া তাহাদের ... কিছু, অভিভূত করিল যে শত চেষ্টা সত্ত্বেও তাহারা আর এক মুহূর্ত জাগিয়া থাকিতে পারিল ... হয় নীচু; ভূমিশয্যা গ্রহণ করিল।



নাকে। ঘোষণা ক'দের

চ'লে গেলো। ...

—ভাসী-দি, হাবুল নিশ্চয়ই ওর দাদাকে ডেকে আন্‌তে গ্যাছে। ওর দাদা এলে মুস্কিল হবে। ভাসী-দি বল্‌লো—

রাত্রি প্রভাত হইলে ...

অতিশয় দুঃ... হইল ...

গিয়াছে—এখন ...

হইয়া বনে ঢাল-তবে ...

দস্যুরা ...

... খোঁড়া ক'রে দেবো ওর দাদা ঢিল ছুঁড়ে তারও ঠ্যাং

বলিল—'তুই ... তো মুস্কিল হবে! আস্থক্ না ... যার সাথে তোর আড়ি

বলিল—'কল... বর্দার, কেউ জিজ্ঞেস কর্‌লে বল্‌বি না আমি ঢিল ছুঁড়েছি। সে তখন আমার চুল ধ'রে মাটিতে

তার... নাম ক'রে দিবি। আমি তা কর্‌তে রাজী হইনি। তবে ছাখ মজাটা!'

... লাথি মার্‌তে মার্‌তে বল্‌লো—আমার নামে লাগাবি?

মদ্যমাংস দিয়া সকলে একসঙ্গে চণ্ডীর পূজা করিব, তাহা হইলে নিশ্চয়ই সফলকাম হইব। একদিন আমাদের বিফলে গিয়াছে বলিয়া কি প্রতিদিনই তাহা হইবে ?'

এইরূপ যুক্তি করিয়া তাহারা মদ্যমাংস দিয়া ভক্তিভরে দেবী চণ্ডীর আরাধনা করিল। তাহার পর অন্ধকার রাত্রিতে নীলবস্ত্রে বীরের ন্যায় সজ্জিত হইয়া সকলের অগোচরে তাহারা বাহির হইল। প্রভু নিত্যানন্দের আবাস-মন্দিরের নিকটবর্তী হইয়া তাহারা দেখিল চতুর্দিকে নানা অস্ত্রধারী বহু পদাতিক সৈন্য গৃহ পাহারা দিতেছে। তাহাদের বিরাট দেহ দেখিয়া প্রচণ্ড শক্তিশালী বলিয়া বোধ হয়। ইহারা একজনেই তাহাদের শতজনকে বধ করিতে পারিবে। অথচ তাহাদের সকলেরই অঙ্গ চন্দনলিপ্ত, সকলেরই কণ্ঠে মালা দুলিতেছে এবং সকলেই অনুক্ষণ হরিনাম-সংকীর্তন করিতেছে। নিত্যানন্দ প্রভু তাহাদের মধ্যস্থলে শয়ন করিয়া আবেশে কৃষ্ণনামসুধা পান করিতেছেন। এই অভূতপূর্ব দৃশ্য দেখিয়া দস্যুগণ স্তম্ভিত হইল। তাহারা সে স্থান পরিত্যাগ করিয়া অন্য স্থানে যুক্তি করিতে গেল।

একজন বলিল, 'আচ্ছা, এই পদাতিক সৈন্যগুলি কোথা হইতে আসিল ?' অপরজনে বলিল, 'কি জানি, হয়ত' কোনরূপে আমাদের অভিসন্ধি জানিতে পারিয়া সন্ন্যাসী কাহারও নিকট হইতে সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছে।' আর একজন বলে, 'কি জান ভাই, সন্ন্যাসীঠাকুর খুব জ্ঞানী ব্যক্তি— এ-কথা আমি অনেকের কাছেই শুনিয়াছি। আমার মনে হয় ইনি নিজেকে এইভাবে রক্ষা করিয়াছেন। তাহা না হইলে দেখিতেছ না যে, এই পদাতিকের একজনও মনুষ্যের মত দেখিতে নয়—বোধ হয় ইঁহারা বৈকুণ্ঠের প্রহরী, গোঁসাই শক্তির প্রভাবে ইঁহাদের আনিয়াছেন।' একজন পরিহাস করিয়া 'তোমার গোঁসাই কেমন গোঁসাই, খাওয়া-পরা ত' তাঁহার দিব্য চলিতেছে।'
দিয়াছেন। ঐ বলিল, 'ইহা ঠিক কারণ নহে। নানা দিক্ হইতে অনেক বড় বড় লোক সন্ন্যাসীকে
রহিয়াছে। সোনা, মুক্তা, হীরা, কসা ভিন্ন অন্য [illegible]হিত এই পদাতিকরা আসিয়া থাকিবে—ইহারাও ভক্ত
একাকী বাস করেন. সুতরাং এক দণ্ডের মধ্যেই তাঁহার নিকট হইতে সমস্ত কা[illegible] সন্ন্যাসী সত্যই পদাতিক
আজ গভীর রাত্রির অন্ধকারে আমরা ঢাল, খাঁড়া ইত্যাদি অস্ত্রে সজ্জিত [illegible]কিবে—কয়দিন পরেই
হানা দিব।' চাপ কয়দিন গৃহে

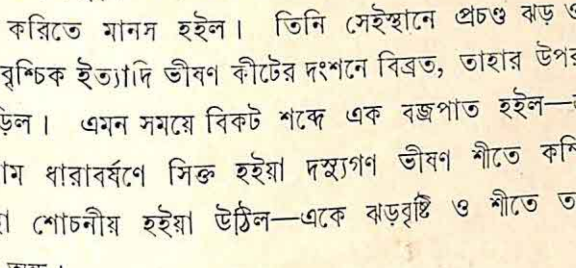
দস্যুদিগের নিকট ইহাপেক্ষা উত্তম প্রস্তাব আর কি থাকিতে পারে ! তাহারা [illegible] অপেক্ষা করিতে না করিয়া দলপতির প্রস্তাবে সম্মতিজ্ঞাপন করিল।

রাত্রি গভীর হইলে গাঢ় অন্ধকারে দস্যুদল খাঁড়া, ছুরি, ত্রিশূল ইত্যাদিতে [illegible] ইচ্ছা বিহার
গন্তব্যস্থানে যাত্রা করিল। তাহারা সকলে একত্রে নিত্যানন্দের বাসস্থানে না গিয়া [illegible]হইয়া উঠিল।
চর পাঠাইয়া দিল।

নিত্যানন্দ প্রভু তখন তাঁহার ভক্তগণের সহিত বসিয়া শ্রীকৃষ্ণের প্রসাদ সেবা করিতেছেন

সাহস করে নাই। এইরূপ মহা-ভয়ংকর রজনীতে চোর-দস্যুগণের অবাধ সঞ্চার। দস্যুগণ প্রত্যেকে নানাবিধ অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হইয়া মহানন্দে প্রভুর গৃহমধ্যে প্রবেশ করিল। কিন্তু সেখানে অন্ধকার এমনই গাঢ় যে প্রত্যেকেই তাহার দৃষ্টিশক্তি হারাইয়া অন্ধত্ব প্রাপ্ত হইল, এমন কি চক্ষু খুলিয়া রাখা পর্যন্ত দুষ্কর হইয়া উঠিল। এই ঘটনায় হতবুদ্ধি হইয়া তাহারা সম্বিৎ হারাইয়া ফেলিল এবং কেহ বা গৃহের চতুর্দিকে বেষ্টিত পরিখার মধ্যে পড়িয়া জোঁক, ডাঁশ ইত্যাদি কীটপতঙ্গের কামড়ে অস্থির হইয়া উঠিল, কেহ বা উচ্ছিষ্ট ফেলিবার গর্তের মধ্যে পড়িয়া বৃশ্চিকদংশনে জর্জরিত হইয়া উঠিল, আবার কেহ বা কণ্টকের বনে পতিত হইয়া সর্বাঙ্গে কণ্টকাহত হইয়া উত্থানশক্তিরহিত হইল। খালের মধ্যে পড়িয়া কয়েকজনের হস্তপদ ভগ্ন হইল ও কেহ কেহ সেইখানেই জ্বরাক্রান্ত হইল। দস্যুদলের মধ্যে মহাহুলুস্থূল পড়িয়া গেল। অনেকে ক্রন্দন আরম্ভ করিল। এই সময়ে দেবরাজ ইন্দ্রের কৌতুক করিতে মানস হইল। তিনি সেইস্থানে প্রচণ্ড ঝড় ও বৃষ্টি সৃষ্টি করিলেন। একে দস্যুগণ জোঁক, বৃশ্চিক ইত্যাদি ভীষণ কীটের দংশনে বিব্রত, তাহার উপর প্রচণ্ড শিলাবৃষ্টিতে তাহারা অর্ধমৃত হইয়া পড়িল। এমন সময়ে বিকট শব্দে এক বজ্রপাত হইল—ত্রাসে অনেকে মূর্ছিত হইয়া পড়িল। অবিরাম ধারাবর্ষণে সিক্ত হইয়া দস্যুগণ ভীষণ শীতে কম্পিতকলেবর হইল। দুর্ভাগা দস্যুগণের অবস্থা শোচনীয় হইয়া উঠিল—একে ঝড়বৃষ্টি ও শীতে তাহারা মৃতপ্রায়, তাহার উপর তাহারা দৃষ্টিহীন, অন্ধ।

অবশেষে অকস্মাৎ দস্যুসেনাপতি ব্রাহ্মণকুমারের মনে হইল নিত্যানন্দ প্রভু নিশ্চয়ই মানুষ নহেন, লোকে যে বলে তিনি ঈশ্বর, তাহা সত্য। একদিন তিনি মোহনিদ্রায় তাহাদের অভিভূত করিয়াছিলেন, কিন্তু তাহারা তাহা উপলব্ধি করিতে পারে নাই; অন্য একদিন তিনি তাহাদের ... পদাতিক সৈন্য দর্শন করাইলেন তবুও তাহাদের চেতনা হয় নাই। অনুশোচনায় পূর্ণ হইল। সে মনে মনে নিজেকে ধিক্কার দিল ... আমিই—হ... কেন প্রভুর ধন ... প্রভু ভিন্ন ...র কে ... যে চরণ চিন্তা করি... অন্তরে সেই চ... হে প্রভু, ক... আমি ...



...কিছু, ... হয় নীচু; ... নাকে। ঘোষণা ক'রে ... চ'লে গেলো। আ... —ভাসী-দি, হাবুল নিশ্চয়ই ওর দাদাকে ডেকে আন্‌তে গ্যাছে। ওর দাদা এলে মুস্কিল হবে। ভাসী-দি বল্‌লো— ...রী তো মুস্কিল হবে! আসুক্ না ওর দাদা ঢিল ছুঁড়ে তারও ঠ্যাং খোঁড়া ক'রে দেবো ... কিন্তু খবর্‌দার, কেউ জিজ্ঞেস কর্‌লে বল্‌বি না আমি ঢিল ছুঁড়েছি। যার সাথে তোর আড়ি ... তার নাম ক'রে দিবি। আমি তা কর্‌তে রাজী হইনি। সে তখন আমার চুল ধ'রে মাটিতে ... লাথি মার্‌তে মার্‌তে বল্‌লো—আমার নামে লাগাবি? তবে দ্যাখ মজাটা!'

জন্ম ...
... হ...
মাজার...

করিল। দলপতি ব্রাহ্মণ অশ্রুবিগলিতলোচনে শ্রীনিত্যানন্দের চরণে প্রণিপাত করিল। প্রভু সেই হতভাগ্যের প্রতি ক্ষমাকরুণ নয়নে শুভদৃষ্টিপাত করিলেন—চতুর্দিকে ভক্তেরা হরিধ্বনি করিয়া উঠিল। ব্রাহ্মণের সারা অঙ্গ পুলকে কদম্বের ন্যায় রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল—সেও দুই বাহু উর্ধ্বে তুলিয়া হরিধ্বনি করিতে করিতে নৃত্য করিতে লাগিল। দস্যুর এই অদ্ভুত আচরণ দেখিয়া সকলে বিস্মিত হইল। প্রভুর অগোচর কিছুই নাই। তথাপি প্রভু তাহাকে আহ্বান করিয়া সব কিছু জিজ্ঞাসা করিলেন। প্রথমে তাহার কোন বাক্যস্ফূর্তি হইল না—সে শুধুই ক্রন্দন করিয়া অঙ্গনে গড়াগড়ি দিতে লাগিল। তাহার পর কৃষ্ণনামে বিভোর ব্রাহ্মণ বাহ্যজ্ঞানশূন্য হইয়া নামগান করিতে লাগিল ও নৃত্য করিতে লাগিল। পরিশেষে প্রকৃতিস্থ হইয়া সে প্রভুর নিকট অকপটে তাহার সকল কাহিনী বিবৃত করিল।

কাহিনী বর্ণনা শেষ করিয়া সে বলিল, 'হে প্রভু, আমার অপরাধ মার্জনা করুন। আমি আর এ-দেহে আমার অপরাধের ভার বহন করিতে পারিতেছি না। আমি গঙ্গায় দেহ বিসর্জন করিয়া আমার সকল পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিব।'

ব্রাহ্মণের এই আন্তরিক অনুতাপে প্রভু নিত্যানন্দ প্রীত হইয়া তাহাকে কহিলেন, 'তুমি যদি এখন হইতে ধর্মপথে চল, তাহা হইলে তোমার সমস্ত পাপ আমি গ্রহণ করিব। তুমি আমায় নিকট হইতে 'হরিনাম' মন্ত্র গ্রহণ করো এবং তোমার দুষ্ট সঙ্গীদিগকে এই মহামন্ত্রে দীক্ষিত করিয়া তাহাদিগকেও ধর্মপথে লইয়া এস।'

ইহা বলিয়া প্রভু নিজকণ্ঠ হইতে মালা খুলিয়া ব্রাহ্মণের কণ্ঠে পরাইয়া দিলেন। চারিদিক্ ...ধ্বনিতে মন্দ্রিত হইয়া উঠিল। ব্রাহ্মণ সেই ধ্বনিতে কণ্ঠ মিলাইয়া কীর্তন করিতে লাগিল।

দিয়াছেন। ... সকল অপরাধ স্খলিত হইল। অতঃপর সে তাহার দস্যুতা ভুলিয়া নিরন্তর কৃষ্ণপ্রেমে রহিয়াছে। সোনা, মুক্তা, হীরা, কসা ভিন্ন অন্য ...
একাকী বাস করেন. সুতরাং এক দণ্ডের মধ্যেই তাঁহার নিকট হইতে সমস্ত কা...
আজ গভীর রাত্রির অন্ধকারে আমরা ঢাল, খাঁড়া ইত্যাদি অস্ত্রে সজ্জিত ... কয়াদন গৃহে হানা দিব।'

দস্যুদিগের নিকট ইহাপেক্ষা উত্তম প্রস্তাব আর কি থাকিতে পারে! তাহারা ... অপেক্ষা করিতে না করিয়া দলপতির প্রস্তাবে সম্মতিজ্ঞাপন করিল।

রাত্রি গভীর হইলে গাঢ় অন্ধকারে দস্যুদল খাঁড়া, ছুরি, ত্রিশূল ইত্যাদিতে ... ইচ্ছা বিহার গন্তব্যস্থানে যাত্রা করিল। তাহারা সকলে একত্রে নিত্যানন্দের বাসস্থানে না গিয়া ...হইয়া উঠিল। চর পাঠাইয়া দিল।

নিত্যানন্দ প্রভু তখন তাঁহার ভক্তগণের সহিত বসিয়া শ্রীকৃষ্ণের প্রসাদ সেবা করিতেছেন



রাজার অসুখ

কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত

রাজার হ'লো ভীষণ অসুখ রাজ্যে পড়ে সাড়া,
মন্ত্রী কোটাল সহর ঘুরে জাগিয়ে তোলেন পাড়া।
'কেউ যাবে না রাজার কাছে আর্জি নালিশ নিয়ে
আছেন রাজা শোবার
তোমরা শোনো
সারলে অসু
এখন শোকে
মসজিদ
এই
দুর্ভাব
মস্ত
সোনার
ছোঁন্
কেবল
বৃহৎ
রাজার

কোন্ যে অসুখ যায় না ধরা সবাই ম্রিয়মাণ,
মন্ত্রী কোটাল ব্যতিব্যস্ত বদ্যি আনতে যান।
করেন এপাশ-ওপাশ মাঝে-মাঝে ডাকেন,
বুদ রাজা যখন হাঁকেন।



ছু কেউ জানো না কিছু,
ঢিল মাথাটা হয় নীচু;
নাকে। ঘোষণা
চ'লে গেলো।
—ভাসী-দি, হাবুল নিশ্চয়ই
ওর দাদাকে ডেকে আন্‌তে
গ্যাছে। ওর দাদা এলে মুস্কিল
হবে। ভাসী-দি বল্‌লো—

ং। ভারী তো মুস্কিল হবে! আসুক্ না ওর দাদা ঢিল ছুঁড়ে তারও ঠ্যাং খোঁড়া ক'রে দেবো কিন্তু খবর্‌দার, কেউ জিজ্ঞেস কর্‌লে বল্‌বি না আমি ঢিল ছুঁড়েছি। যার সাথে তোর আড়ি হ তার নাম ক'রে দিবি। আমি তা কর্‌তে রাজী হইনি। সে তখন আমার চুল ধ'রে মাটিতে লে লাথি মার্‌তে মার্‌তে বল্‌লো—আমার নামে লাগাবি? তবে ছাখ মজাটা!'

যে সারাবে রাজার অসুখ হাজার মুদ্রা পাবে,
সারাতে না পারলে অসুখ গর্দানটি যাবে।
তোমরা যারা বদ্যি আছো সুযোগ নিতে পারো,
যতো রকম বিদ্যে জানা এবার কষে' ঝাড়ো।
সপ্তাহ এক সময় পাবে তাতেই হওয়া চাই,
সাত দিনেতে সারাতে হবে গোটা অসুখটাই।
কার কী সাহস দেখবো এবার যেয়ো প্রাসাদঘরে,
যেইখানেতে সাতমহলায় রাজা আছেন পড়ে'।'
এই না বলে' মন্ত্রী কোটাল বাজিয়ে বিষাণগুলি
মুহূর্তেই উধাও হলেন উড়িয়ে অশ্বধূলি।
সাতমহলায় শয়ান রাজা বদ্যি নানান আসে,
ভ্যাবাচাকা খেয়ে মরে এলেই রাজার পাশে।
বহালতবিয়ত রাজাসাহেব অসুখচিহ্ন নেই,
যে বলবে রুগ্ন রাজা মিথ্যেবাদী সেই।
কিন্তু যখন আসা গেছে উপায় নেই তো আর,
ওষুধ ঢেলেই রাখতে হবে অটুট নিজের ঘাড়।
কিন্তু হায়রে চেষ্টা বৃথাই, সাতটি দিনের শে...
'জাহান্নমে যাও উল্লুক', রাজা ...
এমনি ক'রে বদ্যি যারা ...
একে-একে ঘাড় দিল ...

নিজের দেশের রাজার অসুখ, আমি ভুগে মরি,
ওরা কেবল কথার সাগর, মিথ্যে বাহাদুরী!'
রূপোর খাটে রাজা শয়ান, বুকে দীর্ঘশ্বাস,
মাঝে-মাঝে হঠাৎ হেঁকে জাগান সবার ত্রাস।
এমন সময় খবর এলো আবার বদ্যি আসে,
কে এক ব্যক্তি হাজির আছে ধূসর জীর্ণবাসে।
রাজা ভাবেন, আবার লোভী হয়তো এলো কেউ,
হাজার মুদ্রা সোজা তো নয় বুকে জাগায় ঢেউ!
তবু যখন এসেই গেছে দেখা যাক না ফের,
অতি লোভে তাঁতী নষ্ট হতেই হবে ঢের!
রাজার হুকুম: বদ্যি এসে দাঁড়ালো পুরোভাগে,
বিরাট ঘরের জানলাকপাট দেখে নিল আগে।
রুদ্ধ যতো জানলাকপাট, রুদ্ধ অনেক কাল;
মাকড়সা সব আপন মনে ছড়ায় সেথায় জাল।
ভোরের সূর্য দখিন হাওয়া হুমড়ি খেয়ে মরে,
অর্গলিত ঘরের দ্বারে চাঁদের আলো ঝরে।
... রাতে রাজার ঘরে জ্বল্‌ছে আলোর ঝাড়,
... উভয় একাকার।
... হাঁকেন কড়া,
... ঝাপড়া!'

... হইতে মালা খুলিয়া ব্রাহ্মণের কণ্ঠে ...
...ঠল। ব্রাহ্মণ সেই ধ্বনিতে কণ্ঠ মিলাইয়া কীর্তন ...
...পরাধ স্খলিত হইল। অতঃপর সে তাহার দস্যুতা ভুলিয়া নির...
হইয়া টাকার লো মুক্তা, হীরা, কসা ভিন্ন অন্য ... যত
এক সপ্তাহ করেন. সুতরাং এক দণ্ডের মধ্যেই তাঁহার নিকট হইতে সমস্ত কা... ত।
আজ গভীর রাত্রির অন্ধকারে আমরা ঢাল, খাঁড়া ইত্যাদি অস্ত্রে সজ্জিত ... কয়দিন গৃহে
হানা দিব।'

দস্যুদিগের নিকট ইহাপেক্ষা উত্তম প্রস্তাব আর কি থাকিতে পারে! তাহারা অপেক্ষা করিতে না করিয়া দলপতির প্রস্তাবে সম্মতিজ্ঞাপন করিল।

রাত্রি গভীর হইলে গাঢ় অন্ধকারে দস্যুদল খাঁড়া, ছুরি, ত্রিশূল ইত্যাদিতে ... ইচ্ছা বিহার গন্তব্যস্থানে যাত্রা করিল। তাহারা সকলে একত্রে নিত্যানন্দের বাসস্থানে না গিয়া ...হইয়া উঠিল। চর পাঠাইয়া দিল।

নিত্যানন্দ প্রভু তখন তাঁহার ভক্তগণের সহিত বসিয়া শ্রীকৃষ্ণের প্রসাদ সেবা করিতেছেন

আব্দার দেখো না! সর না হ'লে মুখে ভাত রোচে না! নবাব-নন্দিনী! আর হিংসুটেও তো য়্যামন দেখিনি কোথাও। দিদি একটু সর খাবে, প্রাণে সইছে না! অতসী, পারিস্‌ও তুই এই নাকে-কান্না সইতে! আমি হ'লে দিতাম লাগিয়ে গালে ঠাস্ ঠাস্ দুই চড়।'

*

বিকেলে অতসীর ছেলেমেয়েদের সঙ্গে খেল্‌তে আসে পাশের বাড়ীর হাবুলরা। বাড়ীর বাইরে ছোট্ট একটু খোলা জায়গা। সেখানে সকলে খেলে। ভাসীও খেল্‌তে গেলো।



কিছুক্ষণ পরে অতসীর ছেলে কানু এসে মা'র কাছে কেঁদে পড়্‌লো—ভাসী-দি তাকে চুল ধ'রে টেনে মাটিতে ফেলে লাথি মেরেছে।

অতসী বল্‌লো—'ক্যানো রে? নিশ্চয়ই তুই-ও কিছু করেছিস্।'

কানু বল্‌লো—'আমি কিচ্ছু করিনি, মা। ভাসী-দি হাবুলদের দেখিয়ে দিয়ে বল্‌লো—ঠ্যাং-খোঁড়া-করা-খেলা জানিস্? দেখ্‌বি, ঢিল ছুঁড়ে ক্যামন ওদের ঠ্যাং খোঁড়া ক'রে দেই। ব'লেই সে হাবুলদের দিকে ঢিল ছুঁড়তে লাগ্‌লো। একটা ঢিল লাগ্‌লো গিয়ে হাবুলের নাকে। সে কাঁদ্‌তে কাঁদ্‌তে চ'লে গেলো। আমি বল্‌লাম —ভাসী-দি, হাবুল নিশ্চয়ই ওর দাদাকে ডেকে আন্‌তে গ্যাছে। ওর দাদা এলে মুস্কিল হবে। ভাসী-দি বল্‌লো—অ্যাঃ। ভারী তো মুস্কিল হবে! আসুক্ না ওর দাদা ঢিল ছুঁড়ে তারও ঠ্যাং খোঁড়া ক'রে দেবো না! কিন্তু খবর্‌দার, কেউ জিজ্ঞেস কর্‌লে বল্‌বি না আমি ঢিল ছুঁড়েছি। যার সাথে তোর আড়ি আছে তার নাম ক'রে দিবি। আমি তা কর্‌তে রাজী হইনি। সে তখন আমার চুল ধ'রে মাটিতে ফেলে লাথি মার্‌তে মার্‌তে বল্‌লো—আমার নামে লাগাবি? তবে ছাখ মজাটা!'

—পাঁচ—

ততক্ষণে হাবুলকে নিয়ে তার দাদা আর তাদের পেছনে পেছনে একদল ছেলেমেয়ে অতসীর বাড়ীতে এসে উপস্থিত। হাবুলের দাদা অতসীকে বল্‌লো—'দেখুন্ তো, মাসিমা, আপনার বাড়ীতে কোথাকার কোন্ এক দস্যি মেয়ে এসেছে, তার কি কাণ্ড!' হাবুল নাকের ব্যথায় তখনও কাঁদ্‌ছিল। অতসী দেখ্‌লো—হাবুলের নাকটা ফুলে লাল হ'য়ে উঠেছে।

সঙ্গের ছেলেমেয়েদেরও অনেকে নালিশ কর্‌লো—তাদের গায়েও মেয়েটা ঢিল ছুঁড়েছে।

হাবুলের দাদা বল্‌লো—'কোথায় সে পাজী মেয়েটা, বলুন্, মাসিমা। এক্ষুনি তার কান ধ'রে শিক্ষে দিয়ে যাই।'

অতসী 'বাবা' 'বাছা' ব'লে সকলকে শান্ত ক'রে বিদায় দিলো।

হাবুলদের দল চ'লে যেতেই বাতাসী দেখা দিলো। সে বল্‌লো—'তোর বাড়ীতে ডাকাতের দল এসেছিলো নাকি রে, অতসী? বাব্বাঃ! এসেই তম্বি কতো!—কান ধ'রে শিক্ষে দিয়ে যাই! আরে আমার শিক্ষেদেনাআলা! ক্যানো কিসের জন্যে ওদের এতো চোখ-রাঙানী? ভাসী কি দোষটা করেছে? ছেলেমানুষ, ঢিল ছুঁড়ে খেলা কর্‌ছিলো। দৈবাৎ একটা ঢিল লেগেছে ছেলেটার গায়। ঠ্যাং-খোঁড়া-করা-খেলা কি ভাসী নতুন খেল্‌ছে নাকি? আমাদের গাঁয়ের ছেলেদেরও তো কতো ঢিল ছুঁড়েছে সে। কই, কেউ-ই তো কখ্‌খনো নালিশ কর্‌তে আসেনি। আর তোর কানুর গুণের কথাটাও বল্‌ছি। সে হারামজাদা ব'লে না দিলে কি ক'রে ওরা জান্‌লো ভাসী ঢিল ছুঁড়েছে? তোর ছেলেটা তোকে যা বলেছে আমি নিজের কানেই তো শুনেছি। ভাসী আগেই তাকে মানা করেছিলো তার নাম যেন না বলে। কিন্তু ধম্মপুত্তুর যুধিষ্ঠির! দিদির জন্যে একটা মিথ্যে কথা বল্‌লে ওনার জিবটা খসে পড়্‌তো!'

ভাসী কোথায় লুকিয়ে ছিলো। এখন সে বের হ'য়ে এসে হিঃ হিঃ ক'রে হেসেই অস্থির! মা'র গায়ে একটা ঠেলা দিয়ে সে বল্‌লো—'দেখেছিস্, মা, আমার হাতের টিপ্, ছেলেটার নাকটাকে এক ঢিলেই রাঙ্গা-আলু বানিয়ে দিয়েছি!'

—ছয়—

দিন-তিনেক পরে অতসীর মেজো ছেলে একটা শশা চিবোতে চিবোতে ঘরে ফির্‌লো। অতসী জিজ্ঞেস কর্‌লো—'শশা পেলি কোথায় রে, রুনু?'

রুনু বল্‌লো—'ভাসী-দি দিয়েছে।'

—'ভাসী পেলো কোথায়?'

—'ট্যাবুলুদের বাড়ী আমাকে নিয়ে ভাসী-দি গিয়েছিলো কাল। তখন দেখে এসেছিলো তাদের শশাগাছে কচিশশা ফ'লে রয়েছে। আজ আমাকে তার সঙ্গে নিয়ে গিয়ে বল্‌লো—তুই

ওদিকে চেয়ে নজর রাখ্—কেউ এসে না পড়ে, আমি তাড়াতাড়ি ছুটো শশা চুরি ক'রে নিয়ে আস্‌ছি ! তুই একটা খাবি, আমি একটা খাবো।'

অতসী ছেলের কান ধ'রে ধম্‌কে উঠ্‌লো—'রুনু !' ভয়ে ভয়ে রুনু হাতের শশা মাটিতে ফেলে দিলো।

অতসী বল্‌লো—'ডাক্ তো ভাসীকে। এই বিগ্যে হ'য়েছে তোদের! পরের জিনিস চুরি ক'রে আনা ?'

কিন্তু ভাসীকে তখন ডেকে পায় কে ? অতসীর চড়া গলা শুনে তার কাছে এসে দাঁড়ালো ভাসীর মা। সে বল্‌লো—'কি হ'য়েছে রে ? চুরির কথা-ই-বা কি বল্‌ছিস্ ?'

যে-শশাটা মাটিতে প'ড়ে ছিলো অতসী আঙ্গুল দিয়ে তা দেখিয়ে দিয়ে বল্‌লো—'ত্যাখো দিদি, রুনুর আর ভাসীর কীর্ত্তি !'

কীর্ত্তিটা রুনুর মুখ থেকে বাতাসী একবার শুনেও নিলো। তারপর বল্‌লো—'এই নিয়ে এতো চেঁচামেচি ! ক্যানো রে, এতে দোষ কি ? গাছের ছুটো ফলপাকোর ছেলেপিলেরা পেড়ে এনে খাবে,—তা না-ই-বা ব'লে আনুক্,—তাকে কি বলে চুরি ? আর এজন্যে তুইও চোপা কর্‌ছিস্—ভাসী চুরি করেছে ! তুই মা'র পেটের বোন, তোকে দেখ্‌তে এসে কতো-ই-না আমার শুন্‌তে হ'লো ! এই সে-দিন তোর সাম্‌নেই কে এসে বল্‌লো—কান ধ'রে শিক্ষে দিয়ে যাবে ! আজ আবার তুই ছুন্নাম দিচ্ছিস্ চুরির ! হা কপাল ! মা'র পেটের বোনের বাড়ীতে ছু-দিনের জন্যে বেড়াতে এসে ঢের আক্কেল হ'লো ! ভাসী চোর, ভাসী পাজী, ভাসী দস্যি, ভাসীর কান ধ'রে শিক্ষে দেবে !—এতো হেনেস্তা স'য়ে কাজ নেই আর আমার তোর বাড়ীতে থাকা,—কাল ভোরেই আমরা চ'লে যাবো।'

*

কিন্তু, ভোর শুধু পরদিনই হ'লো না, তারপরও সাত-সাতদিনই একে একে এলো-গেলো, বাতাসীর নড়ার নাম নেই। একদিন সে খেতে ব'সে বল্‌লো—'মা'র পেটের বোন তুই, একটা কথার কথা মুখ দিয়ে বলেছিস্, তা কি আমি মনে গেঁথে রাখ্‌বো ! আর তুই-ই তো ব'লে রেখেছিস্—পূজোর আগে যেতে দিবি না। তোর সে কথা ঠেলি কি ক'রে ?'

*

রাতে মা'র কাছে শুয়ে ভাসী বল্‌লো—'ব'লে দে না, মা, পূজোর সময় মাসীর কাছে কি কি জিনিস চাইতে হবে ? মাসী না দেয় তো, আমি দেখেছি কোথায় সে টাকাপয়সা রাখে, লুকিয়ে তা এনে দেবো, বাড়ীতে গিয়ে তুই সব কিনে দিবি।'

ভাসী একটু জোরে জোরেই কথা বল্‌ছিলো। বাতাসী তার মুখ চেপে ধ'রে বল্‌লো—'পাগ্‌লী মেয়ে ! অতো চেঁচিয়ে বল্‌ছিস্ ক্যানো ? অতসী শুন্‌তে পাবে না ?'

কৃষকপুত্র ও নাৎসা

(রাশিয়ার রূপকথা)



হীরেন্দ্রনারায়ণ মুখোপাধ্যায়

অনেক কাল আগেকার কথা। জারের রাজ্য-সীমানা ছাড়িয়ে, বনের ধারে ছোট একটী গ্রামে বাস করতো এক কৃষক ও তার স্ত্রী। ক্ষেত-খামার অনেক ছিল কিন্তু তাদের বংশে বাতি দেবার কেউ ছিল না। প্রতিদিন কৃষক ভগবানের কাছে প্রার্থনা করতো, একটী সন্তান যেন তাদের হয়। মনে মনে সে প্রতিজ্ঞা করতো ঃ যদি পুত্র হয়, সকালে ঘুম থেকে উঠে সে যার মুখ দেখবে তাকেই করবে সেই ছেলের ধর্মপিতা।

ওদের স্বপ্ন একদিন সত্যি সফল হলো। ভগবান্ মনস্কামনা পূর্ণ করলেন। কৃষকের ঘরে জন্মগ্রহণ করলো এক রাজপুত্রের মত সন্তান। কৃষক ও কৃষকপত্নীর মন আনন্দে ভরে উঠলো।

সকালে ঘুম থেকে উঠেই কৃষক তাড়াতাড়ি গিয়ে দাঁড়ালো রাজপথে। প্রথম যাকে দেখবে, তাকেই সে করবে তার পুত্রের ধর্মপিতা। হঠাৎ রাজপথে দেখা দিলো চারঘোড়ার একখানি প্রকাণ্ড গাড়ী। গাড়ীতে বসে আছেন মহামান্য জার!

সসম্মানে অভিবাদন ক'রে কৃষক এগিয়ে গেল জারের সম্মুখে। হাত জোড় ক'রে বললে—'মহারাজ, আমার একটী প্রার্থনা আছে।'

'ব'লো, কি তোমার প্রার্থনা।'—জার মুখ তুলে চাইলেন কৃষকের দিকে।

'আপনি যদি অনুগ্রহ ক'রে আমার পুত্রের ধর্মপিতা হতেন, আমি ধন্য হতাম।'—কৃষক অনুনয় ক'রে বলে।

'কেন, তোমার কি কোন বন্ধু-বান্ধব নাই?'—জার জিজ্ঞাসা করলেন।

উত্তরে কৃষক বললে—'বন্ধু-বান্ধব আমার অনেক আছে, মহারাজ। কিন্তু এই শিশুর জন্মের আগে আমি প্রতিজ্ঞা করেছিলাম যে, সকালে ঘুম থেকে উঠে প্রথম যাঁর দর্শন পাবো, তাঁকেই করবো ওর ধর্মপিতা।'

শুনে জার ক্ষণকাল মৌন থেকে বললেন—'বেশ, তাই হবে। কাল সকালে আমি আসবো। তুমি দীক্ষার আয়োজন ক'রে রেখো।'

কৃষকের হাতে একশো-টি রুবল দিয়ে জার তাঁর গন্তব্য পথে চলে গেলেন।

পরদিন সকালে রাজা কৃষকের বাড়ীতে এলেন। প্রতিবেশীরা বিহ্বল দৃষ্টিতে চেয়ে রইল। পুরোহিত ডেকে শিশুকে দীক্ষা দেওয়া হ'লো। তার নাম রাখা হ'লো আইভানোভিচ্।

শিশুর ভরণপোষণের জন্য জার রাজকোষ হতে মাসোহারা বরাদ্দ করলেন। আইভানোভিচ দিনে দিনে চন্দ্রকলার মত বেড়ে উঠতে লাগলো।

তারপর ষোলটি বছর কেটে গেল। আইভান তখন মস্ত বড় হয়ে উঠেছে। হঠাৎ একদিন কৃষকের বাড়ীতে রাজার দূত এসে উপস্থিত হ'লো। জার আদেশ করেছেন, অবিলম্বে আইভান যেন তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে।—এ সংবাদে কৃষক ও কৃষকপত্নী যেমন আনন্দিত হলো, আইভানও হয়ে উঠলো তেমনি উৎসাহিত।

অতদূর পথ হেঁটে যেতে আইভানের কষ্ট হবে ভেবে, কৃষক তার হাতে কিছু টাকা দিয়ে বললে—'আজই সহরে গিয়ে একটি ঘোড়া কিনে নিয়ে এসো। ঘোড়াটি যেন ভাল হয়। রাজধানীতে যাবে, সেখানে কত ধনী, কত ঐশ্বর্য, কত সমারোহ!'

আইভান রওনা হলো। বাড়ী থেকে সাত ক্রোশ দূরে সহরতলির হাট। সেই হাটে বিক্রি হয় গরু, ঘোড়া, জন্তু-জানোয়ার। বাছাই ক'রে সে কিনে আনবে একটী ঘোড়া, যা দেখে রাজধানীর লোক অবাক্ হয়ে চেয়ে থাকবে।

আইভান আপন মনে হন্ হন্ ক'রে চলেছে। হঠাৎ মাঝপথে দেখা হলো পাকা-দাড়িওয়ালা এক বুড়োর সঙ্গে। বুড়ো হেসে বললে—'কি হে কৃষকের পো! ঘোড়া কিনতে যাচ্ছ বুঝি?'

আইভান অবাক্ হয়ে চেয়ে রইল তার মুখপানে: কেমন ক'রে বুড়ো জানলে তার মনের কথা!

বুড়ো একটু থেমে বললে—'যদি রাজ্য জয় করতে চাও, আমার কথা শোন। হাটের দক্ষিণে ওক গাছের তলায় দেখবে এক চাষী একটী রোগা ঘোড়া নিয়ে ব'সে আছে। সেই ঘোড়াটি কিনো।— যা চাও, তাই পাবে। সাতদিন শিশির-ভেজা ঘাস খাওয়ালেই সে ঘোড়া সবল হয়ে উঠবে।'

বৃদ্ধকে ধন্যবাদ দিয়ে আইভান দ্রুতপদে চললো সহরের পথে। হাটে গিয়ে দেখলে, বুড়ো যা বলেছিল সবই সত্যি। কোন দ্বিধা না ক'রে পঞ্চাশ রুবল দিয়ে সেই কৃষকের কাছ থেকে ঘোড়াটি কিনে বাড়ী ফিরলো।

পঞ্চাশ রুবল দিয়ে আইভান একটা রোগা ঘোড়া কিনে এনেছে দেখে, তার বাবা দুঃখিত হয়ে বললে—'টাকাগুলো জলে ফেলে দিয়ে এলে আইভান! এই রোগা কুৎসিত ঘোড়া নিয়ে না-হবে চাষ, না-হবে সওয়ারি।'

'সাতটি দিন সবুর করুন, বাবা। দেখবেন এই ঘোড়া কেমন সুন্দর ও সবল হয়।'—আইভান পিতাকে আশ্বাস দিয়ে বললে।

প্রতিদিন ভোরে উঠে আইভান ঘোড়াটিকে নিয়ে যায় দূর মাঠে। ভোরের শিশির-ভেজা তাজা তাজা ঘাস তাকে খাওয়ায়। দেখতে দেখতে সাতদিনের ভিতর ঘোড়াটি হয়ে ওঠে যেমন সবল তেমনি সতেজ। কৃষকের মন খুসীতে ভ'রে ওঠে: সত্যি ঘোড়াটি যেন হয়ে উঠলো রূপকথার পক্ষীরাজ।

এইবার বাপ-মায়ের কাছে বিদায় নিয়ে আইভান মনের আনন্দে যাত্রা করলো রাজধানীর উদ্দেশে। চল্লিশ ক্রোশ পথ চোখের নিমেষে অতিক্রম ক'রে সে এসে হাজির হ'লো রাজ-প্রাসাদের সামনে। বুঝতেও পারলে না, ঘোড়া ছুটে এলো না আকাশপথে উড়ে এলো ডানা মেলে। তবে, এ কথা বুঝতে আইভানের দেরী হলো না যে, ঘোড়া আইভানের মনের কথা সব জানতে পারে।

গায়ে মাথায় সযত্নে হাত বুলিয়ে, অশ্বশালায় ঘোড়াটিকে বেঁধে রেখে আইভান প্রাসাদ-দ্বারে গিয়ে উপস্থিত হ'লো। রাজাকে আগমন-বার্তা জানিয়ে আদেশের অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে রইল।

অবিলম্বে দেহরক্ষীরা এসে আইভানকে সসম্মানে নিয়ে গেল রাজার বিশ্রাম-কক্ষে। অমাত্যরা অবাক্ হয়ে চেয়ে রইল। কেউ কোন কথা বলতে সাহস করলো না।

রাজকক্ষে প্রবেশ ক'রে আইভান অভিবাদন ক'রে বললে—মহামান্য সম্রাট্, আমার নমস্কার গ্রহণ করুন। আপনার দীর্ঘ আয়ু কামনা করি।

জার সস্নেহে আইভানকে পাশে বসিয়ে কুশল প্রশ্ন করলেন। নির্ণিমেষ দৃষ্টিতে চেয়ে রইলেন তার সুন্দর, দীর্ঘ ও বলিষ্ঠ চেহারার দিকে। মনে মনে যথেষ্ট প্রশংসা না ক'রে পারলেন না। আইভান সত্যি সুন্দর ও সপ্রতিভ যুবা হয়ে উঠেছে। দেখলে মনে হয়, বয়েস তার কুড়ি বছরের কম নয়। ভগবান্ ওকে পাঠিয়েছেন দুঃসাহসিক কার্যের নেতা হবার জন্যে; সাধারণ সৈনিক হবার জন্যে নয়।

আইভানকে উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারীর সম্মান দিয়ে জার তাকে রাজকার্যে নিযুক্ত করলেন। উৎসাহভরে আইভান কার্যভার গ্রহণ করলো। তার বুদ্ধি ও কর্মতৎপরতা দেখে জার পরম

পরিতৃপ্ত হলেন। কিন্তু অমাত্য ও অন্যান্য আত্মীয়স্বজনের মনে জ্বলে উঠলো ঈর্ষার আগুন। তারা সুযোগ খুঁজতে লাগলো কেমন ক'রে আইভানকে সরানো যায়।

কিছুদিন যেতে না যেতেই রাজা এক ভোজের আয়োজন করলেন আইভানের জন্মদিন উপলক্ষে। কয়েকজন বিশিষ্ট বন্ধু-বান্ধব ও প্রধান প্রধান অমাত্যেরা নিমন্ত্রিত হলেন এই ভোজ-সভায়।

ভোজের উৎসব যখন শেষ হয়ে এলো, রাজা অতিথিদের জিজ্ঞেস করলেন—'আমার ধর্মপুত্র আইভান সম্পর্কে আপনাদের কি মতামত। আশা করি তার ব্যবহারে আপনারা সকলেই সন্তুষ্ট।'

অতিথিরা মুখ চাওয়া-চাওয়ি করতে লাগলেন। একটু ইতস্তত ক'রে তাঁরা বললেন—'মহামান্য সম্রাট্, আপনার ধর্মপুত্র সম্পর্কে আমাদের বক্তব্য কি থাকতে পারে! তবে, নিজের শক্তি সম্পর্কে ধারণা তার বড় বেশী। সে বলে, তার অসাধ্য কাজ পৃথিবীতে কিছু নাই। এমন কি, সাইবেরিয়ার মরুপ্রান্তর পেরিয়ে দুর্ভেদ্য প্রাচীরে ঘেরা যে রাজ্য আছে, সে নাকি সেখানকার রাজকন্যাকে নিয়ে এসে বিয়ে করবে। অহঙ্কারের সঙ্গে আইভান এই কথা ঘোষণা করে।'

এই অশোভন অহঙ্কারের কথা শুনে জার দুঃখিত হয়ে তাকে জিজ্ঞেস করলেন—'এ কথা কি সত্যি, আইভান?'

আইভান বিনয়ের সঙ্গে বললেন—'মহারাজ, এ কথা সত্য নয়। আমি এরূপ দম্ভ কখনো করিনি।'

জার গম্ভীরকণ্ঠে বললেন—'কিন্তু এঁদের কথা তো আমি অবিশ্বাস করতে পারি না। নিশ্চয়ই তুমি বলেছ।'

আইভান জবাব দিল—'মহারাজ, একথা আমি স্বপ্নেও ভাবি নি।'

জার বললেন—'দোষ অস্বীকার করবার সময় চলে গেছে। এ রাজ্যের নিয়ম, যদি কেউ অহঙ্কার ক'রে কোন কথা বলে, তাকে সে কাজ করতেই হবে। যদি না পারে, প্রাণদণ্ড নিতে হবে।'

কৃষকপুত্র আইভান হতাশায় মুখ নীচু ক'রে রইল। ক্ষণকাল ভেবে নিয়ে বললে—'মহারাজ, আপনার আদেশ মাথা পেতে নিলাম। আপনার শুভেচ্ছা থাকলে সবই পারবো।'

আইভান সকলকে অভিবাদন ক'রে সভা ত্যাগ করলো। অতিথিরা চেয়ে রইল তার মুখপানে।

পরদিন সকালে উঠে আইভান অশ্বশালায় গিয়ে তার ঘোড়াটির গায়ে হাত দিয়ে দাঁড়ালো। মুখে দুশ্চিন্তার ছায়া।

আইভানের মনের অবস্থা বুঝতে ঘোড়ার দেরী হলো না। আশ্বাস দিয়ে সে বললে—'ভয় ক'রো না বন্ধু। সঙ্গে কিছু সোনা-দানা আর একখানি তরবারি নিয়ে আজই যাত্রা কর। সাতরাজ্য মরুপ্রান্তর পার হয়ে আমরা সন্ধ্যাতেই পৌঁছব সেই স্বপন-পুরীতে। অন্ধকার যখন ঘনিয়ে আসবে,

নীল ডানা-ওয়ালা ঈগলপাখী হয়ে আমি সেই দুর্ভেদ্য প্রাচীর লঙ্ঘন ক'রে প্রবেশ করবো মর্মর প্রাসাদে। সুন্দরী রাজকন্যা তখন ঘুমিয়ে থাকবে। তুমি সাহস সঞ্চয় ক'রে তার ঘরে ঢুকবে। আস্তে আস্তে তাকে তুলে নিয়ে তুমি বেরিয়ে আসবে। রাত্রি প্রভাত হবার আগেই আমরা ফিরে আসবো রাজধানীতে। কিন্তু সাবধান, রাজকন্যার যেন ঘুম না ভাঙে। প্রাসাদের কেউ যেন টের না পায়।'

আইভান প্রস্তুত হয়ে এলো। ঘোড়া তাকে পিঠে নিয়ে চোখের নিমেষে রাজধানী ছেড়ে ছুটলো সেই স্বপন-পুরীর পথে।

সাতরাজ্য মরুপ্রান্তর পেরিয়ে ওরা যখন সেই দুর্ভেদ্য মহাপ্রাচীরের সামনে এসে উপস্থিত হলো, তখন সন্ধ্যা ঘনিয়ে এসেছে। অন্ধকার নেমে আসতেই ঘোড়া নীল ঈগল পাখীর রূপ ধ'রে আইভানকে প্রাচীরের ওপারের শ্বেতপাথরের সুন্দর-আঙ্গিনায় নামিয়ে দিল।

মর্মর প্রাসাদে প্রবেশ ক'রে কৃষকপুত্র আইভান অবাক্ হয়ে প্রত্যেকটি ঘর ঘুরে ঘুরে দেখতে লাগলো। সব কিছুই অপূর্ব সুন্দর! ছায়াঘেরা নীরব নিঝুম রাজপুরী। দাসদাসীরা সব ঘুমিয়ে পড়েছে।

চারিদিক্ দেখে নিয়ে আইভান সুন্দরী নাৎসার ঘরে গিয়ে ঢুকলো। সোনার পালঙ্কে মখমলের বিছানায় ঘুমিয়ে আছে সুন্দরী রাজকন্যা নাৎসা। পরমা সুন্দরী নাৎসাকে দেখে আইভানের মন আবেশে ভরে উঠলো। ঘুমন্ত রাজকন্যাকে একটুখানি আদর করবার দুরন্ত ইচ্ছা সে চেপে রাখতে পারলো না।

......সঙ্গে সঙ্গে রাজকন্যা জেগে উঠলো। চীৎকার ক'রে ডাকতে সুরু করলো দাস-দাসীদের। হুড়মুড় ক'রে সবাই ছুটে এসে ধ'রে ফেললো আইভানকে। হাত-পা বেঁধে তাকে নিয়ে গেল কারাগারে।

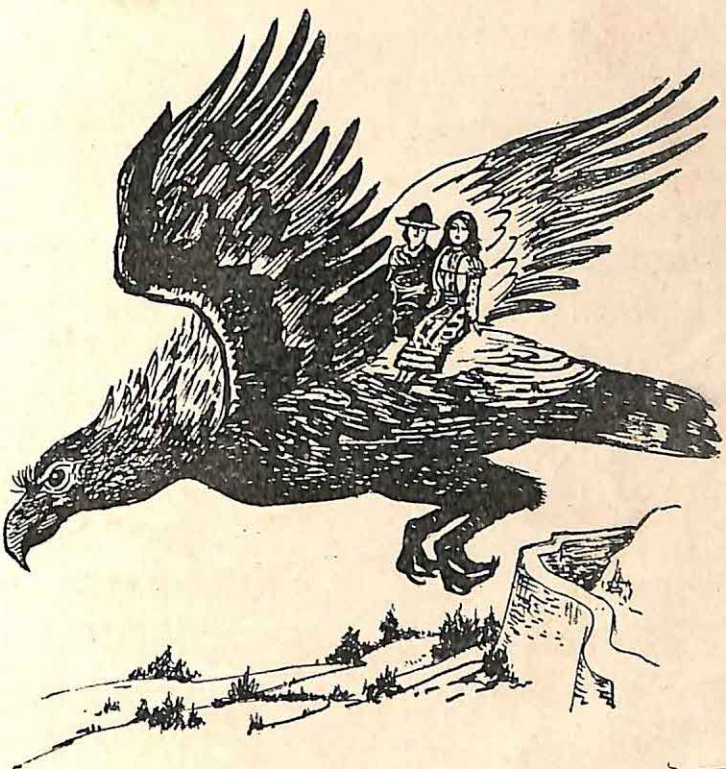
অন্ধকার কারাকক্ষে হতাশায় আইভানের দিন কাটে। দিনান্তে এক টুক্‌রো রুটি ও এক গেলাস জল ছাড়া আর কিছুই তার ভাগ্যে জোটে না। আইভান ভাবে, জীবনের বাকী দিনগুলো তার এমনি ক'রেই কাটবে এই নির্জ্জন কারাগারে! ভাবতে আইভানের চোখে জল আসে। পরমুহূর্ত্তেই মনে সাহস সঞ্চয় ক'রে সে বীরদর্পে মাথা উঁচু ক'রে দাঁড়ায়।

হঠাৎ আইভান দেখে যে, কারাগারের গবাক্ষে একটী ছোট নীল পাখী এসে বসেছে। আইভানকে সম্বোধন ক'রে বলে—'ভয় ক'রো না, বন্ধু। কাল ভোরে রাজকন্যা আসবে এই উদ্যানে ফুল তুলতে। তুমি প্রস্তুত থেকো। কারাগারের দরজা খোলা থাকবে। রাজকন্যা এলেই আমি বৃদ্ধ ভিখিরীর বেশ ধ'রে তাকে বার বার ভিক্ষে চেয়ে বিব্রত করবো। তুমি দরজা খুলে হঠাৎ ছুটে বেরিয়ে আসবে। তাকে তুলে নিয়ে আমার পিঠে চেপে বসবে। আমি আবার ঈগল হয়ে আকাশে উঠবো।'

আইভান আশ্বস্ত হলো ঃ ছোট নীল পাখী তারই বিশ্ববিজয়ী পক্ষীরাজ!

পরদিন সকালে ঠিক তাই ঘটলো। রাজকন্যা যখন একা ফুল তুলে বেড়াচ্ছিল উদ্যানে, হঠাৎ এক বৃদ্ধ ভিক্ষুক এসে তাকে বিব্রত ক'রে তুলতে লাগলো ভিক্ষে চেয়ে।

আইভান চেয়ে দেখলো, কারাগারের তালা খোলা। দরজাটা টান দিতেই খুলে গেল। ছুটে বেরিয়ে সে রাজকন্যাকে তুলে নিতেই ভিক্ষুক ঈগলপাখীর রূপ ধরলো। মুহূর্তে উঠলো আকাশে। সে রাজ্য পেরিয়ে এসে রাজকন্যা ও আইভানকে নামিয়ে দিল সবুজ মাঠের মাঝখানে।



আইভান রাজকন্যাকে সম্বোধন ক'রে বললে—'কিগো সুন্দরী রাজকন্যা! এবারও কি আমায় কারাগারে বন্দী করবে?'

নাৎসা উত্তর করলো—'না। আমার ভাগ্য তোমার সঙ্গে জড়িয়ে গেছে! আমায় নিয়ে তুমি যা খুসী করতে পারো।'

এবার তারা দুজনে উঠে বসলো ঘোড়ার পিঠে। ঘোড়া তাদের নিয়ে নক্ষত্রবেগে ছুটে চললো সাতরাজ্য মরুপ্রান্তর পার হয়ে।

হঠাৎ মাঝপথে ঘোড়া থামলো। মরুপ্রান্তরে দুই বিরাট দৈত্য মল্লযুদ্ধ করছিল। দুজনেরই দেহ রক্তাক্ত। কিন্তু কেউ কারো কাছে পরাজয় মানে না। তাদের সামনে মাটির ওপর পড়ে আছে একখানি তরবারি ও একখানি লাঠি।

আইভান তাদের সম্বোধন ক'রে বললে—'আপনারা এমন মরিয়া হয়ে যুদ্ধ করছেন কেন, বলুন তো?'

উত্তর এলো—'কেন, তা তুমি বুঝবে না। এই তরবারি ও লাঠি আমাদের পৈতৃক সম্পত্তি। কে কোন্‌টির মালিক হবে, তাই নিয়ে আমাদের বিরোধ।'

'এই সামান্য জিনিষ দুটো নিয়ে ভাই-এ ভাই-এ এত বিরোধ?' আইভান প্রশ্ন করে।

দৈত্যেরা হুঙ্কার দিয়ে ওঠে—'সামান্য জিনিষ! এই তরবারি ও লাঠি দিয়ে পৃথিবীর যে কোন শত্রুকে ধ্বংস করা যায়। শত্রুপক্ষের সৈন্যবল যত বেশীই হোক, এই তরবারি নিয়ে আক্রমণ করলে সব দ্বিখণ্ডিত হয়ে যাবে। আর এই লাঠি উঁচিয়ে ধরলে, শত্রুরা সুড় সুড় ক'রে হামাগুড়ি দিয়ে কারাগারে প্রবেশ করবে।'

শুনে আইভান বললে—'বড় চমৎকার জিনিষ তো! আপনারা অকারণ মারামারি করবেন না। আমি দুটো জিনিষ দু ভাইকে ভাগ করে দিচ্ছি।'

'সত্যি? তবে তাই দাও? আমরা তোমার গোলাম হয়ে থাকব।' দৈত্যেরা নিরস্ত হল।

আইভান তাড়াতাড়ি পকেট থেকে সোনার দানাগুলো বের ক'রে ঘাসের ওপর ছড়িয়ে দিয়ে বললে—'এগুলো একটি একটি করে কুড়িয়ে নিন। যিনি বেশী সোনা কুড়িয়ে নিতে পারবেন, তিনিই হবেন তরবারি ও লাঠির মালিক।'

সূর্য্যকিরণে ঝক্ ঝক্ করে সোনাদানা! দৈত্যেরা ঝাঁপিয়ে পড়লো সেগুলো কুড়োবার জন্যে। সেই অবসরে আইভান তরবারি ও লাঠিটা তুলে নিয়ে ঘোড়ার পিঠে চেপে বসলো। ঘোড়া আবার ঈগলের রূপ ধ'রে উঠলো আকাশে!

আইভান যখন রাজধানীতে ফিরে এলো তখন রাজ্যে মারামারি কাটাকাটি সুরু হয়েছে। বিদেশী শত্রুরা সৈন্যদল নিয়ে রাজধানী আক্রমণ করেছে। ধর্মপিতা জার বিপন্ন।

আইভান তাড়াতাড়ি ঘোড়া থেকে নেমে শত্রুদের আক্রমণ করলো তার মন্ত্রপূত তরবারি নিয়ে। শত্রুরা তরবারির আঘাতে দলে দলে ভূপতিত হতে লাগলো। লাঠির সাহায্যে শত্রুপক্ষের অধিনায়কদের কারাগারে বন্দী করলো।

রাজা আনন্দে উল্লসিত হয়ে আইভানকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন। বিজয়ী আইভানের আগমন-বার্তা সাম্রাজ্যে ঘোষণা করা হ'লো।

নাৎসার সঙ্গে আইভানের বিয়ে দিয়ে রাজা তাকে রাজ-অন্তঃপুরে বরণ ক'রে নিলেন। কৃষক পুত্র আইভান হলো রাজ্যের প্রধান সেনাপতি।

সেনাপতি হয়েও আইভান প্রতিদিন শিশির-ভেজা ঘাস এনে দেয় তার ঘোড়াটিকে আর পল্লীকুটীরে গিয়ে দেখে আসে তার বুড়ো বাপ-মাকে।

সোলংকী জয়সিংহ সিদ্ধরাজ



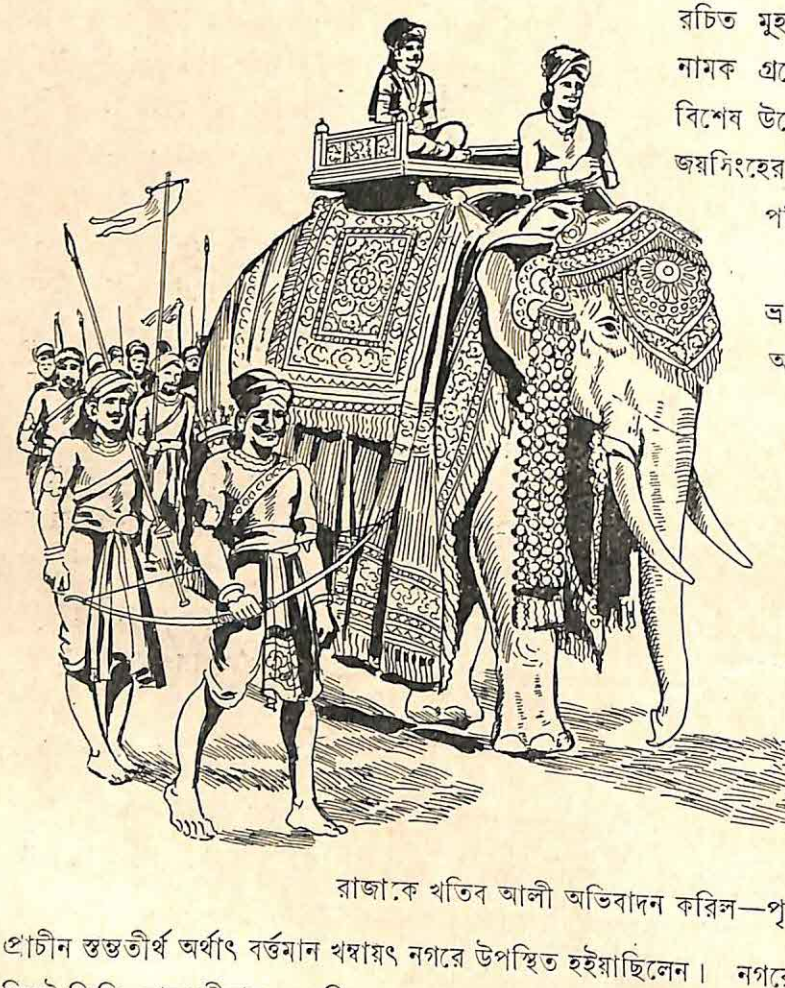
শ্রীদীনেশচন্দ্র সরকার

জগতের ইতিহাসে দেখা যায়, পরধর্ম্মবিদ্বেষের প্ররোচনায় রাজগণ বহু যুদ্ধবিগ্রহে লিপ্ত হইয়াছেন। স্বধর্ম্মকে ভাল এবং পরধর্ম্মকে হীন মনে করা মানুষের স্বাভাবিক দুর্ব্বলতা। ভারতবর্ষেও বিভিন্ন ধর্ম্মসম্প্রদায়ের নেতৃগণের মধ্যে সর্ব্বযুগে সকলেই পরধর্ম্মদ্বেষ হইতে মুক্ত ছিলেন, তাহা বলা যায় না। তবে আমাদের দেশ নানা বিভিন্ন ধর্ম্ম ও মতাবলম্বীর বাসস্থান বলিয়া বুদ্ধিমান্ ভারতীয় নরপতিগণ সাধারণতঃ ধর্ম্মবিদ্বেষকে প্রশ্রয় দিতেন না। খ্রীষ্টপূর্ব্ব তৃতীয় শতাব্দীতে মৌর্য্যবংশীয় সম্রাট্ অশোক ঘোষণা করিয়াছিলেন যে, তাঁহার প্রজাগণের মধ্যে কেহ যেন নিজ ধর্ম্মের প্রশংসা কিংবা পরধর্ম্মের নিন্দা না করে এবং এক সম্প্রদায়ের ব্যক্তিরা অপরাপর সম্প্রদায়ের ধর্ম্মবিষয়ক আলোচনা শ্রদ্ধার সহিত শ্রবণ করে। তিনি স্বয়ং বৌদ্ধ হইয়াও অন্যান্য ধর্ম্মসম্প্রদায়ের নেতৃবর্গকে শ্রদ্ধা করিতেন। বুদ্ধিমান্ ভারতীয় নরপতিগণের ধর্ম্মনীতি সর্ব্বযুগেই এই আদর্শ অনুসারে পরিচালিত হইত। মধ্যযুগের সোলংকী বা চৌলুক্য বংশীয় রাজপুত রাজগণের ইতিহাসে ইহার অকাট্য সাক্ষ্য রহিয়াছে।

সোলংকীরা খ্রীষ্টীয় দশম শতাব্দীর মধ্যভাগ হইতে চতুর্দ্দশ শতাব্দীর আরম্ভ পর্য্যন্ত গুজরাট-কাঠিয়াবাড় অঞ্চলে রাজত্ব করিতেন। ভূতপূর্ব্ব বড়োদারাজ্যের অন্তর্গত পাটন অর্থাৎ প্রাচীন অণহিলপাটক-পত্তন সোলংকী রাজগণের রাজধানী ছিল। আরবসাগরের তীরবর্ত্তী বহু বন্দর এবং সুপ্রসিদ্ধ প্রভাসতীর্থ সোলংকী রাজ্যের অন্তর্গত ছিল। এই প্রভাসক্ষেত্রেই জগদ্বিখ্যাত সোমনাথ মন্দির অবস্থিত ছিল। সোলংকীরাজ প্রথম ভীমের (১০১২-৬৪ খ্রীঃ) রাজত্বকালে ১০২৬ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে গজনীর তুর্কী মুসলমান সুলতান বিশ্রুতকীর্ত্তি মাহ্মুদ সোমনাথ মন্দির ধ্বংস করিয়াছিলেন। রাজা ভীম হিন্দুমন্দিরের গৌরব রক্ষা করিতে সমর্থ হন নাই। কথিত আছে, মুসলমান আক্রমণ হইতে সোমনাথ মন্দির রক্ষার চেষ্টায় ৫০ সহস্র হিন্দুর প্রাণ বিনষ্ট হইয়াছিল। সোমনাথ-ধ্বংসের সংবাদে ভারতের সমস্ত ধর্ম্মপ্রাণ হিন্দুর মনে আঘাত লাগিয়াছিল, সন্দেহ নাই।

কিন্তু ইহা সত্ত্বেও রাজা ভীমের উত্তরাধিকারিগণ সোলংকীরাজ্যের মুসলমান প্রজার প্রতি যে উদারতা প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহা সত্যই আশ্চর্য্যের বিষয়। মহাপরাক্রান্ত জয়সিংহ সিদ্ধরাজ (১০৯৪-১১৪৪ খ্রীঃ) সোলংকীরাজ প্রথম কর্ণের পুত্র এবং সুলতান মাহ্‌মুদের প্রতিদ্বন্দ্বী প্রথম ভীমের পৌত্র ছিলেন। মেরুতুঙ্গের প্রবন্ধচিন্তামণি প্রভৃতি নানা ভারতীয় গ্রন্থে এবং মুসলমান ঐতিহাসিকগণের রচনায় তাঁহার চরিত্রবিষয়ক অনেক কাহিনী পাওয়া যায়। এই সম্পর্কে ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রথমভাগে রচিত মুহম্মদ উফীর জামিউলহিকায়ৎ নামক গ্রন্থে বর্ণিত একটি কাহিনী বিশেষ উল্লেখযোগ্য। উহাতে রাজা জয়সিংহের ধর্ম্মবিষয়ক উদারতার পরিচয় পাই।

মুহম্মদ উফী ভারতবর্ষে ভ্রমণ করিতে করিতে একবার আরবসাগরের তীরবর্ত্তী

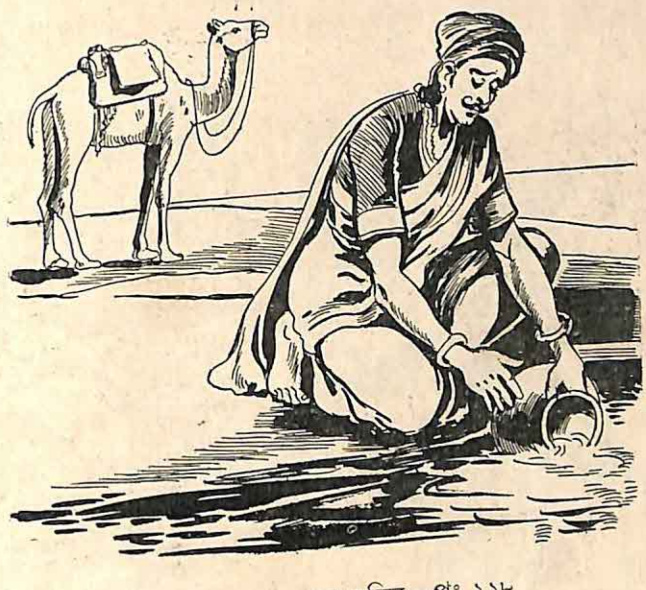


রাজাকে খতিব আলী অভিবাদন করিল—পৃঃ ১১৭

প্রাচীন স্তম্ভতীর্থ অর্থাৎ বর্ত্তমান খম্বায়ৎ নগরে উপস্থিত হইয়াছিলেন। নগরের মুসলমান অধিবাসীদের নিকট তিনি সোলংকীরাজ জয়সিংহের সম্বন্ধে অনেক গল্প শুনিতে পান। জয়সিংহের রাজত্বকালে খম্বায়তে কতকগুলি সুন্নী মুসলমান বাস করিত। তাহাদের একটি মসজিদ ছিল; উহার নিকটবর্ত্তী মিনার হইতে আজান ধ্বনিত হইত। তখন ঐ নগরে কতকগুলি অগ্নি-উপাসক পার্শীও বাস করিত। খ্রীষ্টীয় সপ্তম-অষ্টম শতাব্দীতে পারস্য দেশ আরব মুসলমান কর্ত্তৃক অধিকৃত হয়। ফলে, অধিকাংশ

পারস্যবাসী ইস্‌লাম ধর্ম্ম গ্রহণ করিতে বাধ্য হয় ; কিন্তু কতকগুলি ধর্ম্মপ্রাণ পার্শী পলাইয়া আসিয়া ভারতবর্ষের পশ্চিম উপকূলে আশ্রয় গ্রহণ করে। ভারতের পার্শীরা তাই মুসলমানদিগের প্রতি বিরাগের ভাব পোষণ করিত। খম্বায়ৎবাসী পার্শীরা স্থানীয় হিন্দুগণকে মুসলমানদিগের বিরুদ্ধে প্ররোচনা দিতেছিল। উহার ফলে হিন্দুরা মুসলমানদিগের মস্‌জিদটি পুড়াইয়া দেয় এবং মিনারটি ধ্বংস করে। এই বিবাদ উপলক্ষ্যে আশীজন স্থানীয় মুসলমান নিহত হইয়াছিল।

খতিব আলী নামক একব্যক্তি খম্বায়তের মুসলমানদিগকে মস্‌জিদে খুৎবা পাঠ করাইত। দাঙ্গার সময়ে সে প্রাণ লইয়া সোলংকীরাজধানী অণহিলপাটকে পলায়ন করে। সে রাজসভার বহু গণ্যমান্য ব্যক্তির নিকট তাহার করুণ কাহিনী নিবেদন করিল ; কিন্তু তাঁহারা কেহই মোকদ্দমার সুবিচার করিলেন না। এই সকল হিন্দু রাজকর্ম্মচারী খম্বায়তের হিন্দুগণের বিরুদ্ধে খতিব আলীর অভিযোগ গ্রহণ করিতে অনিচ্ছুক ছিলেন।



পাত্রে লবণাক্ত জল ভরিল—পৃঃ ১১৮

একদিন রাজা জয়সিংহ শিকারে যাইতেছিলেন। সংবাদ পাইয়া খতিব আলী তাঁহার গন্তব্য পথে এক বৃক্ষতলে বসিয়া রহিল। হস্তিপৃষ্ঠে রাজা নিকটবর্ত্তী হইলে সে উঠিয়া তাঁহাকে অভিবাদন করিল এবং তাঁহার হস্তে একখানি আবেদন পত্র পেশ করিল। ঐ আবেদনে সে হিন্দী পদ্যে খম্বায়ৎবাসী হিন্দু ও পার্শীগণ কর্ত্তৃক মুসলমানদিগের নির্য্যাতনের কাহিনী সবিস্তার লিপিবদ্ধ করিয়াছিল। সমস্ত বিবরণ জানিয়া রাজা জয়সিংহ খতিব আলীর ভার একজন অনুচরের উপর ন্যস্ত করিলেন। অনুচরের উপর আদেশ রহিল, সে যেন খতিব আলীর যথাযোগ্য যত্ন করে এবং যথাসময়ে তাহাকে রাজসভায় উপস্থিত করে।

শিকারের অবসানে রাজপ্রাসাদে পৌঁছিয়া রাজা জয়সিংহ প্রধান মন্ত্রীকে ডাকাইয়া বলিলেন, "মন্ত্রী মহাশয়, আগামী কয়েকদিন আমি একটা কাজের জন্য অন্তঃপুরে ব্যস্ত থাকিব। এই কয়দিন আপনি রাজকার্য্য পরিচালনা করিবেন ; আমার নিকট কোন বিষয় উপস্থিত করার প্রয়োজন নাই।"

সেইদিন রাত্রিকালে রাজা বণিকের ছদ্মবেশে উষ্ট্রপৃষ্ঠে রাজপ্রাসাদ ত্যাগ করিয়া খম্বায়ৎ অভিমুখে যাত্রা করিলেন। অণহিলপাটক হইতে খম্বায়ৎ পর্য্যন্ত ৪০ পারাসঙ্ (১৪৮ মাইল) পথ তিনি প্রায় ২৪ ঘণ্টায় অতিক্রম করিলেন। সন্ধ্যাবেলা খম্বায়ৎ পৌঁছিয়া রাজা নগরের নানা স্থানে নানা ব্যক্তির নিকট হইতে সংবাদ সংগ্রহ করিতে লাগিলেন। জানা গেল যে, খতিব আলীর অভিযোগ মিথ্যা নহে। সত্যই খম্বায়ৎবাসী মুসলমান প্রজাগণ হিন্দু ও পার্শীদের দ্বারা বিনা দোষে নির্য্যাতিত হইয়াছে। অতঃপর রাজা জয়সিংহ সমুদ্রের খানিকটা লবণাক্ত জল একটি পাত্রে পূরিয়া নিলেন এবং সেই রাত্রেই পুনরায় উষ্ট্রপৃষ্ঠে রাজধানী অভিমুখে প্রস্থান করিলেন। পরদিন সন্ধ্যাকালে তিনি অণহিলপাটকে পৌঁছিলেন।

রাজা জয়সিংহ পরদিন দরবারে বসিয়া বিচার প্রার্থীদিগকে তাহাদের আবেদন পেশ করিতে



বলিলেন। খতিব আলীর মোকদ্দমারও বিচার আরম্ভ হইল। খতিব আলী যখন খম্বায়তের হিন্দু ও পার্শীদিগের দ্বারা স্থানীয় মুসলমানগণের নির্য্যাতন কাহিনী বর্ণনা করিতেছিল, তখন রাজপারিষদগণ তাহাকে বাধা ও ধমক দিতেছিলেন এবং তাহার অভিযোগ মিথ্যা প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করিতেছিলেন। রাজা জয়সিংহ কাহাকেও কিছু না বলিয়া খম্বায়ৎ হইতে আনীত সমুদ্রজল

খানিকটা করিয়া তাঁহাদিগকে পান করিতে দিলেন। অণহিলপাটক সমুদ্র হইতে বহু দূরে অবস্থিত। রাজা সমুদ্রের লবণাক্ত জল কোথায় পাইলেন? তখন পারিষদেরা বুঝিলেন যে, রাজা স্বয়ং সমুদ্রতীরবর্ত্তী খম্বায়তে গিয়া ঘটনা তদন্ত করিয়া আসিয়াছেন। রাজা বলিলেন, "এটি ধর্ম্মসংক্রান্ত মোকদ্দমা বলিয়া ইহার বিচারভার আপনাদের মধ্যে কাহারও উপর দিয়া আমি নিশ্চিন্ত থাকিতে পারি নাই। ধর্ম্মনির্ব্বিশেষে সমস্ত প্রজার পরিপালনই রাজার কর্ত্তব্য। তাই আমি নিজে খম্বায়ৎ গিয়া খতিব আলীর অভিযোগ তদন্ত করিয়াছি। তদন্তে জানিয়াছি, উহার অভিযোগ সত্য।"

রাজা জয়সিংহের বিচারে খম্বায়তের অমুসলমান সম্প্রদায়সমূহের নেতৃগণ দণ্ডিত হইলেন। নগরবাসী মুসলমানেরা মস্‌জিদ ও মিনার পুনর্নির্ম্মাণের জন্য রাজকোষ হইতে দুই লক্ষ বালুত্রা (রৌপ্যমুদ্রা) প্রাপ্ত হইল। খতিব আলীকে রাজা চারিটি পরিচ্ছদ পুরস্কারস্বরূপ দান করিলেন।

মুহম্মদ সুফী ঘটনাটি বর্ণনা করিয়া স্পষ্টই বলিয়াছেন যে, তিনি এইরূপ ধর্ম্মনিরপেক্ষ বিচারের কাহিনী জীবনে কখনও শোনেন নাই। ইহাতে বুঝা যায়, ধর্ম্মমূলক মোকদ্দমায় বিধর্ম্মীর প্রতি সুবিচার জগতে বড় সুলভ ছিল না। কিন্তু সোলংকীবংশের ইতিহাসে বিধর্ম্মী মুসলমানের প্রতি উদার ব্যবহারের আরও দৃষ্টান্ত দেখিতে পাওয়া যায়।

সুলতান মাহ্‌মুদ কর্ত্তৃক বিধ্বস্ত সোমনাথ মন্দির হইতে অনতিদূরে অবস্থিত বেরাবল নামক গ্রামের একটি মন্দির-গাত্রে একখানি শিলালিপি আছে। লিপিটি ১২৬৪ খ্রীষ্টাব্দে সোলংকী বংশের বাঘেলা শাখার রাজা অর্জ্জুনের (১২৬২-৭৫ খ্রীঃ) রাজত্বকালে উৎকীর্ণ হইয়াছিল। উহা হইতে জানা যায়, পারস্যোপসাগরের উপকূলবর্ত্তী হুর্ম্মুজ বন্দরের অধিবাসী আবু ইব্‌রাহিমের পুত্র নূরুদ্দীন ফিরোজ নামক জনৈক মুসলমান বণিক্ ব্যবসায় উপলক্ষ্যে সোমনাথ নগরে বাস করিতেছিল। ছাডা নামক জনৈক রাজকর্ম্মচারী ঐ বণিক্‌কে নগরের বাহিরে একখণ্ড ভূমি দান অথবা বিক্রয় করেন। বণিক্ ঐ স্থানে ছাডার সহায়তায় একটি মস্‌জিদ্ নির্ম্মাণ করে। মস্‌জিদের রক্ষণাবেক্ষণ এবং আনুষঙ্গিক কার্য্যাদি পরিচালনার জন্য সোমনাথ নগরবাসী আরও কয়েক ব্যক্তি মুসলমান বণিক্‌কে ভূমি দান কিংবা বিক্রয় করিয়াছিল। রাজা অর্জ্জুন এই ভূমি হস্তান্তর এবং মস্‌জিদ নির্ম্মাণকার্য্য অনুমোদন করিয়াছিলেন। তিনি সোমনাথ নগরবাসী মুসলমান প্রজার ধর্ম্মকর্ম্মে সাহায্য করিতে পরাঙ্মুখ হন নাই। মুসলমান কর্ত্তৃক সোমনাথ মন্দির ধ্বংসের পর স্থানীয় মুসলমান প্রজার প্রতি এইরূপ উদার ব্যবহার সোলংকীবংশীয় রাজগণের ধর্ম্মনিরপেক্ষ মনোবৃত্তির পরিচায়ক, তাহাতে সন্দেহ নাই। শিলালিপির বিবরণ হইতে সোমনাথ নগরবাসী হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে সম্প্রীতি ছিল বলিয়া বুঝা যায়।



ভীষণ ফাঁড়া!!



শ্রীসুনির্মল বসু

হৈ-হৈ-হৈ, হৈ রে—
গল্প শোনো ঐ রে।—
রামভজুয়ার বিকট দাড়ি,
লম্বা ছিল বেজায় যে,
নদীর ধারের রাস্তা দিয়ে
আস্তানাতে সে যায় যে।"
বন্-বাদাড়ে আঁধার সে পথ—
নাইকো সাথী-সঙ্গীতো,
চল্‌ছে লাঠি ঠুক্‌ঠুকিয়ে,
ধরেছে মুখে সঙ্গীত ও।





হৈ-হৈ-হৈ, হৈ রে—
গল্প শোনো ঐ রে।—
নদীর ধারে অধীর হাওয়া—
চল্‌ছে ছুটে বন্‌তলে;
হাওয়ায় হাওয়ায় আওয়াজ ওঠে
আঁধার ছাওয়া জঙ্গলে।
সাম্‌লে দাড়ি মুণ্ডু নাড়ি,—
রামভজুয়া গান করে—
'দ্রুম্-তারা-তুম্, দুম্-তারা-দুম্—
গাইছে সে গান প্রাণ ভরে'।

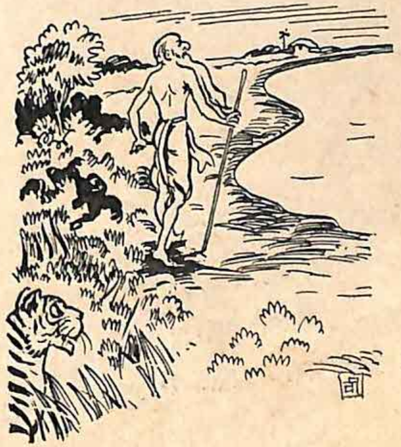
হৈ-হৈ-হৈ, হৈ রে—
গল্প শোনো ঐ রে।—
নিজন-বিজন সন্ধ্যাবেলা
পথ চলে না কেউ মোটে,
ছপ্-ছপা-ছপ্ শব্দ করে'
নদীর জলে ঢেউ ওঠে।
ডাক্‌ছে শিয়াল দূরের বনে,
ভূতুম-পেঁচা ডাক্ ছাড়ে—
ফেউয়ের সাড়া পাচ্ছে যেন
গহন-নদীর বাঁক্ ধারে।



হৈ-হৈ-হৈ, হৈ রে—
গল্প শোনো ঐ রে।—
ধূর্ত বাঘের এই এলাকা,
আর বেশী পথ নাই তো রে—
ঐ তো দূরের গাঁ দেখা যায় ;
পা চালালো তাই জোরে।
টের পেলো বাঘ, যাচ্ছে মানুষ—
এইবারে যাই আস্তে তো,—
পিছন থেকে সারব দফা,
অক্কা পাবে বাস্ সে তো!



হৈ-হৈ-হৈ, হৈ রে—
গল্প শোনো ঐ রে।—
রামভজুয়ার বিরাট দাড়ি
হাওয়ার বেগে নড়্‌ছে রে।
নাকের ফুটোয় ঢুকছে দাড়ি,
নাক সুড়্ সুড়্ করছে রে।
পাচ্ছে হাঁচি, হাঁটছে তবু
হাত দিয়ে তা পাকড়িয়ে,—
মাঝে মাঝে চাঁদের আলো
ঝরছে মেঘের ফাঁক দিয়ে।





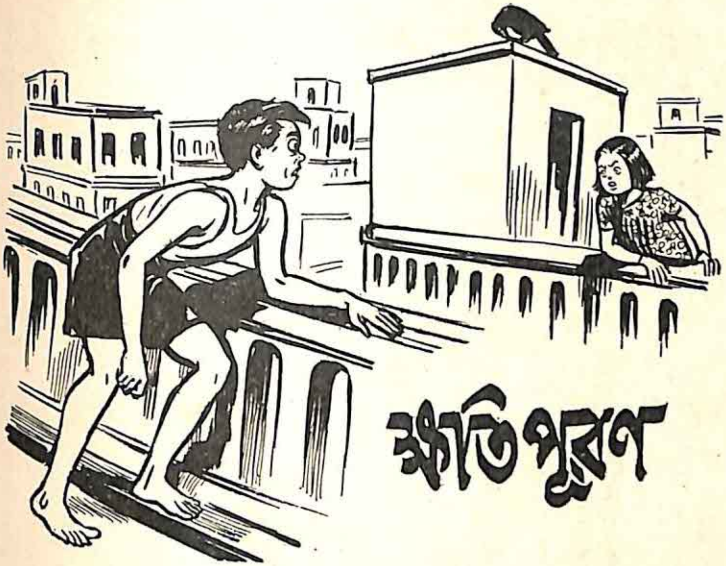
হৈ-হৈ-হৈ, হৈ রে—
গল্প শোনো ঐ রে।—
এই ভেবে বাঘ যেই এসেছে
রামভজুয়ার পাছ টাতে—
এমন সময় ঢুক্‌লো দাড়ি
রামভজুয়ার নাকটাতে।
"হাঁচ্চো" করে' রামভজুয়া
হাঁচ্‌লো হাঁচি জম্‌কালো,
আচম্‌কা সেই আওয়াজ শুনে
ভড়কালো বাঘ চম্‌কালো।

হৈ-হৈ-হৈ, হৈ রে—
গল্প শোনো ঐ রে।—
পাশেই ছিল গভীর নদী—
হঠাৎ হাঁচির শব্দে সে—
নদীর জলে উল্‌টালো বাঘ,
শয়তানি যায় সব ফেঁসে।
রামভজুয়ার কাট্‌লো ফাঁড়া,
হাঁট্‌লো আবার প্রাণ পেয়ে,
সাম্‌লে দাড়ি আবার চলে
'ড্রুম্‌-তানা-তুম' গান গেয়ে।
হৈ-হৈ-হৈ, হৈ রে—
গল্প শোনো ঐ রে।—



আমি ভারতবাসী, ভারতবাসী আমার ভাই; বল—মূর্খ ভারতবাসী, দরিদ্র ভারতবাসী, ব্রাহ্মণ ভারতবাসী, চণ্ডাল ভারতবাসী, আমার ভাই; তুমিও কটিমাত্র বস্ত্রাবৃত হইয়া সদর্পে ডাকিয়া বল—ভারতবাসী আমার ভাই, ভারতবাসী আমার প্রাণ, ভারতের দেবদেবী আমার ঈশ্বর, ভারতের সমাজ আমার শিশুশয্যা, আমার যৌবনের উপবন, আমার বার্ধক্যের বারাণসী;

—**স্বামী বিবেকানন্দ**



ক্ষতিপূরণ

খগেন্দ্রনাথ মিত্র

পঞ্চু ছাদে বসে রোদে পিঠ দিয়ে বই পড়ছিল। ডিটেকটিভ গল্পের বই। নিচে বসে পড়্‌লে দাদা দেখ্‌তে পাবে। ডিটেকটিভ বই ও দু' চক্ষে দেখ্‌তে পারে না। ওর সবই যেন কেমনধারা! ওঃ! গল্পটা কি জমেছে। ডাকাত-গুলোকে ধরবার জন্যে গোয়েন্দাসম্রাট অরুণকুমার একা পোড়োবাড়িটার দেয়াল টপ্‌কে বাড়িটার মধ্যে নেমে পড়েছে। এমন সময়ে পকেটে হাত দিয়ে দেখে পিস্তলটা নেই। তার বদলে হাতে ঠেক্‌লো এক টুকরো কাগজ। এ চিঠি না হয়ে যায় না।

এমন সময়ে পিসী ছাদে এল—হাতে পাথরের থালা। তাতে ছড়া তেঁতুল। পিসী থালাখানা রোদে রেখে বললে, "পঞ্চু, নজর রাখিস্‌। কাকে মুখ না দেয়।"

এ বাড়ির মধ্যে পিসী যা একটু বিশ্বাস করে পঞ্চুকে।

পঞ্চু বললে, "হুঁ।"

পিসী নেমে গেল।

পঞ্চু পড়লো মুশ্‌কিলে। একদিকে ডিটেকটিভ গল্প, আর একদিকে পিসীর ছড়া তেঁতুল। গল্পটা শেষ করতে মন করছে ছটফট, আর ছড়া তেঁতুলের জন্যে জিভে জল আসছে। সে গল্প পড়বে, না, তেঁতুলের দিকে চোখ রাখবে?

কিন্তু তার মনে হলো, তেঁতুলগুলো থালায় যেমন ভাবে থাকা উচিত তেমন ভাবে যেন নেই। সে গল্পের বইখানা উল্টে রেখে থালার কাছে উঠে গিয়ে কয়েকটি ছড়ার বোঁটা ধরে থালায় সমান করে রাখলে। তারপরই আবার মনে হলো, কয়েকখানি ছড়ার গায়ে তেল-গুড়-মশলা যেন ঠিকমতো মাখানো হয় নি। তাই সে ছড়াগুলির গায়ে আঙ্গুল বুলিয়ে তেল-মশলা মাখিয়ে দিলে। আঙ্গুলে তেল-গুড় লেগে গেল। সে আঙ্গুলটা জিভ দিয়ে চেটে পরিষ্কার করে আবার বইখানি নিয়ে বস্‌লো।

কোন্ অবধি পড়েছিল? এই যে, "অরুণকুমার পকেটে হাত দিতে হাতে ঠেকলো একটুকরো কাগজ। ডিটেকটিভের পকেটে পিস্তলের বদলে কাগজের টুক্‌রো মানেই, ডাকাতের উড়ো চিঠি। অরুণকুমারের আর এক পকেটে ছিল অন্ধকারে দেখবার জন্যে পোস্তদানার মতো দেখতে এক রকমের সাদা গুঁড়ো বোঝাই একটি হোমিওপ্যাথিক ওষুধের শিশি। ডিটেকটিভ ধুরন্ধর শিশিটা খুলেই একটু সাদা গুঁড়ো আঙুলে নিয়ে প্রথমে জিভে ঠেকিয়ে তারপর কাগজের টুকরোটিতে মাখিয়ে দিতেই তার ওপরকার অক্ষরগুলো দোকানের মাথায় নিওন সাইনের মতো জ্বলে উঠ্‌লো। সেদিকে তাকিয়েই অরুণকুমারের মনে দেখা দিল বিস্ময়ের ওপর বিস্ময়! এ যে পদ্য! পদ্যে লেখা—

শোন্ ওরে পল্টু!
তোর মুখে দেবো বল্টু;
পিঠে দিই কিল,
ছুঁড়ে মারি ঢিল;
পেটে দেবো খোঁচা—"

কিন্তু ওদিকে ছাদের পাঁচীলের মাথায় তখনই একটা দাঁড়কাক এসে বসায় পঞ্চুর পড়ার ব্যাঘাত ঘট্‌লো। সে অমন রহস্যময় গল্পটা উল্টে রেখে ছুট্‌লো কাক তাড়াতে। কিন্তু একে দাঁড়কাক, তার ওপর কলকাতার দাঁড়কাক, তাড়া খেলেও পালায় না। উল্টে মুখের দিকে তাকিয়ে হাসে। পঞ্চু শূন্যে ঘুষি ছুঁড়ে বললে, "হুস্।" কাকটা তাতে কেবল মাথা নিচু করলে, যেন ইঙ্গিতে দেখালে, "তোমার হুস্ আমার মাথার ওপর দিয়ে উড়ে গেল।"

পঞ্চুও তাকে ছাড়্‌লো না। তার কাছে ছুটে গেল। কাকটাও এবার গেল উড়ে। পঞ্চু নিশ্চিন্ত মনে ফিরে এসে আবার গল্পটা চিৎ করে পড়তে লাগলো। এই যে—

"তোর পেটে দেবো খোঁচা—"

আঃ! আবার এসেছে। কিন্তু পঞ্চু উঠতে উঠ্‌তেই কাকটা একেবারে থালার পাশে বসলো। তারপর দুর্ধর্ষ ডাকাতের মতো একখানি ছড়া ঠোঁটে তুলে নিয়েই গেল উড়ে। পঞ্চু তার কিছুই করতে পারলে না। তবুও সে ছুটে গেল পাঁচীলের ধারে দেখতে কাকটা কতদূর গেল। গিয়েই দেখে, কাকটা ফন্টেদের চিলকোঠার মাথায় বসে ছড়াটাকে পায়ে চেপে ধরে ঠুক্‌রে ঠুক্‌রে খাচ্ছে!

রাগে পঞ্চুর গা জ্বালা করতে লাগলো। ঐ ফন্টেটার সঙ্গেই সেদিন ইস্কুল থেকে আসবার পথে এক সিনেমা স্টারকে নিয়ে তর্কাতর্কি, শেষে মারামারিও হয়েছিল। মারামারিতে পঞ্চু—যাক্ সে কথা। সেই থেকে ফন্টের ওপর পঞ্চুর রাগ। সে কাকটাকে মারবার জন্যে ছাদে ঢিল খুঁজতে লাগলো, কিন্তু সেই ডিটেকটিভ গল্পের বইখানা ও খান কয়েক থান ইট ছাড়া আর কিছুই দেখতে পেল না। ও দুটির একটিও ছুঁড়ে মারলে বিপদ। কারণ বইখানা স্থানীয় পাঠাগারের এবং

থান ইটে মানুষ খুন হয়। সে অগত্যা পাঁচীলের ধারে দাঁড়িয়ে কাকটার উদ্দেশ্যে ঘুষি ছুড়ে, 'হুস হাস' করে শূন্যে আস্ফালন কর্‌তে লাগলো। এমন সময়ে ফণ্টেদের ছাদে ঘাগরা শুকোতে দিতে এল ফণ্টের বোন মান্টি।

সে পঞ্চুদের ছাদের দিকে তাকাতেই পঞ্চুর আস্ফালন দেখতে পেল। মনে করলে, পঞ্চু তাকেই কিল দেখাচ্ছে। অমনি সরু বাঁশির মতো গলায় চেঁচিয়ে বললে, "কিল দেখাচ্ছিস্ যে বড়? আমি তোর কি করেছি?"

যা বলা উচিত ছিল তা না বলে পঞ্চু বললে, "বেশ করছি।"

"বেশ করছিস্!" বলে সেও জিভ্ বার করে পঞ্চুকে ভ্যাংচাতে লাগ্‌লো।

পঞ্চু বললে, "খাঁদী! আবার বব্ করে চুল ছাঁটা হয়েছে।"

"বেশ করেছি! তোর কি রে? দাঁড়া মাকে বলে দিচ্ছি।" বল্‌তে বল্‌তে সে তর্ তর্ করে গেল নেমে।

কাকটার নজর এ সবে ছিল না, সে ছড়াখানি গিলে চিলেকোঠার আলসেয় তখন ঠোঁট মুছছিল।

পঞ্চু থালাখানার কাছে এসে দেখে, একখানা ছড়া মাটিতে পড়ে আছে। সে ছড়াগুলো গুণে দেখে সেখানি নিয়ে এগারোখানি। কাকটা উড়ে যাবার সময়ে ছড়াখানি হয়তো তার পাখার ঝাপটায় থালা থেকে নিচে পড়েছে। ধুলোবালি মাখা ছড়াখানা থালায় তুলে রেখে কি হবে? মজলে খাবে তো তারাই। হয় তো তখন বাবা কি দাদার পাতে পড়বে। তারা ধুলোবালি মাখা দেখে খাবে না, ফেলে দেবে। তাতে নষ্ট হবে। খাবার জিনিষ নষ্ট হতে দেওয়া কি উচিত? তার চেয়ে সেই এখন খেয়ে ফেলুক, এই ভেবেই ছড়াখানি চুষে চুষে খেয়ে বীচিগুলো ছাদ টপ্‌কে নিচে ফেলে দিয়ে আঙ্গুল চাট্‌তে চাট্‌তে আবার সে "ডিটেকটিভ সম্রাট অরুণকুমারের বাহাদুরী" নিয়ে পড়লো। আর অমনি দপ্ দপ্ করতে করতে পিসী উঠে এল ছাদে। এসেই থালার দিকে তাকিয়ে বলে উঠলো, "হ্যাঁরে পেঁচো! তুই বুঝি থালায় হাত দিয়েছিলি? এই যে ভূঁয়ে তেলের দাগ।"

পঞ্চু বললে, "আমি কেন হাত দেবো? কাকে খেয়েছে?"

"কাকে খেয়েছে? বল্‌লেই হলো? বারোখানা ছড়ার মধ্যে রয়েছে মোটে দশখানা। আর হু'খানা তুই খেয়েছিস্।"

"যে খেয়েছে সে ঐ যে দেখো তোমার পেছনে—"

পিসী ফিরে দেখে ছাদের পাঁচীলে একটা দাঁড়কাক হাঁ করে এদিক-ওদিক তাকাচ্ছে। পিসী তার দিকে তাকাতেই সে হাঁ আর একটু বড় করলে। ভাবটা যেন এই—"দেখো আমার হাঁ। আমি খাই নি। খেয়েছে ও।"

পিসী বললে, "বেড়ালকে মাছ আগলাতে দিয়ে গেছলুম। ঝকমারি হয়েছে। মনে করতুম, ছোঁড়াটা দেখতে হাঁদা-ভোঁদা ভালমানুষ। এখন দেখ্‌ছি হাড় শয়তান।" বল্‌তে বল্‌তে থালাখানি তুলে নিয়ে পিসী তর্ তর্ করে নিচে নেমে গেল। কাকটাও বোধহয় মনোদুঃখেই গেল উড়ে।

পিসীর কথায় পঞ্চুর অভিমান হলো। সেও "অরুণকুমারের বাহাদুরী"র শেষটা না দেখেই বইখানি বগলে করে নেমে গেল নিচে একেবারে ভৃত্য সীতানাথ যেখানে বসে বাটনা বাটছিল সেখানে। গিয়েই বললে, "সীতানাথ, খানিকটা বাটনা দাও তো।"



সীতানাথের মেজাজ ভাল ছিল না। সে দু আনার কাপড় কাচা রটে আনতে গিয়ে কড়মড়ে বিস্কুট এনে গিন্নীমায়ের কাছে সন্ত বকুনি খেয়েছে। তাই হলুদগুলোকে শিলে ফেলে নোড়া দিয়ে ঠক্ ঠক্ শব্দে ছেঁচছিল। চেঁচিয়ে বললে, "বাটোনা কি করিবে, আঁই ?"

পাশের ঘরে ছিলেন গিন্নীমা। শুনতে পেয়ে বললেন, "কে বাটনা চায় রে ?"

সীতানাথ বললে, "খোকা-বাবু।"

গিন্নীমা বললেন, "বাটনা কি হবে ? এই পঞ্চু—"

পঞ্চু কোন উত্তর দিলে না, সীতানাথের দিকে কট্‌মট্ করে তাকিয়ে সেখান থেকে সরে গেল এবং একটু পরেই মাথায় জবজবে করে সুগন্ধী নারকোল তেল মেখে কলঘরের দিকে চল্‌লো।

ছোটদি সেখান দিয়ে যেতে যেতে তাকে দেখেই খিল্‌খিল্ করে হেসে উঠলো, বললে, "ওমা ! দেখো পঞ্চা কি রকম করে মাথায় তেল মেখেছে—দু রগ আর পিঠ দিয়ে তেল গড়িয়ে পড়ছে।"

পঞ্চু বললে, "বোতলে তেল বলে ছিলই না।"

গিন্নীমা বললেন, "ওর যা খুশী করুক। ওর জালায় আর পারিনে বাপু ! বোতলটাও ভেঙেছে কিনা দেখ্।"

পঞ্চু বললে, "বোতল ভাঙবো কেন? ঐ তো ওদিকে রেখে এসেছি।" বলেই সে কলঘরে গিয়ে নেয়ে এল। তারপর চুল আঁচড়ে গেল মেজকাকীমার ঘরে।

মেজকাকীমা তখন খুকুকে কোলে শুইয়ে তার জন্যে দুধ তৈরি করছিলেন। পঞ্চুকে মেজকাকীমা একটু ভালবাসেন। ছেলেটা তাঁর ফাই-ফরমায়েজ খাটে। সেজন্যে তাকে মাঝে মাঝে দু-চারটে পয়সা ও এটা-ওটা খেতে দেন। গতকাল চকোলেট খাবার জন্যে দিয়েছিলেন চারটি পয়সা।

পঞ্চু তাঁর সামনে উবু হয়ে বসে দুধের বোতলটা হাতে নিয়ে বললে, "মেজোকাকীমা! এ দুধ খেলে গায়ে জোর বাড়ে, মোটা হয়?"

খুকু কাঁদছিল, তাই তিনি অন্যমনস্কভাবে বললেন, "তা হবে।"

"আমার আজকাল কি হয়েছে, জান? গা-হাত-পায়ে জোর পাই না, কেবল ঘুম পায়। ক্লাসের ছেলেরা বলে, রোগা হয়ে যাচ্ছি।"

মেজকাকীমা একটু মুচকে হাসলেন।

পঞ্চু বললে, "একটু দুধ খাবো?" এবং মেজোকাকীমার সম্মতির অপেক্ষায় না থেকে তৎক্ষণাৎ বোতলটা হাতে উপুড় করে সব দুধ ঢেলে মুখে পুরলো। দুধের গুঁড়ো তার মুখে লাগলো মেজেয় পড়লো।

মেজকাকীমা বললে, "অতটা দুধ খেয়ে ফেললি? খুকু খাবে কি?"

"কতটুকু ছিল? এক গালও হলো না। টাকা দাও। আমি মানিকদার দোকান থেকে এখুনি কিনে এনে দিচ্ছি। দেবে টাকা?"

মেজকাকীমা বললেন, "একটু পরে এস।"

"আর আমায় চারটে পয়সা? অ্যাঁ? আমি এক সপ্তাহের মধ্যেও আর চাইবো না।"

কাকীমা আবার মুচ্‌কে হাসলেন; বললেন, "ক' দিনে তোর সপ্তাহ হয়?"

তারপর পঞ্চু গিয়ে বললে, "মা, ভাত দিতে বল।"

অন্য দিন সে পিসীর কাছে চায়।

মা ধমক দিয়ে বললেন, "একটু সবুর কর। আজ রবিবার। এত তাড়া কিসের? রান্না না হলে তোমায় খেতে দেবে কি করে?"

তবুও পঞ্চু শান্ত হলো না। রবিবার হলেও সে তাড়াতাড়ি খেয়ে বেরিয়ে গেল। তারপর সে কখন ফিরে এল, কি করলো কেউ খোঁজ রাখলে না।

ক্রমে দুপুর হলো। সবাইয়ের খাওয়া-দাওয়া চুকলো; হেঁসেল উঠ্‌লো। যে যার পছন্দমতো জায়গাটিতে গিয়ে শুয়ে বিশ্রাম করতে করতে ঘুমিয়ে পড়লো। কলঘরের চালে এক চিলতে রোদ এসে পড়েছিল। তাতে পা চারখানা ছড়িয়ে, চোখ দুটি বুজে দেহ এলিয়ে আরামে শুয়ে ছোটদির বেড়ালটাও বিশ্রাম করতে লাগলো। জেগে রইলো কেবল পঞ্চু আর উচ্ছিষ্ট-লোভী গোটা কয়েক

কাক। কিন্তু সকলে সত্যি ঘুমিয়েছে কিনা পরখ করতে পঞ্চু বার কয়েক হাত তালি দিল। কেউ তাকে ধমকালো না দেখে সে নিশ্চিন্ত হলো।

তারপর দুপুর গড়িয়ে গেল ; কলে জল এল। সীতানাথ উঠে বাসনের কাঁড়ি নিয়ে পড়লো। পিসী উঠে চশমা চোখে দিয়ে কাঁথা সেলাই করতে বসলো। পঞ্চুর বাবা বৈঠকখানায় গেলেন। বাড়িতে চলাফেরা, সাড়াশব্দ শুরু হলো।

সন্ধ্যার কাছাকাছি পিসী গেল উনুনে আগুন দিতে। আর সীতানাথকে গিন্নীমা একটা খবর দিয়ে তাড়াতাড়ি পাঠালেন বৈঠকখানায় কর্তার কাছে।

সীতানাথ ছুট্তে ছুট্তে গিয়ে বললে, "বাবু! শীঘ্র ভিতরে আসুন। খোকাবাবুর পেটে কি হইছেন।"

"অ্যাঁ! বলিস্ কি রে?" বল্তে বল্তে ভদ্রলোক যতটা পারলেন ততটা তাড়াতাড়ি ভেতরে গিয়ে দেখেন পঞ্চু পেটের যন্ত্রণায় ছট্ফট্ করছে। শীতকালেও তার গা দিয়ে ঘাম ঝর্ছে।

তিনি জিগ্যেস করলেন, "কি! কি ব্যাপার?"

বাড়ির কাছে একটি ছেলে দিনকয়েক আগেই কলেরায় মারা গিয়েছিল। তাই তাঁর ভয় হলো—হয়তো বা কলেরা। জিগ্যেস করলেন, "বাইরে কোথায় কি খেয়েছিলে?"

পঞ্চু কাতর স্বরে উত্তর দিলে, "বাইরে কোথাও কিছু খাই নি।"

তার মা বললেন, "খাবে আবার কোথায়? বাড়িতেই তো ছিল। এখুনি একটা ডাক্তার ডাকো।"

"ডাক্তার? কাকে পাঠাই? ছেলেরা—"

ছেলেরা মানে পঞ্চুর দুই দাদা। সেদিন রবিবার। সিনেমায় নতুন ফিল্ম দেখানো হচ্ছে। তার দু-একটা গান এর মধ্যেই কলকাতার ছেলে-মেয়েদের মুখে মুখে ছড়িয়ে গেছে। ভারি ভিড়—বিশেষ করে ছেলেদের—টিকিট পাওয়াই যায় না। তাই তারা বেরিয়েছে দুপুরে। ভদ্রলোকেরও পায়ে বাত। তবুও লাঠি ভর দিয়ে খোঁড়াতে খোঁড়াতে চললেন ডাক্তার ডাকতে। সৌভাগ্য যে তাঁকে বেশি হাঁটতে হলো না। গলির মোড়েই ডাক্তারের দেখা পেলেন। গলায় স্টেথিস্কোপ, হাতে ব্যাগ ডাক্তারবাবু চলেছিলেন ডিস্পেনসারির দিকে। পাড়াতেই থাকেন, পঞ্চুর বাবাকেও চেনেন। তাই ডাকামাত্র সঙ্গে সঙ্গে এসে রোগীর ঘরে ঢুকলেন এবং রোগের লক্ষণ শুনে রোগীর পেটে প্রথমেই মারলেন আঙুলের এক খোঁচা। তারপর স্টেথিস্কোপটা কানে গোঁজবার আগে দু'হাতে বেড়ির মতো ধরে পঞ্চুকে জিগ্যেস্ করলেন, "কি খেয়েছিলে?"

পঞ্চু মুখ বেঁকিয়ে বললে, "কিছু না।"

"আজ কিছুই খাও নি?"

"খেয়েছি।"

"কি ?"

"ভাত, ডাল, মাছ—"

"আর ?"

"আর—ছড়া তেঁতুল—"

"ছড়া তেঁতুল ? ক'খানা ? জিভ দেখি—"

কিন্তু পঞ্চু উত্তর দেবার আগেই পঞ্চুর বাবা বলে উঠলেন, "যত কুখাদ্য তৈরি করেন আমার দিদি। খেলে তিন দিন পেটে—"



ডাক্তারবাবুর কানে তখন স্টেথিসকোপ গোঁজা, তিনি রোগীর বুক পরীক্ষা করছিলেন। কাজেই কথাগুলো শুনতে পেলেন না।

তিনি যখন বইয়ের থলে কাঁধে ঝুলিয়ে হাফপ্যাণ্ট পরে সঙ্গীদের সঙ্গে ধাক্কাধাক্কি করতে করতে ইস্কুলে যেতেন-আসতেন তখন থেকে পিসী তাঁকে দেখে আসছেন। কাজেই সংকোচ বোধ না করে তাঁর সামনে এসে বললেন, "পঞ্চানন কট্টুকুন ছড়া খেয়েছে যে ওর পেট ব্যথা করবে ? যা খেয়েছে তাও তো আমার কড়ে আঙুলের মতো। এই আমি থালাশুদ্ধু এনে দেখাচ্ছি।" বলে পিসী ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন।

পিসীর মুখে 'পেঁচোর' বদলে 'পঞ্চানন' শুনে পঞ্চুর সেই যন্ত্রণাতেও আনন্দ হলো। পিসী তাহলে তাকে ভালবাসে !

ডাক্তার রোগী দেখে, ওষুধ লিখে চলে গেলেন।

ওদিকে পিসীও রান্নাঘর থেকে বেরিয়েই একরকম আর্তনাদ করে উঠলেন : বললেন, "থালায় ছড়া তেঁতুলের বদলে পচা গোবর। উঃ! কি বিটকেল গন্ধ! ছড়াগুলো সব গেল কোথায় ? নিশ্চয়ই পেঁচো খেয়ে এই গোবরের মতো কি রেখে দিয়েছে।

পেঁচোর পেট ব্যথা করবে না তো করবে কার? আর হরচন্দ্র বলে, যত কুখাদ্য সব তৈরি করি আমি।" বলতে বলতে পিসী থালাখানা উঠোনে নামিয়ে দিয়ে কলঘরে ঢুকলো বোধহয় নাইতে।

পঞ্চু তখন পেটের যন্ত্রণায় আরও বেশি করে কাতরাতে লাগলো।

তারপর ওষুধ খেয়ে কিছুটা সুস্থ হলে একটু রাত্রের দিকে পঞ্চুর ছোটদি জিগ্যেস করলে, "ক'খানা ছড়া তেঁতুল খেয়েছিলি রে?"

"এগারোখানা।"

"অ্যাঁ! তবে পাথরের থালায় যা ছিল তা তুই রেখেছিলি?"

"হুঁ!"

"ওগুলো কি?"

"আমার তৈরী ছড়া তেঁতুল। পিসীর একখানা খেয়েছিলুম বলে পিসী আমায় বকেছিল। আমি তাতে অপমানিত বোধ করে পিসীকে একখানার জায়গায় পনেরোখানা ছড়া তৈরী করে দিয়েছিলুম। আর পিসীর বাকি দশখানা খেয়ে ফেলেছিলুম। সেগুলো তো আমার আর কাকের এঁটো ছিল। তোমরাই তো বল, 'গুরুজনদের খাবার জিনিষ এঁটো করতে নেই'?"

"তেঁতুল পেলি কোথায়? কি দিয়ে তৈরী করেছিলি?"

"খুকুর দুধের আর মায়ের তেলের বোতল বেচে পেয়েছিলুম ছ' পয়সা। মেজকাকীমা দিয়েছিল চার পয়সা। তাই দিয়ে বাজার থেকে তেঁতুল কিনে এনে তেল, নুন আর সর্ষে, লঙ্কা, ধনে বাটা দিয়ে গুড় মাখিয়ে তৈরী করেছিলুম।"

দিদি হেসে বললে, "সঙ্গে পাঁচফোড়ন, কালজিরে আর গোলমরিচ দিলিনে কেন?"

"পেলুম না যে!"

"কেমন হয়েছিল?"

"ঐ তো শুনলে, পিসী বললে, গোবর!"

"দেখ গে সেই কাকটাও পিসীর ছড়া তেঁতুল খেয়ে মেডিক্যাল কলেজের ছাদে পড়ে এতক্ষণ ছট্‌ফট্ করছে।"

পিসী পঞ্চুর ছোটদি'কে দেখতে পারে না। তাকে বলে, রণচণ্ডী। কিন্তু ছোটদি'র আসল নাম, রঞ্জাবতী।



শ্রীমণীন্দ্র দত্ত

তবে তোমরা বিশ্বাস করবে কিনা জানি না। মাঝে মাঝে আমারি কেমন সন্দেহ হয়। সেই দুর্যোগের রাতে লোকটা কি সত্যি এসেছিলো ? বাইরে তখন বৃষ্টি পড়ছিলো অবিরল ধারায়। ভিজে কাকের মতো সে এসে ঘরে ঢুকলো। ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া চুল, খোঁচা খোঁচা দাড়ি আর ছেঁড়া সার্ট বেয়ে বৃষ্টির জল পড়ে ভিজে যাচ্ছিলো মেঝে।

বললাম : আরে ভাই, তুমি যে ভিজে একেবারে জল হয়ে গেছ। আগুনের পাশে বসে গা-মাথাটা একটু শুকিয়ে নাও।

কাশতে কাশতে আর হাসতে হাসতে সে বললো : শুকিয়ে নেব ? কি যে বলেন আপনি ? এ জল কি শুকোবার নাকি ? এই দেখুন তাহলে—

বলেই সে যে কাণ্ড করলো—উঃ, ভাবলে আজো আমার সারা শরীর শিউরে ওঠে—

বাধা দিলো নন্তু : ঐ তো তোমার দোষ দাদু, গল্প বলতে আরম্ভ করে লেজা-মুড়ো ঠিক রাখতে পারো না। কে এলো, কোথায় এলো, কি কাণ্ড করলো, সে সব কথার বালাই নেই, সুরুতেই একেবারে লংকাকাণ্ড বাধিয়ে দিলে ?

দাদু ওরফে গোবর্ধন গোলদার বললেন : তা যা বলেছিস্ ভাই, ও দোষটা আমার একটু আছে। আসলে কি জানিস্, ওটা হলো গল্প বলার আর্ট। লেজে-মুড়োয় তালগোল পাকিয়ে না দিতে পারলে গল্পের ঘোড়া ভালো দৌড়ায় না, বুঝলি ?

নন্তু বললো : তা তো বুঝলাম। এখন গল্পটা কি তাই বলো।

গোবর্ধন চোখ গোল গোল করে বললেন : গল্প নয় রে ভাই, একেবারে ঘটনা। আমার নিজের চোখে দেখা। জলে চপ্-চপ্ লিকলিকে হাতখানা সটান একেবারে ঢুকিয়ে দিলো দগ্দগে আগুনের মধ্যে—

এবার বাধা দিলো ভুতুম : আবার দাদু ! বলি, তুমি সোজাসুজি গল্পটা, না ঘটনাটা বলবে, না সারারাত আগড়ম বাগড়মই বকবে ?

গোবর্ধন মৃদু হেসে বললেন : এই তো গল্পের মৌতাত তোমাদের ধরেছে। এখন ঘটনা-

অঘটন সবই তোমাদের গেলানো যাবে। অতএব বিলম্বেন অলম্। এবার গল্প সুরু। তবে তার আগে আমি নিজে একটু মৌতাত করে নি।

বাইরে তখনো ঝমঝম করে বৃষ্টি পড়ছে। দরজা-জানালা বন্ধ করা ঘরে অল্প পাওয়ারের আলোটা টিম টিম করে জ্বলছে। কতকগুলো লম্বা লম্বা ছায়া পড়েছে আধ-ময়লা তক্তপোষে ও চুন-ওঠা দেয়ালে।

কোমর থেকে ঝিনুকের খোলের নস্যিদানটি বের করে আচ্ছা করে একটিপ নস্যি নিলেন গোবর্ধন। সশব্দে নাকটাকে ঝাড়লেন বার দুই। তারপর সুরু করলেন কথামৃত।

* * *

অনেক কাল আগেকার কথা। দেশোদ্ধারের পালে তখন আগুনে মেঘের হাওয়া লেগেছে। দেশের আনাচে-কানাচে গড়ে উঠেছে গুপ্ত সমিতি। এখানে ওখানে বোমা-পিস্তলের ঘায়ে মারা পড়ছে দেশি-বিলিতি রাজ-কর্মচারী।

আমার তখন উঠতি বয়স। রক্ত গরম। ভিড়ে গেলাম ওমনি এক সমিতিতে। ছোটখাটো কাজের তালিম দিতে দিতে একেবারে পোক্ত হয়ে উঠলাম। একদিন তো বোমা ছুঁড়ে একটা লাল মুখকে দিলাম সাবাড় করে। চারদিকে হৈ-হৈ পড়ে গেলো। সি. আই. ডি. টিকটিকির শোভাযাত্রা লেগে গেলো আমার পিছনে। অগত্যা গা ঢাকা দিলাম।

কখনো নির্জন জংগলে, কখনো ভাঙা মন্দিরের গর্তে, কখনো পরিত্যক্ত বাড়ির শেওলা-পড়া চিলে কোঠায় দিন কাটাই। রাতের অন্ধকারে পাড়ি দেই এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায়। এমনি সময়ে একদিন—

হঠাৎ থেমে গেলেন গোবর্ধন। গল্প-খোর কয়েকটি কিশোরের বিস্ফারিত চোখের দিকে একবার চোখ বুলালেন। তারপর আবার বলতে লাগলেন ঃ সন্ধ্যে হতেই সেদিন মুষলধারে বৃষ্টি সুরু হলো। কিন্তু উপায় নেই। পার্টির নির্দেশে সেই দুর্যোগের মধ্যেই পথে নামলাম নতুন আস্তানার সন্ধানে।

তিন চার ঘন্টা একটানা পথ চললাম। মাথার উপর নিশ্ছিদ্র মেঘলা আকাশ। বৃষ্টির ফোঁটা পড়ছে তীক্ষ্ণমুখ তীরের মতো। শরীর অবসন্ন। আর চলতে পারি না। একটা আশ্রয় চাই।

কিন্তু কোথায় আশ্রয়? জনমানবহীন নির্জন মাঠ। মাঝে মাঝে কতকগুলো করে গাছের জটলা। আশ্রয়ের কোন চিহ্ন কোথাও নেই।

আকাশে বিদ্যুৎ চমকালো একটা। চকিতে চোখ ফেরালাম ডাইনে। আশায় ভরে উঠলো বুক। ঝুপসি জংলাটার মাথার উপর দিয়ে দেখা যাচ্ছে একটা পুরানো বাড়ির ইসারা। সেইদিকে পা চালিয়ে দিলাম।

একটু এগিয়েই একটা মস্ত পুকুর। পাড় ভেঙে গেছে। আগাছা ও জংলায় ভরে গেছে পাড় ও পুকুর। একপাশে বাঁধানো মস্তবড় সিঁড়ি ভেঙে এবড়ো থেবড়ো হয়ে পড়ে আছে।

অতি সন্তর্পণে পকেটের টর্চটাকে ফেলে ফেলে এগিয়ে চললাম। সামনে লোহার একটা জীর্ণ ফটক একপাশে হেলে পড়ে আছে। সেটাকে পাশ কাটিয়ে ভাঙা-ভাঙা সিঁড়ি বেয়ে বাড়ির দাওয়ায় উঠলাম। কোন ঘরেরই দরজার বালাই ছিলো না। এ-ঘর ও-ঘর করতে করতে দোতলায় উঠবার সিঁড়ি পেলাম। টর্চ ফেলে উঠে গেলাম দোতলায়। আশ্চর্য! সামনের ঘরখানাই বেশ একটু পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন। একপাশে একটা ভাঙা তক্তপোষ পড়ে আছে। এককোণে খানকতক ইট ছড়ানো। তার পাশেই কিছু শুকনো কাঠ। দেখলেই বোঝা যায়, কোন চোর কি ডাকাতের দল মাঝে মাঝে এখানে আড্ডা গাড়ে। কিন্তু আমার তাতে ঘাবড়াবার কোন কারণ ছিলো না। সেই দুর্যোগে কোন চোর-ডাকাতই সেখানে এতো রাতে হানা দেবে না এ কথা নিশ্চিত। তক্তপোষটাকে একটু ঝেড়ে তার উপরেই বসে পড়লাম।

কিন্তু বৃষ্টিতে এতোক্ষণ এমন ভিজেছি যে একটু আরাম পেতেই শরীরের ভিতরটা যেন শির শির করতে লাগলো। হাড়ের ভিতর থেকে একটা কাঁপুনি যেন বেরিয়ে আসছে। শেষটায় অসুখ-বিসুখ করবে না তো?

পকেটের টিনের কৌটোর ভিতর থেকে দেশলাইটা বের করে কাঠগুলো জড় করে তাড়াতাড়ি আগুন ধরালাম। গনগনে আগুনের তাপে শরীরটা যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচলো। আমিও।

ভিজে সার্টটা খুলে ছড়িয়ে দিলাম। তক্তপোষটাকে আগুনের পাশে টেনে একে চিৎ হয়ে পড়লাম। তারপর দুচোখ বুঁজে আসতে বেশি সময় লাগলো না।

কিসের শব্দে হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেলো। চমকে উঠে বসলাম। ঠিকই সিঁড়ি বেয়ে কে যেন উঠে আসছে। পুলিশ নয় তো? ঘরটার চারদিকে ভাল করে তাকালাম। একটি মাত্র দরজা সিঁড়ির দিকেই। সে দিক দিয়ে পালানো অসম্ভব। দুদিকে দুটি জানালা। গরাদে নেই। কিন্তু দোতলা থেকে লাফিয়ে পালানো কি সম্ভব?

পায়ের শব্দ আরো নিকটে। তাড়াতাড়ি উঠে ঘরের এক পাশে জানালার নিচে যেয়ে উপুড় হয়ে বসলাম। জায়গাটা একটু আবছা অন্ধকারে ঢাকা। যে-ই ঘরে ঢুকুক, তার প্রথম দৃষ্টিটা অন্তত এড়াতে পারব।

লোকটি ঘরে ঢুকলো। এদিক্ ওদিক্ না চেয়ে নির্বিকার ভাবে সোজা এগিয়ে গেলো আগুনের কাছে। ভিজে হাত দুখানি বাড়িয়ে দিলো আগুনের উপর। দু'এক ফোঁটা জল ঝরে পড়লো আগুনের ভিতরে।

ভালো করে দেখলাম লোকটিকে। ভয়ের কিছু নেই। বোধ হয় আমার স্বগোত্রই হবে। অর্থাৎ নিশ্চয় কোন ভবঘুরে। আশ্রয় খুঁজতে খুঁজতে এখানে এসে জুটেছে। লোকটার পা খালি। ছেঁড়া জামা-কাপড়। মাথায় খাড়া খাড়া চুল। তার মধ্যে বৃষ্টির ফোঁটাগুলি আগুনের আভায় ঝিল্‌মিল্ করছে।

কাছে যেয়ে বললাম কি ভাই, তোমারও যে আমার দশাই দেখছি ? ভিজে যে একেবারে জল হয়ে গেছ ?

লোকটি বললো : তা যা বলেছেন। যা জোর বৃষ্টি আজ, গা-মাথা আর বাঁচাবার জো নেই। তবে কি জানেন, এতে আমার কোন অসুবিধাই হয় না। আমার তো সারা গাটাই জলে ভর্তি। দেখবেন ? এই দেখুন—

বলেই লোকটি গাটা ঝাড়া দিলো। অমনি কী আশ্চর্য—সারাটা শরীর থেকে ঝর্ ঝর্ করে জল ঝরে মেঝেটাকে ভিজিয়ে দিলো। উঃ, লোকটা এতোক্ষণ বৃষ্টিতে কী ভেজাটাই না ভিজেছে !

দুজনে আলাপ বেশ জমে উঠলো। এক সময় আমি শুধালাম, দরজা-জানালা না থাকলেও ঘরগুলোর অবস্থা তেমন খারাপ নয়। অথচ দেখো, এখানে লোকজন কখনো কেউ থাকে বলে তো মনে হয় না। এ যা জিনিষপত্র রয়েছে, তাতে বড় জোর কোন চোর-ডাকাতের রাতের আড্ডাখানা হতে পারে। কি বলো ?

সাদা সাদা মুখখানি তুলে লোকটি দেঁতো হাসি হেসে বললো : তা যা বলেছেন। তবে কি জানেন, লোকজন এখানে আসতে ভয় পায়।

আমি প্রশ্ন করলাম : ভয় পায় কেন ?

লোকটি খিল্ খিল্ করে হেসে বললো : বারে, ভয় পাবে না ? এটা যে ভুতুড়ে বাড়ি।

তোমাদের কি বলব দাদু, সাহসী বলে আমার একটা অহংকার ছিলো। কিন্তু সেই দুর্যোগের রাতে সেই পরিত্যক্ত ভাঙা বাড়িতে ভিজে-শপ্-শপ্ লিকলিকে-হাত একটি মানুষের খিল খিল হাসিভরা মুখে ওই ভুতুড়ে বাড়ি কথাটা শুনে আমার বুকের ভিতরটাও কেমন যেন কেঁপে উঠলো। ভয়ে-কাঁপা গলায় বললাম, ভুতুড়ে বাড়ি ? বলো কি ?

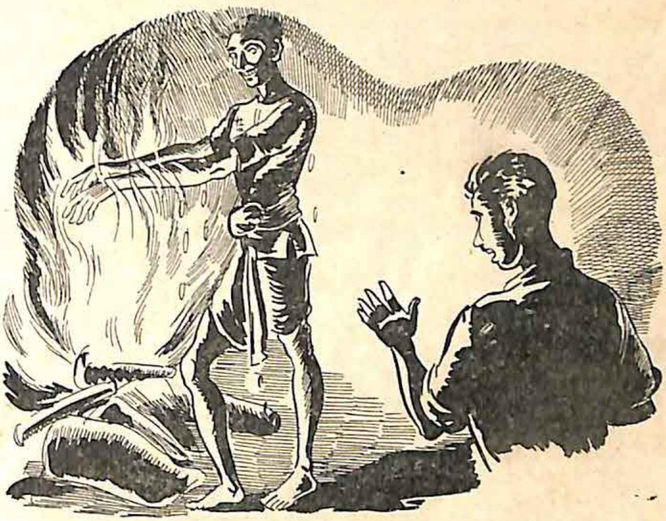
তবে আর বলছি কি। শুনুন তাহলে সবটা কথা। এক সময়ে এই বাড়ির মালিক ছিলো এক ক্ষুদে জমিদার। জমিদারী ছোট, কিন্তু তার প্রতাপ ছিলো দোর্দণ্ড। তার প্রতাপে নাকি বাঘে-গরুতে এক ঘাটে জল খেত। সত্যি বাঘে-গরুতে এক ঘাটে কোন দিন জল খেয়েছে কিনা বলতে পারি না, কিন্তু একটা মানুষ একদিন রাতে সত্যই আকণ্ঠ জল খেয়েছিল তার প্রতাপে। তার কথাই তো আপনাকে বলতে চাই। লোকটা ছিলো গরীব। এই জমিদারেরই প্রজা। খাজানার দায়ে জমিদারের লোক গিয়েছিলো তার সামান্য সঞ্চয় খোরাকীর ধানগুলি ছিনিয়ে আনতে। মরিয়া হয়ে সে বাধা দিলো জমিদারের লোককে। ফলে তারা ওকে বেঁধে নিয়ে এলো জমিদারের এই বাড়িতে। জমিদার তো সব শুনে রেগে একেবারে আগুন। হাঁক দিয়ে বললেন : লাগাও ব্যাটাকে শ্যামচাঁদ। এখন মনে করুন, শ্যামচাঁদ হলো গরুর কাঁচা চামড়ায় তৈরী মস্ত এক জুতো। গুনে গুনে সেই শ্যামচাঁদ পড়তে লাগলো লোকটির পিঠে, কপালে, মাথায়। ফলে এক সময় সে

অজ্ঞান হয়ে পড়লো। জমিদার হুকুম দিলেন, গলায় ইটের বস্তা বেঁধে ওকে ডুবিয়ে দে রাম-সায়রের জলে। তাই হলো। শ্যামচাঁদের পরেও লোকটির ধড়ে যেটুকু প্রাণ অবশিষ্ট ছিলো রাম-সায়রের জল আকণ্ঠ পান করে সেটুকুও নিঃশেষ হয়ে গেলো।

বলেই লোকটি দুই হাত তুলে বড় একটা হাই তুলে গায়ের আড়মোড়া ভাঙলো। অমনি কী আশ্চর্য—ওর সারা শরীর থেকে ঝর ঝর করে বৃষ্টির ফোঁটার মতো জল পড়তে লাগলো। কয়েক ফোঁটা আগুনের ভিতর পড়ে ছ্যাঁৎ ছ্যাঁৎ করে উঠলো।

আমি বললাম ঃ উঃ, তুমি যে ভিজে একেবারে জল হয়ে গেছ ভাই। নাও, আগুনের পাশে আর একটু সরে বসে গা-মাথাটা একটু শুকিয়ে নাও।

একটা অদ্ভুত হাসি হেসে সে বলে উঠলে ঃ শুকিয়ে নেব? কি যে বলেন আপনি? রাম-সায়রের এ জল কি শুকোবার না কি? এই দেখুন তাহলে—



বলেই লোকটি হাসতে হাসতে তার লিকলিকে ভিজে শপ-শপ হাতখানি কনুই পর্যন্ত সেই দগদগে আগুনের মধ্যে নির্বিকার ভাবে চালিয়ে দিলো। ওর চোখ দুটিতেও তখন আগুন জ্বলছে!

গোবর্ধন গোলদার চুপ করলেন। ছেলেরা শুধালো ঃ তারপর দাদু?

ঃ এর পরে কি আর তারপর আছে রে দাদু? একলাফে তক্তপোষ থেকে নেমে ভাঙা সিঁড়ি বেয়ে দে-ছুট—দে-ছুট—রাম-শায়রের ভাঙা রানা পেরিয়ে একেবারে নিশ্ছিদ্র অন্ধকারে ঢাকা মাঠের মধ্যে এসে তবে হাঁফ ছেড়ে বাঁচি। কিন্তু আর নয়। বৃষ্টি থেমে গেছে। আমি এবার উঠি।

ছেঁড়া তালতলার চটিতে পা ঢুকিয়ে ফটর ফটর করতে করতে গোবর্ধন গোলদার বেরিয়ে গেলেন! একদল গল্প-খোর কিশোর হাঁ করে তার গমন-পথের দিকে চেয়ে রইলো।



অসমঞ্জ মুখোপাধ্যায়

হঠাৎ মতিলালের মনে মোটা হবার সাধ জেগে উঠলো। তার চেহারাটা ছিল—একটু পাত্‌লা, একটু ছিপ্‌-ছিপে, একটু লম্বা ধরণের। মোটা সে কখনই ছিল না; তবে—রোগা হলেও তার রোগ ছিল না। কিন্তু হঠাৎ তার সাধ হোল, সে সুশীল, পঞ্চু, নীলমণির মত মোটা হবে। ভাবতে লাগলো—দিনরাতই ভাবতে লাগলো—কিসে মোটা হওয়া যায়। একে-তাকে—যারা একটু জানে-শোনে—তাদের জিজ্ঞাসা করতে লাগলো, কি করলে, কি খেলে মোটা হওয়া যায়।

পাড়ার বিধু ঠাকুদ্দার অনেক বিষয়ে জ্ঞান, অনেক অভিজ্ঞতা, অনেক-কিছু তিনি জানেন-শোনেন। একদিন মতিলাল তাঁকে জিজ্ঞাসা করলো—"কিসে মোটা হওয়া যায়, ঠাকুদ্দা ?"

ঠাকুদ্দা বল্লেন—"মোটা ? ভাতেতে দেহ মোটা করে। পেট ভ'রে রোজ ভাত খেয়ে অনেকে মোটা হোয়েচে। মিষ্টিতেও মোটা করে। দিনে খুব ঘুমুলেও মোটা হওয়া যায়।"

সেইদিন থেকে, এই তিনটে জিনিস, মতিলাল অতি মনোযোগের সঙ্গে করতে সুরু করে দিলে। দু'টি বেলা সে পেট ঠেসে ভাত খেতে লাগলো ; মাকে লুকিয়ে কলসীর গুড় সাবাড় করতে লাগলো ; আর দুপুর থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত, কুম্ভকর্ণের ঘুম ঘুমুতে লাগলো।

দিন-পনেরো এইভাবে চল্‌বার ফলে, তার শরীর গেল বিগ্‌ড়ে। আরো সে রোগা হ'য়ে গেল। ঠেসে একপেট ভাত খাওয়া এবং তারপর সারাদিন ধরে ঘুমোবার ফলে, তার পেট ভার হোয়ে থাকে, যা খায় তা হজম হয় না, সুতরাং ক্ষিধেও হয় না। তারপর সেই অক্ষুধার ওপর আবার রাত্রে একপেট ভাত। এর যা ফল ফলতে লাগলো, তা সহজেই বুঝতে পারা যায়। তবে একটা বিষয়ে সে বেশ-কিছু লাভ করে ফেললে। অতিরিক্ত গুড় খাবার ফলে সে একপেট ক্রিমির অধিকারী হোল।

সুতরাং বিধু ঠাকুদ্দার ব্যবস্থাপত্র মতিলালকে দুঃখের সহিত বাতিল করতে হোল।

অতঃপর মতিলাল, যোগেন ডাক্তারের কম্পাউণ্ডার কার্তিক ঘোষালের শরণাপন্ন হোল। ঘোষাল মতিলালের অভিপ্রায় শুনে বল্‌ল—"মোটা হবে কি কোরে! ভিটামিন 'বি' যে মোটেই তোমার······শোন, এক কাজ কর; তোমার যে খাদ্য আবশ্যক, সেটা তোমার দেহ মোটেই পাচ্চে না, তোমার দরকার হচ্চে উপযুক্ত খাদ্য। প্রোটিন্‌······প্রোটিন্‌! এক কাজ কর। পেনিসিলিন্‌······না থাক্‌; ······শোন, ভাত খাওয়াটা একেবারেই কমিয়ে দাও; বুঝলে? আর খেতে হবে তোমায়—মাছ-মাংস-ছানা-ডিম। এ-সব না খেলে দিন দিন তুমি আরও রোগা হয়ে যাবে। বুঝলে? আর বিকেলের দিকে রোজই কিছু ফল খেতে হবে তোমায়,—এই ধর—আঙুর, আপেল, নাস্‌পাতি, কমলালেবু······



"ও-সব ত বড্ড দামী ফল, আচ্ছা, কলা চলবে না?"

"কলা? তা চলতে পারে, তবে কাঁচা কলা নয়···পাকা, বুঝলে? পক্ক···পক্ক··· পক্ক রম্ভা।"

মতিলাল সেইদিন থেকেই কার্তিক ঘোষালের কথামত মাছ-মাংস ডিমের শ্রাদ্ধ করতে লাগলো; আর বিকেলে চলতে লাগলো— কলা। এবার আশা তার মনে বাসা বাঁধলো যে, মাছ-মাংস-ডিম-কলা এবার আর তাকে 'কলা দেখাতে' পারবে না; এবার সে নিশ্চয়ই মোটা হোয়ে যাবে।

কিন্তু সেই প্রচণ্ড গরমের দিনে, ডিম-মাংস ইত্যাদি পেটের মধ্যে নিত্য নিত্য রপ্তানী করায়, মতিলালের পেট বিদ্রোহী হোয়ে রুখে দাঁড়ালো। দিনে পাঁচবার সাতবার সে পায়খানা যেতে আরম্ভ করলো; তারপর দাঁড়ালো—আমাশা।

সুতরাং বিধু ঠাকুদ্দার মত ঘোষাল কম্পাউণ্ডারকেও ঠেলে রাখতে হোল।

দিন-কতক পরে, একটু সুস্থ হোয়ে, মতিলাল স্কুলের থার্ড মাষ্টার সুরেশবাবুকে একদিন ধরে

বসলো। সুরেশবাবু বহুবিষয়ে অভিজ্ঞ, অনেক-কিছু জানেন। চেহারাটাও তাঁর মোটা-শোটা নাদুশ-নুদুশ। সন্ধ্যার পর পাশের বাড়ীতেই 'টিউশনি' করতে আসেন। মতিলালকে তিনি বলেন— "শুধু কতকগুলো খেলেই ত আর হয় না; সেগুলো হজম করা চাই; নইলে উল্‌টে অসুখ ত করবেই। 'একসারসাইজ'……খাটা-খাটুনি……ব্যায়াম! তারপর পুষ্টিকর খাদ্য খাওয়া; বুঝলে হে মতিলাল?"

"তা হোলে, কি করবো, বলে দিন।"

"এক কাজ কর। সব-চেয়ে ভাল একসারসাইজ হচ্চে…'রাইডিং', 'রোয়িং', 'সুইমিং'—সাঁতার-কাটা। তুমি যদি রোজ খানিকক্ষণ করে সাঁতার……

"সাঁতার ত আমি জানি না, মাষ্টারমশাই। তা ছাড়া, এখানে পুকুরই বা পাব কোথায় যে সাঁতার কাটবো।"

একটু চিন্তা কোরে সুরেশমাষ্টার বল্‌লেন—"পুকুরের দরকার হয় না, ডাঙ্গাতেও সাঁতার কাটা যায়। তিনহাত জায়গায় দৌড়ানো যায়, জান কি তার 'প্রসেস্?'—এ-ও সেইরকম।"

বিস্মিত হোয়ে মতিলাল জিজ্ঞাসা করলো—"ডাঙ্গাতেও সাঁতার কাটা যায়! সে কি-রকম, মাষ্টার-মশাই?"

"জলের ওপর যেমনভাবে হাত-পা ছুঁড়তে হয়, তেমনি মেজের ওপর মাদুর পেতে, চিৎ হোয়ে শুয়ে, ঐভাবে হাত-পা ছুঁড়লেই হোল। তাতে ঠিক সাঁতারেরই কাজ হবে। দিন পনের এইভাবে কোরে দেখ দেখি। আর তার সঙ্গে খেতে হবে তোমায় দুধ আর ঘি, সকালে কিছু ভিজানো ছোলা। আর পার ত, কিছু বাদামের সরবৎ—ব্যস্।

"ভাত-তরকারী?"

"সে ত খাবেই, যেমন খাও; তবে পেটপুরে নয়। দুধ আর ঘিয়ের ওপরই বেশী জোর দেবে। জান ত—একটা 'কথা' আছে:—

দুধে কান্তি, ঘিয়ে বল,
শাক-ভাতেতে বাড়ায় মল।"

শাস্ত্র-বচনের ওপর আর কথাই চলে না। সুতরাং পরের দিন থেকেই মতিলাল থার্ড মাষ্টার প্রদত্ত ত্র্যহস্পর্শযোগ সুরু করে দিলে,—অর্থাৎ নামে-মাত্র ভাত-তরকারি, ডাঙ্গা-সাঁতার আর দুধ-ঘি-ছোলা।

দালানের প্রান্তে, তক্তার 'পার্টিশ্যন' দেওয়া ছোট্ট একখানা ঘরের মত ছিল। সেইটাতেই মতিলাল শয়ন করত, বস্‌ত—দাঁড়াতো; অর্থাৎ সেখানে মতিলালেরই 'কম্‌বাইণ্ড' বৈঠকখানা, রিডিংরুম, বেড্‌রুম ও ব্যায়ামাগার।

রোজ বেলা তিনটে-চারটের সময়, মতিলাল তার সেই ঘরের দরজায় খিল লাগিয়ে, মেজের

ওপর কখনো উপুড়, কখনো কাত্ ও কখনো চিৎ হয়ে শুয়ে সাঁতার—অর্থাৎ ডাঙ্গা-সাঁতার কাটে, অর্থাৎ হাত-পা ছোঁড়ে। সুরেশ মাষ্টার বলে দিয়েছিলেন, মিনিট পনের সাঁতার কাটতে। পাঁচ মিনিট কেটে, দু' একমিনিট চুপ কোরে ভেসে থাকবে, অর্থাৎ বিশ্রাম ; তারপর আবার পাঁচ মিনিট ; আবার দু' একমিনিট ভেসে থাকা ; তারপর আবার একবার ঐ রকম। আর দুধ রোজ অন্ততঃ আধসের, আর ঘি আধছটাক।

একটা হপ্তা কেটে গেল। মতিলাল দিনের মধ্যে পঞ্চাশ বার আয়নার সামনে এসে দাঁড়ায় আর দেখে কি পরিমাণ ফল ফলচে। একদিন অন্তর 'রাণী-সিনেমা হল্'-এর ওজন-যন্ত্রে একটা কোরে 'আনি' ফেলে দিয়ে ওজন দেখে আসে। কিন্তু উৎসাহ-আনন্দের একরত্তি আলোও তার চোখে পড়ে না, বরং...........

সুরেশ মাষ্টার বলেন—"কোরে যাও···কোরে যাও ; ১৫ দিন যাবে জমি তৈরী হোতে, ১৫ দিন যাবে গাছ বেরুতে, তারপর মাস-খানেক পরে ফল দেখা দেবে। বুঝলে হে মতিলাল! তাড়া-হুড়োতে হবে না, হতাশ হোলে চলবে না। যেমন চালাচ্ছ, চালিয়ে যাও।"

ষ্টোভের আঁচ কমে এলে, দুচারটে 'পাম্প' দেবার ফলে যেমন তাতে আঁচের জোর বাড়ে, সুরেশ মাষ্টারের কথায় মতিলালের মনেও সেই রকম আশা-উৎসাহের ঢিমে আঁচে নতুন কোরে জোর লাগে।

সেদিন রবিবার।

বেলা আন্দাজ তিনটে-সাড়েতিনটে।

মতির বাবার আফিস ছিল না। অনেক বেলায় স্নানাহার কোরে একটু তিনি ঘুমাচ্ছিলেন। মতির মা ব্যস্তভাবে ঘরে ঢুকে তাঁকে ঠেলে তুললো—"শীগ্গির এসো ; মতির-আমার কি হোয়েচে, দেখ এসে।"

ধড়্-মড়্ কোরে বিছানার ওপর উঠে বোসে—মতির বাবা বল্লেন—"কি হোয়েচে ?"

কাঁদ-কাঁদ মুখে, কাতর হোয়ে মতির মা বল্লেন—"কেমন কোরে জানবো গো, কি হোয়েচে ; তুমি শীগ গির এস একবার।"

ত্রস্তপদে ও আতঙ্কপূর্ণ মনে মতির বাবা, মতির সেই তক্তা-ঘেরা ঘরের দিকে অগ্রসর হলেন ও তক্তার ফাঁক দিয়ে দেখতে লাগলেন। মতির মা কাতরকণ্ঠে বলতে লাগলেন,—"ওগো দেখ, ছেলের-আমার কি হোল! অমন কোরে শুয়ে ও হাত-পা ছুঁড়চে কেন ?"

"তাই ত! মৃগীরোগ হোল না কি!" ভয়ে ও উৎকণ্ঠায় তাঁর মুখ শুকিয়ে গেল।—"মতি! মতি! মতিলাল!"

ধড়্-মড় কোরে মতিলাল উঠে বোসে—বল্‌ল—"কি বলচ ?"

"ও-রকম কোরে হাত-পা ছুঁড়ছিলি কেন রে ? শীগ্গির দরজা খোল্।"

মতিলাল উঠে খিল খুলে দিয়ে, চুপ কোরে ঘরের একধারে দাঁড়িয়ে রইলো।

"ও রকম করছিলি কেন? কি হোয়েছিলো তোর?"

"কিছু হয় নি; সাঁতার কাটছিলুম।" মুখ নীচু কোরে মতিলাল মেঝের দিকে চেয়ে রইলো।

"সাঁতার! সাঁতার কাট্‌ছিলি? ডাঙ্গায়?"

মতির মা উদ্বেগপূর্ণ স্বরে বলে উঠলো—"ওগো, ছেলের আমার মাথা খারাপ হোয়ে গেল বোধ হয়! ও বাবা মতি! মতিলাল!"

"হ্যাঁরে, ডাঙ্গায় সাঁতার কাট্‌ছিলি? মতি!"

তেমনি মুখ নীচু কোরে মতিলাল বললে—"হ্যাঁ; থার্ড মাষ্টার সুরেশবাবু বলে দিয়েচেন।"

"কেন?"

"শরীর মোটা হবে বলে।"

ব্যাপার দেখে ও শুনে মতির বাবা তাঁর সম্বিৎ হারিয়ে ফেলেছিলেন। সেই অবস্থাতেই, হতভম্বের মত তিনি ধীরে ধীরে চলে গেলেন। মতির মা মতির দিকে চেয়ে বল্লেন—"হ্যাঁ বাবা, এখন শরীরটা ঠিক হোয়েচে ত?"

অতঃপর মতির মুখ থেকে তার বাবা ও মা ব্যাপারটা আনুপূর্বিক সব শুন্‌লেন।

* * * *

তার পরের দিন।

মামার বাড়ী থেকে মতিলালের দিদিমা এসেচেন।

সন্ধ্যার পর মতিকে ডেকে তিনি বল্লেন—"হ্যাঁরে ভাই, মোটা হোতে তোর ইচ্ছে হোয়েচে, কিন্তু মোটা হওয়া কি ভাল? তা ছাড়া, যার যেমন 'আড়া', সে সেই রকমই হবে। জোর করে কি মোটা হওয়া যায় কখনো?"

"যায় না?"

"না।"—আর মোটা হওয়া ত ভালও নয়, ভাই।"

"ভাল নয়?"

"মোটেই না। দেহ নীরোগ আর শক্তিশালী থাকবে, এইটাই দরকার। তা ছাড়া, তোর মা হোল এক-হারা, বাপ হোল এক-হারা, তুই তাদের সন্তান, তুই তাদের মতই হবি, মোটা ত হতে পারিস না। তবে, লক্ষ্য রাখবি, যত্ন নিবি—যা'তে শরীর ভাল থাকে, দেহ নীরোগ হয়।"

"কি করলে তা হয় দিদিমা?"

"গেরস্তর ছেলে, যেমন ডাল-ভাত হয়, রুচির সঙ্গে তাই খাবি। ভোরে উঠ্‌বি, খুব-খানিকটা

হন্-হন্ কোরে বেড়িয়ে আসবি, ভাল কোরে তেল মেখে রোজই 'চান্' করবি, দু'বেলা ভাল কোরে দাঁত মাজবি।"

"আর ?"

"আর—মিথ্যা কথা বলবি না, কারো কোন জিনিস না-বোলে নিবি না, অন্ধ-আতুর, কাণা-খোঁড়াকে দয়া করবি, আর রোজ ঘুম থেকে উঠে একবার, আর রাত্রে ঘুমোবার আগে একবার—ভগবান্‌কে স্মরণ করবি।" অতঃপর দিদিমা মতিলালকে স্বাস্থ্যরক্ষা-সম্বন্ধে মোটামুটি কতকগুলো উপদেশ দিলেন।

দিদিমার সব কথা শুনে, মতিলালের মোটা হওয়ার পাগ্‌লামী সেইদিন থেকে ছুটে গেল।

কয়েকদিন পরে, বিধু ঠাকুদ্দার সঙ্গে মতিলালের দেখা হোল, তিনি জিগ্যেস করলেন—"পেট ভোরে ভাত, মিষ্টি আর ঘুম লাগাচ্চ ত ?"

"না ঠাকুদ্দা, মোটা হোতে আর চাই না।"

"কি চাও তবে ?"

"সুস্থ আর সবল থাকতে।"

এর দু'একদিন পরে দেখা হোল কার্ত্তিক ঘোষালের সঙ্গে।

"কি রকম হে ? মাছ-মাংস, ডিম-ছানা-ফল সব ঠিক ঠিক রোজ চালিয়ে যাচ্ছ ত ?"

"না ; মোটা হবার সাধ আর নেই।"

"তবে ?"

"নীরোগ আর সবল থাকতে চাই।"

তারপর একদিন সন্ধ্যায় থার্ড মাষ্টার সুরেশবাবু জিজ্ঞাসা করলেন— "সাঁতার চালিয়ে যাচ্ছ ত ?"

"না মাষ্টার মশাই ; মোটা হোতে আর চাই না।"

"কি চাও তবে ?"

একটু হেসে মতিলাল বল্‌লে—'চাই আমি সুস্থ দেহ—
শক্তিশালী ব্যাধিহীন।
সত্যপথে, সোজা হোয়ে
চলি যেন চিরদিন।'

পুতুল নাচের ইতিহাস





শ্রীমৃত্যুঞ্জয় রায়

চারটি বাঁশের উপর বাঁধা হয়েছে ছোট্ট একটি স্টেজ। তাতে না আছে জমকালো সীন আর চোখ ঝল্সানো আলো। দু'পাশটা তার কোন রকমে কাপড় দিয়ে ঢেকে দেওয়া হয়েছে। পেছনে মানে পটভূমিতে নেই কোন সীন, কেবল ঝুলছে সুন্দর কাজ করা চাদর। তার সামনে দাঁড়িয়ে আছে নানা রঙ্‌বেরঙের পোষাক পরা বিচিত্র চেহারার সব পুতুল। এদের মধ্যে কেউ রাজা, কেউ মন্ত্রী আবার কেউ রাণী। তা ছাড়া আছে রাণীর সখীবৃন্দ, রাজার অনুচরগণ, আর সেপাইশান্ত্রী। যার যেমন পার্ট তেমনি ভাবে আঁকা তার নাক, চোখ, মুখ আর দাড়ি। চোখ রাঙানো, গোঁফ পাকানো আর মুখের কাঠিন্য ভাব দেখে বুঝতে অসুবিধা হয় না যে ইনি রাজা। চোখে মুখে কমনীয় ভাব নিয়ে, দামী শাড়ি গহনা পরে রাজার পাশে দাঁড়িয়ে আছে যে পুতুলটি সে যে রাণী তা যে-কেউ বলে দিতে পারে। সেনাপতি আর মন্ত্রী—এদের দু'জনের চেহারাতেও রয়েছে একটা বৈশিষ্ট্য। অন্যদের থেকে এদেরও পৃথক্ করে নেওয়া কঠিন কিছু নয়।

আলোর নীচে সবাই দাঁড়িয়ে আছে চুপ করে। মনে হচ্ছে কার আদেশের প্রতীক্ষা করছে যেন ওরা। আদেশ পেলেই তাদের কাজ সুরু হবে—যার যার অভিনয় সুরু হবে। তারা হাসবে, কাঁদবে, গান করবে, লড়াই করবে। তাদের অঙ্গভঙ্গী, চলাফেরা আর কাজকর্ম দ্বারা অভিভূত করে ফেলবে দর্শকদের। ওদের সঙ্গে দর্শকরাও হাসবে, কাঁদবে। উপভোগ করবে নির্মল আনন্দ।

নিশ্চয় তোমরা বুঝতে পারছ আমি পুতুলনাচের কথা বলছি। আশা করি তোমরা সকলে পুতুলনাচ দেখেছ এবং প্রাণহীন পুতুলগুলির অঙ্গভঙ্গী আর রগড় দেখে প্রাণ খুলে হেসেছ। কিন্তু দুঃখের কথা কি জান? আমাদের দেশ থেকে, শুধু আমাদের দেশ থেকে কেন, বিশ্বের প্রায় দেশ থেকেই পুতুলদের এই অভিনয় লোপ পেয়ে যাচ্ছে। থিয়েটার, যাত্রা, বায়োস্কোপ আর টেলিভিশন চালু হওয়ার ফলেই লোকের মনকে আর পুতুল নাচ আকর্ষণ করতে পারছে না। অথচ এক কালে এই পুতুল নাচ পৃথিবীর সর্বত্র লক্ষ লক্ষ লোককে আনন্দ দিয়েছে। এই নাচ যেমন নির্দোষ তেমনি শিক্ষাপ্রদ। জর্জ বার্ণার্ড শ'র নাম তোমরা শুনেছ। তিনি পুতুল নাচের প্রচণ্ড ভক্ত ছিলেন। তিনি পুতুল নাচের জন্য একটি নাটকও লিখে গেছেন। তাঁর মত আরও অনেক মনীষী পুতুলনাচকে পছন্দ করতেন এবং এর প্রচার হওয়া উচিত বলে মনে করতেন। কিন্তু তাঁদের সদিচ্ছা ও ইউনেস্কো'র প্রচেষ্টা সত্ত্বেও পুতুলনাচ তেমন উৎসাহ পাচ্ছে না। নিচে বিভিন্ন দেশের পুতুলনাচের যে ইতিহাস লিখব তা থেকেই তোমরা বুঝতে পারবে যে, আর দু' এক শতাব্দীর মধ্যেই এমন সুন্দর জিনিষটি একেবারে লুপ্ত হয়ে যাবে।



পুতুল নিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে একজন ভারতীয় পুতুলওয়ালা

পুতুলনাচের স্টেজের সামনে একটি লোককে বসে থাকতে দেখেছ। তার সম্মুখে একটি ঢোল থাকে। পুতুলনাচের এটিই প্রধান বাদ্যযন্ত্র। পুতুলগুলির চলাফেরা আর অঙ্গভঙ্গীর সঙ্গে ঢোলটি তালে তালে বাজে। মাঝে মাঝে লোকটি গানও গায়। কিন্তু পুতুলনাচের আসল মানুষগুলি

থাকে পটভূমির পেছনে। অভিনয়ের সময় এদের দেখা যায় না। পুতুলগুলির বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সঙ্গে যে স্থতো বাঁধা থাকে এবং যা দিয়ে ওগুলোর অঙ্গভঙ্গী নিয়ন্ত্রিত করা হয় তা ধরে থাকে ঐ লোকগুলি। ওরাই স্থতো ধরে বিভিন্ন কায়দায় পুতুলগুলোকে চলায়, ফেরায়, অঙ্গভঙ্গী করায়। বহুদিন সাধনার ফলে তারা এ কাজে দক্ষতা অর্জন করে। পুরুষানুক্রমে তারা এই দক্ষতা ভোগ করে। কিন্তু বর্তমানে পুতুল নাচিয়ে তেমন রোজগার হয় না বলে অনেক পরিবারই এ কাজ ছেড়ে দিচ্ছে। পুতুলনাচ বিলুপ্ত হওয়ার এও একটি কারণ।



যাভা ও বালিতে এই ধরনের পুতুলনাচ হয়

যারা স্থতো ধরে থাকে তাদের ছাড়া আরও একজন লোক থাকে, যার কাজ হচ্ছে বাঁশীর মত একটি যন্ত্রের মারফৎ পুতুলগুলোর বক্তব্য বলা। এই তিনের সমবেত চেষ্টায় ও যত্নে পুতুলগুলির অভিনয় জীবন্ত হয়ে ওঠে। কথায়, গানে ও বাদ্যে এবং চলাফেরার সঙ্গতিতে কোন ত্রুটি ধরা যায় না—এমনি সাধনা তাদের। তাদের সাধনা একদিন সফল হয়েছিল এবং পুতুল নাচের আবেদন সার্বজনীন বলে সকলে তা গ্রহণ করেছিল।



বার্নার্ড শ' লিখিত একটি পুতুলনাচের নাটকে শ' আর সেক্সপীয়রের লড়াই

পুতুলনাচের রেওয়াজ কোথায় প্রথম চালু হয়েছিল তা জোর করে বলা শক্ত। কেউ বলেন চীন, আবার কারুর মতে ভারতই পুতুলনাচের জন্মস্থান। শোনা যায়, পার্বতী সর্বপ্রথম পুতুল তৈরী করেন কিন্তু তিনি তা শিবকে না দেখিয়ে খুব গোপনে নিয়ে গিয়ে একটা পাহাড়ে লুকিয়ে রাখেন। পুতুলটিতে যদি কোন দুষ্ট গ্রহ

ভর করে থাকে তবে হয়ত তা স্বামীর ক্ষতি করবে, এই ভয়েই পার্বতী শিবকে পুতুলটি দেখান নি! ওদিকে শিব কিন্তু পুতুলটি দেখার লোভ ছাড়তে না পেরে পার্বতীর পিছু পিছু গিয়ে ঐ পাহাড়ে উপস্থিত হন এবং পুতুলটির সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়ে তাকে সজীব করে তুললেন এবং মানুষের রাজ্যে পাঠিয়ে দিলেন।

এ' গল্প কতদূর সত্য ঠিক বলতে পারি না। কিন্তু ভারতীয় সাহিত্যে বিভিন্ন গল্পে পুতুল এবং জীবন্ত হয়ে ওঠা পুতুলের কাহিনী রয়েছে। যাক্, ভারতে যে পুতুলনাচ হয় তার কাহিনী সংগ্রহ করা হয় প্রধানত রামায়ণ, মহাভারত প্রভৃতি ধর্মগ্রন্থ অথবা ভারতের ইতিহাসের গল্প থেকে। দক্ষিণ ভারতের পুতুলনাচের বিষয়বস্তু প্রধানত ধর্মগ্রন্থ থেকে সংগ্রহ করা হয় এবং তা যে জনসাধারণকে ধর্মের প্রতি উদ্বুদ্ধ করে তুলতে সাহায্য করেছে তা না বললেও তোমরা বুঝবে। দ্বিতীয়ত, উত্তর ভারতের পুতুলনাচের বিষয়বস্তু হচ্ছে প্রধানত ঐতিহাসিক। ইতিহাসের কাহিনী যদি জীবন্ত হয়ে (বর্তমানে নাটক ও সিনেমার ভিতর দিয়ে যা প্রচারের চেষ্টা হচ্ছে) আমাদের চক্ষের সম্মুখে এসে উপস্থিত হয় তবে তা যে মনে গেঁথে যাবে তা খুবই সত্য কথা।



বার্নার্ড শ' আর সেক্সপীয়রের মোলাকাৎ—

আমাদের এখানে অর্থাৎ বাংলা দেশে পুতুল নাচের বিষয়বস্তু বিশেষ কোন বিষয়ে নিবদ্ধ থাকত না। পুতুলনাচের মধ্য দিয়ে আমরা যেমন ইতিহাসের ঘটনাকে জানতে পারতাম, তেমনি রামায়ণ মহাভারতের এবং অন্যান্য ধর্মমূলক গ্রন্থের কাহিনী দেখতে পেতাম। তা ছাড়া অন্যান্য বিষয় নিয়েও পুতুলনাচের কাহিনী গড়ে উঠেছে এবং তা দর্শকদের প্রায় নিঃখরচায় আনন্দ দিয়েছে।

এশিয়ার বিভিন্ন দেশের পুতুলনাচের কাহিনী এবার বলছি। প্রথমত ধর চীনের কথা। খৃষ্ট জন্মের হাজার বছর পূর্বেও যে চীনে পুতুলনাচ জনপ্রিয় ছিল তার প্রমাণ পাওয়া যায় লেৎ-সে নামক জনৈক চীনা ঐতিহাসিকের গ্রন্থ থেকে। কি করে পুতুল তৈরী হত এবং কি করেই বা তা নাচান হত তার বর্ণনা তিনি দিয়েছেন। সেখানে পুতুলগুলি কেমন চমৎকার এবং প্রায় জীবন্তের মত ছিল নিচের গল্পটি পড়লেই তা বুঝবে।

তখন এন্ জে ছিলেন চীনের নাম করা পুতুলিওয়ালা। কোন এক উৎসব উপলক্ষে চীনের সম্রাট্ স্থ তাকে ডেকে আদেশ দিলেন তাঁর সম্রাজ্ঞীদের পুতুলনাচ দেখাবার জন্য। রাজপ্রাসাদে খেলা দেখাবার আমন্ত্রণ পেয়ে এন্ জে ভারী খুশী হলেন এবং এমন সব পুতুল বানালেন যা ঠোঁট নাড়তে পারে, হাত নাড়তে পারে, এমন কি চোখের ডিমও ঘুরাতে পারে। এমনি অদ্ভুত আর প্রায় জীবন্ত পুতুল নিয়ে খেলা দেখাতে গিয়ে কিন্তু এন্ জে বিপদে পড়ে গেলেন। পুতুলগুলোর ঢং দেখে সম্রাট্ রেগে টং হলেন। তাঁর ধারণা হল ওগুলো পুতুল নয়, আসল মানুষ এবং ওগুলো রাণীদের সঙ্গে ফষ্টিনষ্টি করছে। তক্ষুণি পুতুলিওয়ালার মুণ্ডটা কেটে ফেলার আদেশ দিলেন তিনি। এন্ জে তাড়াতাড়ি পুতুলগুলি ছিঁড়ে ফেঁড়ে প্রমাণ করলেন যে এগুলো সত্যি পুতুল, মানুষ নয়। সম্রাট্ তাঁর ভুল বুঝে এন্ জে-কে ক্ষমা করলেন। এ থেকে তোমরা সহজেই বুঝতে পারছ কত সুন্দর ও চমৎকার পুতুল চীনারা তৈরী করতে শিখেছিল। কিন্তু তা বলে সব পুতুলই এন্-জের পুতুলের মত এমন জীবন্ত মনে হত এমন ভাবা কিন্তু ভুল।



লঙ্কার রাজা দশানন রাবণ দাঁড়িয়ে আছেন রঙ্গমঞ্চে।

যাহোক, চীনে এখনও পুতুলনাচ খুব জনপ্রিয় আমোদপ্রমোদ হিসেবে গণ্য হয়।

চীনের পরেই জাপানের কথা বলা যায়। চীনারাই জাপানীদের পুতুল তৈরীর আর্টটি শিখিয়ে দেয়। পরে এখানে পুতুলনাচ এত জনপ্রিয় হয় যে তার কাছে কাবুকি নাচও কেমন নিষ্প্রভ হয়ে যায়। পুতুলনাচের জন্য ঘোরানো স্টেজ নির্মিত হয়। দূর প্রাচ্যের সেক্সপীয়র চিকামাৎসু মন্জামন্ পুতুল রঙ্গমঞ্চের জন্য অনেক নাটক লিখে দিয়েছেন। কিন্তু কোন কারণে কিছু দিনের জন্য পুতুল নাচের জনপ্রিয়তা সেখানে হ্রাস পায়। একে পুনরুজ্জীবিত করার জন্য ওসাকার বুন্রাকু নামে একটি কোম্পানী চমৎকার চমৎকার পুতুল নির্মাণ করতে সুরু করেন। তাদেরই চেষ্টায় পুতুলনাচ আবার জনপ্রিয় হয় এবং বুন্রাকু পুতুল রঙ্গমঞ্চের প্রতিষ্ঠা হয়।

বুন্‌রাকু পুতুলগুলোর গঠন যেমন বৈশিষ্ট্যপূর্ণ, নাচাবার কায়দাও তেমনি পৃথক্। এই পুতুলগুলো আকারে মানুষের চেয়ে সামান্য ছোট। ওজন প্রায় পনের সের। প্রত্যেকটি পুতুলের মুখভঙ্গিমা অত্যন্ত যত্নের সঙ্গে অঙ্কিত করা হয় এবং প্রত্যেক সীনের আগে পুতুলের চুল, পোষাক পরিচ্ছদ খুব যত্নের সঙ্গে ঠিক করে দেওয়া হয়। তাছাড়া প্রত্যেকটি সীনে অভিনয় করতে গিয়ে এক একটি পুতুলের মুখে যে যে ধরণের অভিব্যক্তি প্রকাশ পাওয়ার কথা ঠিক ততগুলো মুখই তৈরী করা হয়। সুতরাং আমাদের দেশের মত কোন একটি পুতুল একই অভিব্যক্তি নিয়ে স্টেজে অবস্থান করে না—প্রয়োজন বোধে তাদের মুখমণ্ডল পরিবর্তন করে দেওয়া হয়।



বুন্‌রাকু পুতুলের নাচ। উঃ কী রেগেছে দেখেছ?



রুশিয়ার পেট্রাচ্‌কা পুতুল। পুতুলটি নাচিয়েকে কেমন আদর করছে দেখ।

তারপর আমাদের দেশের মতন ওদেশে পুতুল স্তো ধরে নাচান হয় না এবং যে নাচায় সেও দর্শকের কাছে অদৃশ্য থাকে না। খোদ পুতুল-নাচিয়ে এবং তার দু'জন সাকরেদ স্টেজেই অবস্থান করে নাটকের বর্ণনা অনুযায়ী পুতুলগুলোর অঙ্গপ্রত্যঙ্গ নিয়ন্ত্রিত করে প্রধান পুত্‌লিওয়ালা। নাচের সময় সে একটি প্রাচীন কালের উৎসবের উপযোগী পোষাক পরিধান করে আর তার স্যাকরেদরা পরে মিশ্‌কালো রঙের আলখাল্লা এবং একটি মস্তকাবরণ। এই ভাবে তাদের অনুপস্থিতিই প্রকাশ করার চেষ্টা হয়। শোনা যায় চীনদেশীয়

পুতুলনাচ এত আকর্ষণীয় যে, নাচ সুরু হলে প্রধান পুতুলিওয়ালা বা তার সাকরেদদের উপস্থিতির কথা দর্শকরা ভুলেই যায়।

উপরিউক্ত তিন ব্যক্তি পুতুলের তিনটি পৃথক্ অঙ্গ চালনা বা নিয়ন্ত্রিত করে, যেমন, প্রধান পুতুলিওয়ালা পুতুলের মাথা ও ডান হাত এবং তার সাকরেদদের একজন বাঁ হাত ও অপরজন পা চালনা করে। জাপানীদের এক বিশেষ যন্ত্রসঙ্গীতের ও গায়কদের গানের এবং নাটকের বিষয়বস্তু ও পার্ট বলার সঙ্গে সঙ্গে ঐ তিনজন লোক পুতুলগুলোকে ভাবপ্রকাশের ভঙ্গীতে চালনা করে। যন্ত্রসঙ্গীত, বর্ণনা ও পুতুলগুলোর দেহভঙ্গিমায় কখনও অসামঞ্জস্য দেখা যায় না। শোনা যায়, ত্রিশ বছর একান্ত ভাবে অভ্যাস না করলে কেউ পুতুল নাচিয়ে হতে পারে না।



বুন্‌রাকু পুতুলের মাথা। দেখলে ভয় হয়—না ?

চীনের মত ব্রহ্মদেশেও পুতুলনাচ বেশ প্রচলিত ছিল। তবে চীনে পুতুলনাচকে যেমন কেবল আমোদ-প্রমোদের অঙ্গহিসাবে ধরা হয় না, এর মাধ্যমে প্রচারকার্যও চালান হয়— ব্রহ্মদেশে কিন্তু তা নয়। এখানে পুতুলনাচের উদ্দেশ্য হচ্ছে বিশুদ্ধ প্রমোদ বিতরণ। তাই পুতুলগুলো তৈরী করা হয় দর্শকদের হাসাবার জন্য। ড্রাগন ও চাষীর লড়াই, ড্রাগনকে হত্যা এবং তার পুনরুজ্জীবন (জীব হত্যা ব্রহ্মদেশীয়রা পছন্দ করে না বলেই ওকে বাঁচান হয়) এই হচ্ছে পুতুলনাচের প্রধান বিষয়বস্তু। তবে প্রাচীন রাজরাজড়াদের কাহিনী নিয়ে পুতুলনাচ যে না হয় তা নয়। এর সঙ্গে নাচ, গান এবং উপযুক্ত যন্ত্রসঙ্গীতও থাকে।

ভারতের মত ব্রহ্মদেশেও পুতুলনাচ প্রায় বিলুপ্তির পথে তবে দূর গ্রামাঞ্চলে যেখানে এখনও সিনেমার প্রসার হয়নি সেখানে পুতুল-নাচিয়েরা পুতুলনাচ দেখিয়ে কিছু কিছু উপার্জন করে পেট চালায়।

এশিয়ার আর যে কয়টি দেশে পুতুলনাচ প্রসার লাভ করে এককালে সর্বসাধারণের আনন্দ উপভোগের উৎস ছিল তার মধ্যে নাম করা যায় সিংহল, যাভা ও বালি। সিংহলে পুতুলনাচ এককালে

বেশ প্রসার লাভ করেছিল। বিভিন্ন পুস্তকেও তার উল্লেখ দেখা যায়। কিন্তু এখন তা একটা নির্দিষ্ট এলাকায় গণ্ডীবদ্ধ হয়েছে। ওদেশে পুতুলনাচের কায়দার কোন পরিবর্তন হয়নি। মনে হয় ভারত থেকেই পুতুলনাচের কায়দা সিংহলীরা শিখে নিয়েছে।

যাভা ও বালিতে পুতুলনাচের ব্যাপারটা একটু জটিল। ওখানে অন্ততঃ পাঁচ ধরণের পুতুল ছিল—এদের রঙে, পোষাকে এবং চেহারায় কোন মিল ছিল না। এর মধ্যে এক শ্রেণীর পুতুলকে প্রারম্ভে মৃতের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপনের মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করা হত। যাক, এই সংস্কারটি চলে গেছে। এখন নানা উৎসব উপলক্ষেই পুতুলনাচের ব্যবস্থা হয়।



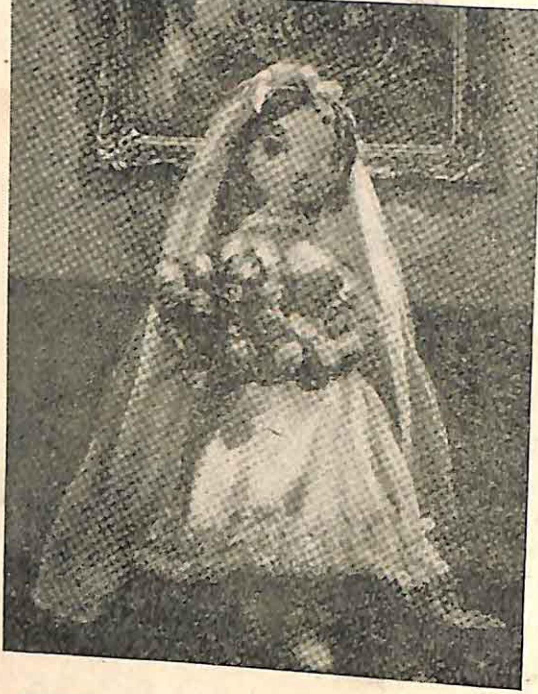
ইংলণ্ডের পুতুলনাচের পুতুল। নাকটা দেখেছ?

যাভা ও বালিতে পুতুলনাচটা অনেকটা 'ছায়া নাটকের' কায়দায় দেখান হয়। মহাভারত থেকেই প্রধানত এর বিষয়বস্তু গ্রহণ করা হয়। সারারাত ধরে এই অভিনয় চলে।

এই তো গেল এশিয়ার পুতুল-নাচের ইতিকথা। কিন্তু কেবল যে এশিয়ার লোকই পুতুলনাচ দেখতে ভালবাসত তা নয়, বিশ্বের সব জায়গার লোকই পুতুলনাচ দেখে আনন্দ পেত এমন কি রাজরাজরারাও বাদ যেতেন না। তাঁরা পুতুলনাচ প্রসারের জন্যও আপ্রাণ চেষ্টা করেছেন, সে সঙ্গে কতিপয় শ্রেষ্ঠ নাট্যকারের অবদানও কম নয়।

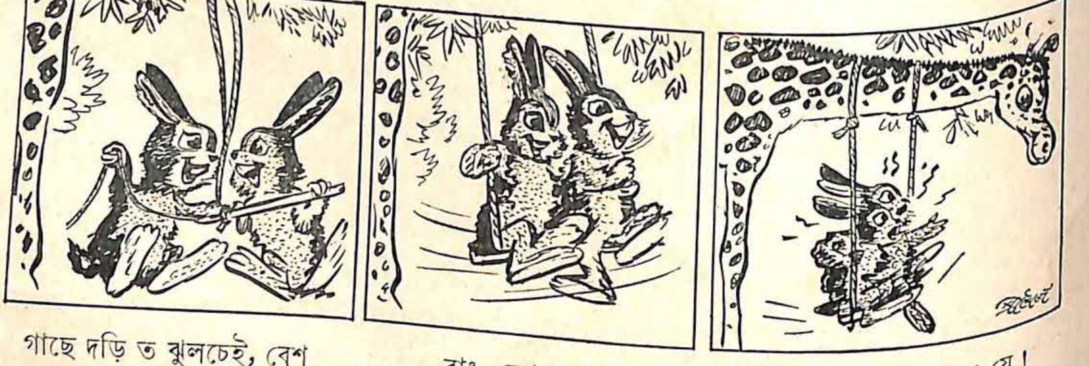
শোনা যায়, ষোড়শ শতাব্দীতে নেপল্‌স্‌-এ পুতুলনাচের সৃষ্টি হয় এবং ক্রমে তা সারা ইউরোপ ও আমেরিকায় ছড়িয়ে পড়ে। যে সব দেশে বিশেষ করে পুতুলনাচ লোকপ্রিয় আমোদ-প্রমোদে পরিণত হয় তার মধ্যে ফরাসী, ইতালী, ব্রিটেন, স্পেন, অস্ট্রিয়া, হলাণ্ড, রুশিয়া, জার্মাণী, তুর্কী, গ্রীস, নেদারল্যাণ্ড, চেকোশ্লোভাকিয়া ইত্যাদি দেশ রয়েছে। এই সব দেশে যে পুতুলনাচ প্রচলিত ছিল তাদের প্রধান চরিত্রটি ছিল অভিন্ন, যদিও নাম ভিন্ন ভিন্ন দেশে ছিল ভিন্ন, যেমন, নেপল্‌স্‌-এ এই প্রধান চরিত্রটির নাম ছিল পলাস গ্যাল্লিনাসিউস, ইতালীতে পলসিনেলা, ফ্রান্সে পলিসিনেল, ইংলণ্ডে পাঞ্চিনেল্লো, জার্মাণীতে ওর নাম হয়েছিল হ্যান্সভার্স্ট, অস্ট্রিয়াতে ক্যাসপারলি, হল্যাণ্ডে হ্যান্স পিকেলহেরিং ও জানক্লাসেন, স্পেনে ক্রিস্টোবার পুলচিনেলা, রুশিয়াতে পেট্রোর্ভচ্‌কা

এবং তুর্কীতে কারাগোজ। এগুলোর আকৃতি একরকম নয়, হওয়া সম্ভবও নয়। কারণ, বিভিন্ন দেশের মানুষের ছাপ পড়ত ওদের উপর, তাই চেহারা ছিল আলাদা এবং পোষাক-পরিচ্ছদ ও রঙ্গরসের ধরণটাও ছিল পৃথক্ কিন্তু প্রকৃতিটা ছিল প্রায় একরকম। আনন্দ বিতরণই ছিল এদের সৃষ্টির প্রধান উদ্দেশ্য।



চেকোশ্লোভাকিয়ার পুতুল। কেমন সেজেগুজে ফুলের তোড়া নিয়ে বেড়াতে চলেছে।

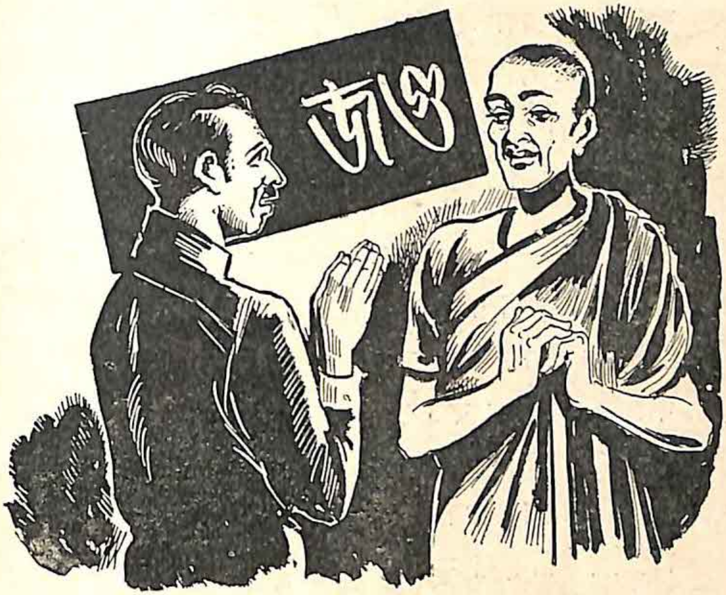
বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন কায়দায় পুতুলগুলো তৈরী হলেও সুতো ধরেই বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে নাচান হত এবং ইতিহাস ও পৌরাণিক কাহিনী থেকে অভিনয়ের বিষয়বস্তু সংগ্রহ করা হত। রঙ্গমঞ্চের ধরণেরও তারতম্য ছিল। কিন্তু, পূর্বেই বলেছি একটি বিষয়ে তাদের মিল ছিল এবং তা হল জনসাধারণকে আনন্দ বিতরণ। অবশ্য তা থেকে রাজরাজড়ারাও বাদ যেতেন না। তাঁরা ওদের নিয়ে এসে নাচ দেখে আনন্দ উপভোগ করতেন। কিন্তু সময়ের পরিবর্তনের সঙ্গে মানুষের মনেরও পরিবর্তন হয়েছে, ফলে খুব মুষ্টিমেয় দেশ ভিন্ন অন্য সর্বত্র পুতুলনাচ আজ উপেক্ষিত। ভবিষ্যতে যে এর পুনরুজ্জীবন হবে তার সম্ভাবনা খুব কম।



গাছে দড়ি ত ঝুলচেই, বেশ দোল্‌না খাটানো যাক

বাঃ, বেশ মজা!

ওমা! গাছটা নড়ে যে!



শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক

জুয়া খেলে জগু করে জমিজমা, জমাইল বহু টাকা।
জুয়ার জোরেতে জগৎ জিনিবে—ইহাই জেনেছে পাকা।
কয়েক বরষ পরে দেখিল সে, সকলি যে বিপরীত।—
মোটের উপর হারই হয়েছে, ভেবেছিল যাহা জিৎ।
"সততাই ভাল পন্থা"—এ কথা নিজে সে সতত কয়,
সত্যের জয়, সত্যের জয়—এ কথা মিথ্যা নয়।
ঠেকিয়া ঠকিয়া এতদিন পর বুঝিতে পেরেছে আহা।
ফাঁকি দিয়া যাহা লাভ করা যায়—ফাঁকিতেই যায় তাহা।

২

একদিন মোরে প্রণাম করিয়া বলে জগু মনোদুখে,
হে দাদা-ঠাকুর, এইবার মোর সব ভুল গেছে চুকে।
যতই 'পলিসি', যতই পালিশ, যত করি হাঁক ডাক্ই,
নীতি দিয়ে তারে যতই জড়াই—ফাঁকি যে রহিবে ফাঁকি।

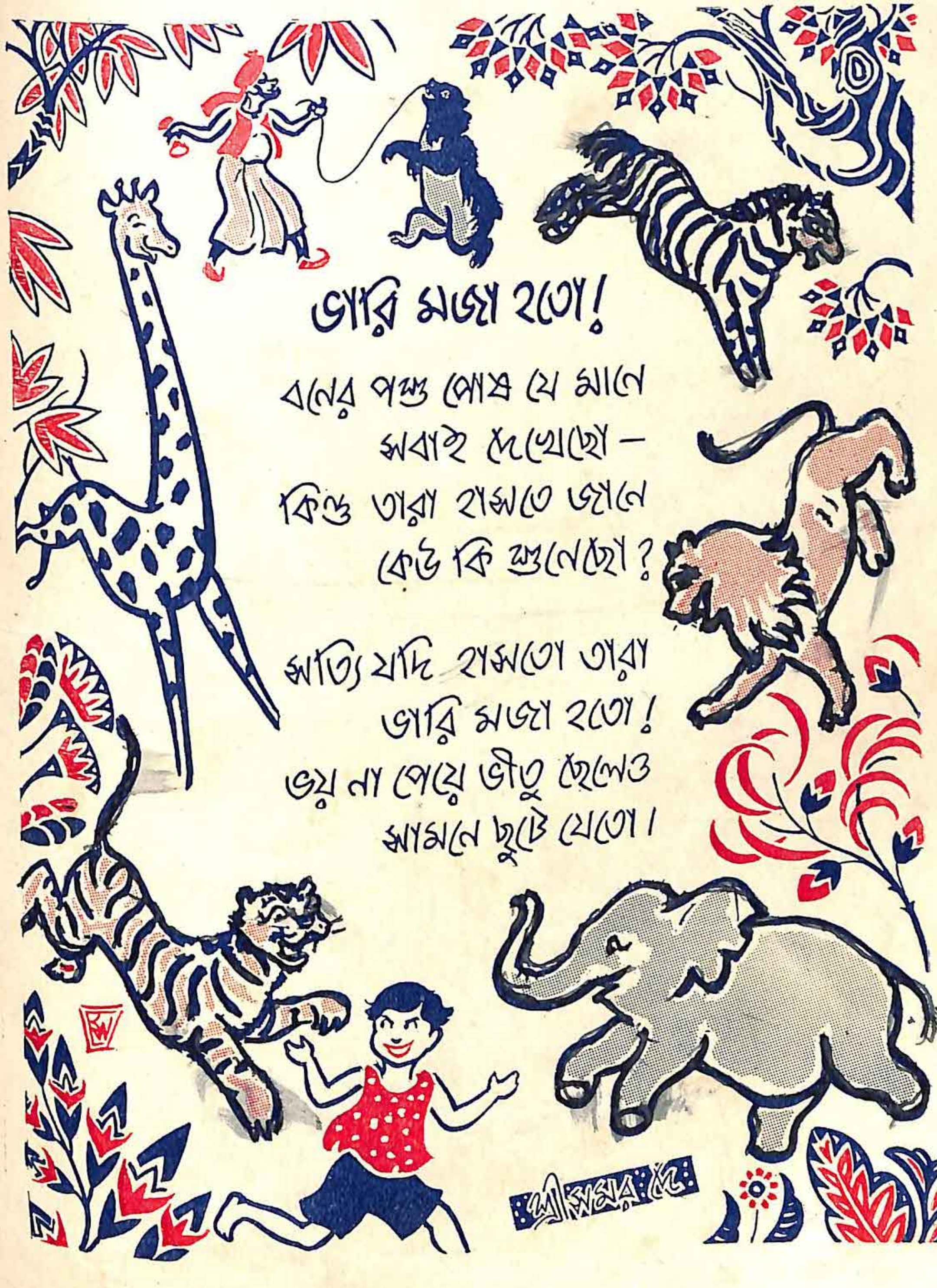
যত রঙ দিই, সব চেয়ে বেশী, সত্যের রঙ পাকা,—
সপ্তরঙের পরদা দিলেও কিছুতে পড়ে না ঢাকা।
আপনি বিজ্ঞ, আমি ত নেহাৎ মুর্খের রাম ঢেঁকী,
তবু বুঝিয়াছি পাপ ধরাতেও কিছুতে চলে না মেকী।

৩

চলে না এ কথা বলিতে পারিনে, বেশী দিন চলে নাকো,
মোড়কে জড়ায়ে 'আরকে' ভিজায়ে যেমন করিয়া রাখো।
ফাঁকির ফাঁকেতে কত সুবিশাল রাজ্য পাইল লয়,
তবু মনে হয় লোকে কেন লয় এমন পাপাশ্রয়!
বিরাট ফাঁকির কারবার চলে—দেখে ব্যথা পায় মন,
নির্ব্বোধ আমি যা বুঝেছি তা কি বুঝে না বিজ্ঞজন!
জুয়ারী জগুর সুমতি দেখিয়া লভিনু পরম প্রীতি,
যুগ যুগ ধরে তবুও ইহারি ব্যবসা চলেছে নিতি।

৪

সৃষ্টি ও লয় কতই হইল রাজ্য রাজেশ্বর,—
চতুরতা দিয়ে সত্যকে ঢাকে, কইতো করে না ভর।
প্রবঞ্চনার ভিত্তিতে গড়ে রাষ্ট্রের ইমারৎ
মিছে মর্ম্মর মূর্ত্তি গড়িয়া—অসৎকে বলে সৎ।
ফন্দীতে সব হতে পারে—তাতে বন্দী হয় না কাল,
তবে 'নাকালে'র সময়—কয়টা দিনের অন্তরাল।
চারি যুগ এর সাক্ষ্য দিয়াছে দিতেছে এবং দিবে
দক্ষযজ্ঞ করা বাদ দিয়ে এ যেন সত্য শিবে।



ভারি মজা হতো!

বনের পশু পোষ যে মানে
সবাই দেখেছো—
কিন্তু তারা হাসতে জানে
কেউ কি শুনেছো?

সত্যি যদি হাসতো তারা
ভারি মজা হতো!
ভয় না পেয়ে ভীতু ছেলেও
সামনে ছুটে যেতো।

শ্রী সমর দে











মামার ফাঁকি

শ্রীরূপাল · বীরেন্দ্রকুমার ভট্টাচার্য



সিংগির মামা ভোম্বলদাস--
বাঘ মেরে খায় দূর্বাঘাস।
ভাগ্নে দেখে' ব'ল্লে—"মামা,
দেখ্‌ছি একি কাণ্ডখানা!
সাম্‌নে রেখে গণ্ডা লাশ,
কাট্‌ছো দাঁতে চাট্টি ঘাস।"

মাতুল কহে—"হায় আনাড়ি!
বুঝ্‌বি কিসে—নেই যে দাড়ি।
মাংস খেয়ে পেটের দফা,—
তাইতে চাখি দূর্বা তোফা।
দেখিস্‌নি কি—বাঘের মাসী
ভোজের পরে চিবোয় ঘাস-ই!"





খুকীর সাথী

—শ্রীকাত্তিকচন্দ্র দাশগুপ্ত



হাঁ ক'রে তুই দেখিস্ কি ও খুকুরাণী ?
দেখ্‌ছো কি রে কেমন হ'লো ফটোখানি !
পুষির সাথে তুল্‌বি ছবি,—ভাব্‌ছো বুঝি ?
বেড়াল ছানা একটা তুই-ও আন্-না খুঁজি ।

একলা আমার তুল্‌বে ফটো নাকি ?
ভাব্‌ছো—সোজা পুষিরে দেওয়া ফাঁকি !
আগেই সে এসে রয়েছে ব'সে কোলে,—
ফেলে তারে মোর ছবি কি তোলা চলে ?



'ছড়া' ও 'ছড়ি'

—শ্রীপ্রবোধচন্দ্র বসু

'ছড়া'-র পরেই 'ছড়ি' কেন ?
—শুন্‌বে কারণ ?—তবে শোনো—
খুকু যখন ছোট্ট থাকে
ঘুর্‌তে থাকে কোলে-কাঁখে
আদর কুড়োয় বাড়ীর থেকে
সেই বয়সে শুনিয়ে 'ছড়া'
ঘুম পাড়িয়ে দেন মায়েরা ॥

'ছড়ি'র কথা শোনো এবার ।
—বয়স খুকুর ছ'-সাত পার ।
—তখন তারা দুষ্টু হ'য়ে,
জড়সড় রয়না ভয়ে,
দস্যিপণায় আছে পেয়ে ;
—মা-বাবারা সেই বয়সে,
দেখিয়ে 'ছড়ি', রাখেন বশে ॥



মজার বালিশ

(চীনদেশের রূপকথা)

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়

এক সাধু। সাধু তীর্থে-তীর্থে ঘুরে বেড়ান। ঘুরতে ঘুরতে বন-পাহাড় পার হয়ে একদিন সন্ধ্যার সময় তিনি এলেন এক গ্রামে। গ্রামে ঢুকেই সরাই। সাধু ভাবলেন, এখনি রাত হবে—রাত্রে আর ঘোরা নয়···এইখানে পড়েই রাতটুকু কাটিয়ে দেবেন।

সরাইয়ের সামনে সরাইওয়ালা দাঁড়িয়ে ডিমওয়ালার কাছে ডিম কিনছে···সাধু বললেন সরাইওয়ালাকে—তোমার সরাইয়ের রোয়াকে যদি রাত্রে আমি থাকি, তাহলে তোমার কোনো অসুবিধা কি হবে, বাপু?

সাধুকে দেখে সরাইওয়ালা বললে—সে কি ঠাকুর, আপনি সাধু-মানুষ—বাইরে রোয়াকে কেন থাকবেন! আপনাকে আলাদা ঘর দেবো—সেই ঘরে আপনি থাকবেন।

সাধু বললেন—না। আমি সাধু-সন্ন্যাসী মানুষ···আমি কোনো ঘরে থাকতে পারি না। বাইরের এই রোয়াকেই আমি থাকবো।

সরাইওয়ালা বললে—না না, এতে আবার আমার অসুবিধা কি হবে! আপনি স্বচ্ছন্দে রোয়াকে থাকতে পারেন!

সরাইওয়ালার কথা শুনে সাধু তাঁর মাছুর বার করে রোয়াকে পাতলেন, কাঁধের ঝুলি নামিয়ে মাছুরের পাশে রাখলেন—রেখে মাছুরে বসলেন। সরাইওয়ালা ডিম কিনে ডিমওয়ালাকে ডিমের দাম দিয়ে সরাইয়ে ঢুকলো।

সরাইয়ে এক-একজন করে খদ্দের আসছে…সাধুর দিকে তারা ফিরেও তাকায় না —তারা সরাইয়ে ঢুকছে।

রাত হলো…সাধু মাছুরে বসে আকাশের দিকে চেয়ে আছেন…আকাশে চাঁদ… একরাশ নক্ষত্র—সাধু আকাশের দিকে চেয়ে আছেন।

একজন দিন-মজুর এসে রোয়াকের নীচে বসলো। সাধু দেখলেন, দেখে বললেন— ধূলোয় বসলে কেন বাবা? উঠে আমার মাছুরে বসো…আমার পাশে…

মজুর বসলো মাছুরে সাধুর পাশে!—বসে দুজনে গল্প…

সাধু বললেন—কি কাজ করো তুমি?

মজুর বললে—পাঁচজনের ক্ষেতে কোদাল চালিয়ে মাটী কোপাই…গাছপালা কাটি… তাতেই যা রোজগার হয়।

সাধু বললেন—তোমার বাড়ী কোথায়?

—আমার বাড়ী বহু দূরে ওদিকে। তাকে বাড়ী বলে না ঠাকুর…গর্ত্ত!

সাধু বললেন, বাড়ীতে তোমার কে আছে?

—কে আবার থাকবে, ঠাকুর! দুঃখী মানুষ…আমার কেউ নেই। যে-কষ্টে দিন চলে! একে বাঁচা চলে না গো!…শ্যাল-কুকুরও আমার চেয়ে আরামে থাকে।

মজুর তার দুঃখের কথা বলতে লাগলো। তার কত সাধ, বড় লোক হবে… বড় বাড়ী হবে! বিয়ে করে বাড়ীতে আনবে পরমাসুন্দরী বৌ—বাড়ীতে থাকবে দাস-দাসী দরোয়ান লোকজন—ঘোড়াশালে থাকবে তেজী ঘোড়া! সে হবে রাজার সেনাপতি, না হয় মন্ত্রী—আর কিছু না! পরের ক্ষেতে মাটী কেটে, পরের বাড়ীর জঞ্জাল সাফ করে দিন কাটছে। না হলো বিয়ে…না হলো বাড়ী…না ঘোড়া…না কিচ্ছু…বাঁচতে তার মোটে ইচ্ছা করে না। কেবলি ভাবে, যদি মরতে পারে তো এ-জন্মের মতো বেঁচে যায়—পরের জন্মে মন্ত্রী হয়ে…

বলতে বলতে মজুরের দুঃখ একেবারে উথলে উঠলো!

সাধু বললেন—যদি রাজার মন্ত্রী হতে পারো, তাহলে বাঁচতে চাইবে?

—ওঃ! মজুর বললে—তাহলে কি আর মরতে চাই, ঠাকুর! আপনার কাছ থেকে চেয়ে চিন্তে একটা মাদুলি নিলে হয়ত একশো বছর বাঁচতে পারি।

—বটে! সাধু বললেন—রাত হয়েছে···সারাদিন খেটে কাজ করেছো। আবার কাল সকাল হলেই তো খাটতে হবে। ঘুমোও···

সাধুর কথা শেষ হতে না হতে ঘুমে মজুরের চোখ ঢুলে এলো। সে ঘন ঘন হাই তুলছে! সাধু বললেন—শোও···আমার মাদুরের একদিকেই শোও। আর এই নাও বালিশ···আমি দিচ্ছি—বালিশে মাথা রেখে ঘুমোও।

ঝুলির ভিতর থেকে সাধু দিলেন বড় একটা বালিশ—চীনে-মাটীর তৈরী বালিশ··· ঝক্‌ঝক্ করছে গা···চাঁদের আলো পড়ে। বালিশটা দেখতে যেন একটা মোটা নল।

বালিশটা মাদুরে রেখে মজুর দেখে—নল-বালিশের দুমুখ খোলা···এত বড় বড় ফাঁদল। বালিশে মাথা রেখে মজুর শুয়ে পড়লো···শুয়ে দুচোখ বুজলো।

একটু পরে কি তার মনে হলো। মাথা তুলে নল-বালিশের ফাঁদলে ঢুকলো···ঢুকে তার ভিতর দিয়ে চলেছে, চলেছে।···চলেছে হামা দিয়ে···

যেতে যেতে বেরুলো ওদিককার ফাঁদল দিয়ে। যেমন বেরুনো···দেখে, তার বাড়ীর সামনে এসেছে! বাড়ীর সামনেটুকু শুধু চিনলো—তার সে বাড়ীর উপর উঠেছে সাত মহল পুরী। পুরীর দোরে সেপাই-শান্ত্রী। তাকে দেখে সেপাই-শান্ত্রীরা মাথা নুইয়ে সেলাম করলো। মজুর ঢুকলো পুরীর মধ্যে। পুরীর মধ্যে ঢুকেই দেখে,—এক অপরূপ সুন্দরী কন্যা। এ আবার কে?

কন্যা বললে—বাঃ! চিনতে পারছো না। তোমার বৌ আমি।

সত্যি! মজুর খুব খুশী!···বৌয়ের সঙ্গে মজুর উঠলো সাত-তলার ঘরে। সাজানো ঘর—পালঙ্কে নরম বিছানা। মজুর শুয়ে পড়লো বিছানায়···শোবামাত্র ঘুম!

সকালে ঘুম ভাঙ্গতে লোকজন বললে—রাজার কাছ থেকে তলব এসেছে!

মজুর চমকে উঠলো! রাজার তলব!···মজুর চললো রাজপুরীতে রাজার সভায়। রাজা বললেন—আজ থেকে তুমি হলে আমার মন্ত্রী···আমার মন্ত্রিত্ব করবে।

মজুর হলো রাজ্যের মন্ত্রী। তার যেমন মান, তেমনি সুখ-ঐশ্বর্য্য···

দিন যায়···মাস যায়···বছর যায়···মন্ত্রী হয়ে মজুর খুব সুখে আছে! যেমনটি চেয়েছিল···আঃ!

তারপর হঠাৎ রাজ্যে গোলমাল! শত্রুর সঙ্গে কারা চক্রান্ত করেছে—রাজাকে মেরে সিংহাসন নেবে তারা!

সে দলে মজুর-মন্ত্রী নাকি সর্দ্দার! চক্রান্ত ধরা পড়েছে প্রমাণও পাওয়া গেছে। রাজা হুকুম দিলেন—মশানে নিয়ে গিয়ে এই মন্ত্রীটার গর্দ্দান কাটো।

জহ্লাদ চললো মন্ত্রীকে নিয়ে মশানে—হাড়ি-কাঠে তার ঘাড় গুঁজে দিয়ে দিল এক কোপ্।

—ওঃ! বলে চেঁচিয়ে উঠলো মজুর-মন্ত্রী।

সঙ্গে সঙ্গে স্বপ্ন গেল ভেঙ্গে! উঠে সে বসলো…বসে ঘাড়ে হাত বুলাতে বুলাতে চোখ পড়লো সাধুর দিকে।



দেখে, সাধু হাসছেন! মজুর চেয়ে চেয়ে চারদিক দেখে,—সরাইয়ের রোয়াক—সাধুর মাদুরে সে বসে সাধুর পাশে… আর ঐ সেই চীনা-মাটীর বালিশ। এতক্ষণ তাহলে…স্বপ্ন দেখছিল? না…

সাধু বললেন—কি গো বাপু, মন্ত্রী হতে চাও? মন্ত্রী হলে বিপদ কত, বুঝলে!

দু-হাত জোড় করে মজুর বললে—না ঠাকুর, মন্ত্রী হলে কি যে হতে পারে…খুব বুঝেছি! মন্ত্রী হতে যে চায় সে মন্ত্রী হোক। আমি এমনি মজুরই থাকি যেন।…



ভোম্বলের ড্রাইভারী

ভোম্বলের ড্রাইভারী

— শৈল চক্রবর্তী



রায়েদের ভোম্বল বড় খাসা ব্রেন্ তার
ছোট বড় রোগা মোটা বই দেখে এন্তার।
যন্তর তন্তর চালানোর বিত্তায়
ভোম্বল মাঝে মাঝে সেদিকেও মন ছ্যায়।
বিজ্ঞানে মাথা আছে একথা যে সত্যি
মাষ্টার বলেছেন—যদিও একরত্তি
ছেলে বটে, তবু তার হাতে থাকে হাতুড়ি।
চাকা আর ইস্ক্রুপ্ কিম্বা কাতুরি।
একটা কিছুই চাই—ঠোকবার ভাঙ্গবার
কেটে ছিঁড়ে তালি দিয়ে জোড়া দিতে বার বার।
মটরের সখ তার, পেল যাই গাড়ী সে
দিনরাত ঘষামাজা ছাড়বে না বাড়ী সে

কলেজেতে যায় দাদা, ধরলো সে বাগিয়ে
'মটর কি খায় দাদা ?' বলে এসে আগিয়ে।
বাস যায় ছুটে দেখে দাদা তোলে সোরগোল—
দূর থেকে বলে গেল 'পেট্রোল পেট্রোল।'
ভোম্বল দিল্ খুস্ নেচে ওঠে ধিন ধিন
খুঁজে খুঁজে আনে এক পেট্রোল টিন।
দড়ি বেঁধে ঝোলালো সে গাড়ীর সমুখে
খাত্ত রেখেছে ঠিক খাদকের মুখে।
ফূর্ত্তিতে ভরপুর মিটি মিটি চায়—
"এবার দেখবো গাড়ী যায় কি না যায়।
দানা দেখে ঘোড়া যদি করে ছট্‌ফট্
মূলো দেখে গাধা যদি ছোটে হট্‌পট্

তাহলে মটর কেন রবে চুপ ক'রে ?
রেখেছি খাত্তটি তার সমুখেতে ধ'রে।
বোলোনা তাহারে কেউ গোপন কথাটা
ভিতরে কিছুই নাই খালি টিন এটা।"

—

পুজোর ছড়া



লেখা - অনিলেন্দু চৌধুরী
রেখা - রেবতীভূষণ ঘোষ



ব্যাঙ্ ব্যাঙ্ ব্যাঙ্ ব্যাঙাচি
ব্যাঙের ঠ্যাঙে ঘামাচি
ভেঙ্চি কাটে মৌমাছি —
সেই রাগেতে ল্যাঙ্ মেরে ব্যাঙ্
লেঙ্চে চলে করাচি।

খাঁদা খোঁচার বোঁচা বৌটে
খোঁচা খেয়ে চোঁচা ছোটে
হাঁকিড় মিকিড় চামচিকড়ের
চিঙ্ড়ী-খেকো মাসী
রাঁচির টিকিট কিনে সটান
পৌঁছে গেল কাশী





দুই ঠাকুরের কাহিনী



শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়

এক ঠাকুর হচ্ছেন রবীন্দ্রনাথ। আর এক ঠাকুর তাঁরই ভ্রাতুষ্পুত্র অবনীন্দ্রনাথ। বাংলার দুই রত্ন। ঠাকুরের মতই প্রণম্য।

জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ীর অঙ্গনে প্রবেশ করলে বাঁ দিকে চোখে পড়ে একখানি লালরঙের দোতালা বাড়ী। প্রথম মহাযুদ্ধের সময়ে রবীন্দ্রনাথের উদ্যোগে এই বাড়ীতে প্রতিষ্ঠিত হয় 'বিচিত্রা' সভা। নানাকারণে এ সভা বিচিত্র ছিল সত্যসত্যই। বাংলাদেশে তার আগে বা পরে এর চেয়ে স্মরণীয়, লোভনীয় বা এর সঙ্গে তুলনীয় অন্য কোন সভা বা সমিতি আর দেখা যায়নি।

কেবল সভা নয়, বিচিত্রা-ভবনে ছিল প্রকাণ্ড একটি পুস্তকাগারও। মস্ত এক হলঘরের দেওয়াল জুড়ে সাজানো থাকত উচ্চশ্রেণীর সংখ্যাতীত গ্রন্থ, তার মধ্যে ছিল জ্ঞানভাণ্ডারের জ্ঞাতব্য যা-কিছু তথ্য। যে কোন সভ্য এইসব বই বাড়ীতে নিয়ে যেতে পারতেন।

সভ্যজনদের মধ্যে ছিলেন কলকাতার সেরা সেরা নামী ও গুণী ব্যক্তি। রবীন্দ্রনাথ, গগনেন্দ্রনাথ ও অবনীন্দ্রনাথের কথা তো বলাই বাহুল্য, অন্যান্য সকলের নামও এখানে উল্লেখ করা সম্ভবপর নয়। কেবল স্বর্গীয় কয়েকজনের নাম বললেই সকলে সভ্যদের সম্বন্ধে একটা ধারণা করতে পারবে:

প্রমথ চৌধুরী, রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রিয়ম্বদা দেবী, সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, সমরেন্দ্রনাথ ঠাকুর, অজিতকুমার চক্রবর্ত্তী, সুকুমার রায়, সুরেন্দ্রনাথ মৈত্র, মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়, দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর, কিরণশঙ্কর রায়, সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ও গিরিজাকুমার বসু প্রভৃতি।

পুস্তকাগারের উপরেই ছিল সুদীর্ঘ হলঘর। সেখানে বসত মনীষীদের আসর। প্রায়ই শ্রোতা বা দর্শকদের সংখ্যা হ'ত দুইশতেরও বেশী। একদিকে বসতেন মহিলারা, আর একদিকে পুরুষরা। মাঝখানে বিরাজ করতেন মধ্যমণির মত স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ।

সেখানে হ'ত নাচ, গান, বাদ্যযন্ত্রবাদন, মঞ্চাভিনয়, যাত্রাভিনয়, নাটক, উপন্যাস, গল্প, কবিতা ও প্রবন্ধ পাঠ এবং সাহিত্য ও ললিতকলা নিয়ে অপূর্ব্ব আলোচনা। গায়ক, অভিনেতা, পাঠক ও আলোচকরূপে সব-চেয়ে বেশী দেখা দিতেন রবীন্দ্রনাথই। অবনীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত ও শ্রীবিধুশেখর শাস্ত্রী এবং অন্যান্য লেখকও আপন আপন রচনা পাঠ করতেন।

একপ্রান্তে ছবির মত সুন্দর ছোট্ট রঙ্গমঞ্চ তৈরি ক'রে সেখানে 'ডাকঘর' ও 'বৈকুণ্ঠের খাতা'র যে চমৎকার অভিনয় হয়েছিল, তাও অভাবনীয় ও অবিস্মরণীয়। তেমন উপভোগ্য অনুষ্ঠান এ জীবনে আর দেখবার আশা নেই।

'বিচিত্রা'র সম্পাদক ছিলেন শ্রীরথীন্দ্রনাথ ঠাকুর। সভ্যরূপে নির্ব্বাচিত হতেন বাছা বাছা লোক। সভ্যদের এক পয়সাও চাঁদা দিতে হ'ত না।

এক বৈকালে 'বিচিত্রা'র ঘরে ব'সে আছেন রবীন্দ্রনাথ, গগনেন্দ্রনাথ, সমরেন্দ্রনাথ, অবনীন্দ্রনাথ, চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়, সুকুমার রায় ও তাঁর অনুজ সুবিনয় রায়, সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এবং আরো কেউ কেউ।

রবীন্দ্রনাথ বললেন, "চল আমরা অন্য ঘরে যাই। আজ সুকুমার আর সুবিনয় আমাদের রামায়ণ-গান শোনাবেন।" আমরা গাত্রোত্থান ক'রে পুরাতন ঠাকুরবাড়ীর একটি ঘরে গিয়ে বসলুম।

হাসির কবিতা বা ছড়া রচনায় সুকুমার রায়ের মুন্সিয়ানা যে কত, সে খবর বাংলাদেশের ঘরে ঘরে গিয়ে পৌঁচেছে। সেদিনও সুকুমার রায় যা শোনালেন তাও হাসির রচনা এবং রচক ছিলেন তিনি নিজেই। সেদিন তাঁর আর একটি গুণেরও পরিচয় পাওয়া গেল। কৌতুকাভিনয়েও তিনি ওস্তাদ—অতিশয় ভারিক্কি লোকের গুরুগাম্ভীর্য্যও তিনি নস্যাৎ ক'রে দিতে পারতেন, নিজে একটুও না হেসে।

সকলেই জানেন, ভাবগভীর করুণ অভিনয়ে রবীন্দ্রনাথের কৃতিত্ব ছিল যে-কোন প্রথম শ্রেণীর অভিনেতার সঙ্গে তুলনীয়। রঙ্গমঞ্চের উপরে সাধারণতঃ তিনি গম্ভীর রসের ভূমিকাই গ্রহণ করতেন।

কিন্তু হাস্যরসেও তিনি বড় কম যেতেন না। তাঁর দৈনন্দিন কার্য্য, আলাপ-আলোচনাও ছিল হাস্যরসে সমুজ্জ্বল, কথায় কথায় ঝ'রে পড়ত তাঁর কৌতুকনির্ঝর। এবং কেবল কথায় নয়, সেই সঙ্গে দেখা যেত মৌখিক বা আঙ্গিক ভাবাভিনয়ও। সেদিনও তারই একটি প্রমাণ পাওয়া গেল।

সুকুমার রায়ের রামায়ণী কৌতুকনাট্যে একটি পংক্তি ছিল—

"ঐ আসে, ঐ আসে,
ঐ, ঐ, ঐ রে!"

রবীন্দ্রনাথ এই চরণটিকেই কাজে লাগালেন বিশেষ কৌশলে।

সেদিন পালা শেষ হবার পর চিত্তরোচক রসরচনার সঙ্গে তাল রাখবার জন্যেই যেন আসরে এনে রাখা হ'ল এক গামলা রসনারোচক রসগোল্লা। ঠাকুরবাড়ীতে মাঝে মাঝে এমনি মনের খোরাকের সঙ্গে দেহের খোরাকের ব্যবস্থা করবার জন্যে রবীন্দ্রনাথের আগ্রহ দেখা যেত। তিনি জানতেন, কেবল শুকনো কথায় চিঁড়ে ভেজে না।

১৩৪৩ সালের ২৫শে বৈশাখে পি. ই. এন ক্লাবের এক সভায় তিনি বলেছিলেন: "সাহিত্য-সেবকদের নিমন্ত্রণ ক'রে এনে পি. ই. এন ক্লাব যদি মাঝে মাঝে তাঁদের রচনা শোনাবার ও মেলামেশা করবার ব্যবস্থা করেন, তাহ'লে ভালো হয়। কিঞ্চিৎ আহারাদিরও ব্যবস্থা থাকলে এরকম অনুষ্ঠান মধুরতর হয়ে ওঠে।"

রসগোল্লার গামলা যে অবহেলিত হয়ে রইল না, সে কথা না বললেও চলে। এতক্ষণ মুখ চলছিল কেবল সানুজ সুকুমার রায়ের, এবারে মুখ চলতে লাগল অধিকাংশ শ্রোতার।

সকলের দক্ষিণ হস্ত যখন ঘন ঘন মুখবিবর ও গামলার মধ্যে আনাগোনা করতে ব্যস্ত, তখন গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুরের অন্বেষী চক্ষু এদিকে ওদিকে দৃষ্টিপাত ক'রে আবিষ্কার করতে পারলে না চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়কে।

তিনি ব'লে উঠলেন, "একি, চারুবাবু কোথায় গেলেন? তিনি যে রসগোল্লা ভালোবাসেন!"

আর সকলেরও চোখ আঁতিপাঁতি ক'রে খুঁজে দেখলে। কিন্তু চারুবাবু দৃশ্যমান নন।

অবনীন্দ্রনাথ খুঁৎ খুঁৎ ক'রে বললেন, "চারুবাবু রসগোল্লা খেলেন না, রস যে জমছে না!"

তারপর রসের গামলা যখন রসগোল্লাহীন হবার উপক্রম, রবীন্দ্রনাথ সহসা আসনের উপরে ঋজু ও উঁচু হয়ে উঠে ব'সে বাহু বাড়িয়ে দরজার দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ ক'রে সুকুমার-কথিত রামায়ণী ছড়ার জের টেনে এবং মুখে কপট ভয়ের ভাব ফুটিয়ে সুরে তারস্বরে আউড়ে গেলেন—

"ঐ আসে, ঐ আসে,
ঐ, ঐ, ঐ রে!"

দেখা গেল, এতক্ষণ পরে ঘরের দরজার কাছে আত্মপ্রকাশ করেছে চারুবাবুর হাসি-হাসি মুখ! রবীন্দ্রনাথ বললেন, "এস চারু, ব'সে যাও! বোধ হয় এখনো তোমার আশা আছে।" বলা বাহুল্য, শেষ পর্য্যন্ত হ'ল মধুরেণ সমাপয়েৎ।



এইবারে দ্বিতীয় ঠাকুরের একটি কাহিনী।

চলতি ভাষায় যাকে বলে, ব্যাং, কেতাবী ভাষায় তার নাম ভেক, মণ্ডূক ও দর্দ্দুর প্রভৃতি। কিন্তু ও-সব নামে কবিদের সাধ মেটে না, দর্দ্দুরকে আরো মোলায়েম ক'রে এনে তাঁরা সাদরে ডাকেন দাদুর বা দাদুরী ব'লে।

কবি বিদ্যাপতি বলেন—

"মত্ত দাদুরী, ডাকে ডাহুকী।"

রবীন্দ্রনাথ বলেন—

"ডাকিছে দাদুরী তমালকুঞ্জতিমিরে।"

ব্যাং ডাকে বর্ষাকালে। বাদলের সঙ্গে ব্যাঙের অচ্ছেদ্য সম্পর্ক, কবিরা তাই বর্ষাবর্ণনার একটা প্রধান অঙ্গ ব'লে মনে করেন ব্যাঙের ডাককে! কবিবর সত্যেন্দ্রনাথ দত্তও বলেছেন—

"ব্যাঙ্ ডাকে ওই গলাফুলো,
আকাশ গলেছে।"

অবনীন্দ্রনাথের বাড়ীর পিছনকার বাগানে ঝরছে ঝর-ঝর বর্ষার ঝরণা। আকাশে বাজে মেঘের বাজনা, বাতাসে ভাসে ভিজে মাটির সোঁদা গন্ধ, গাছের পাতায় পাতায় শোনা যায় টাপুর-টুপুর বৃষ্টিনূপুর, কিন্তু তবু জমে না বর্ষার সঙ্গীত! কেন জমে না সে রহস্য চট্ ক'রে ধ'রে ফেললেন অবনীন্দ্রনাথ। আরে, বাগানে নেই মত্ত দাদুরী, বর্ষার সঙ্গীত জমবে কেমন ক'রে?

বর্ষা জমাবার উপায় নির্ধারণ করতেও দেরি লাগল না, তৎক্ষণাৎ ভৃত্যদের উপরে হুকুম হ'ল—"ওরে, যেখান থেকে পারিস্ গোটাকয়েক ব্যাং ধ'রে এনে বাগানে ছেড়ে দে শীগ্‌গির!"

কাছাকাছি ছিল গোলদীঘি কি হেদুয়ার পুষ্করিণী, সহুরে ভেকদের সাধের বাসা! পাড়ে পাড়ে পালে পালে তারা মনের সুখে গলা ফুলিয়ে একসঙ্গে কণ্ঠসাধনায় নিযুক্ত ছিল, অকস্মাৎ বেয়ারার দল সেখানে হুড়মুড় ক'রে এসে প'ড়ে হামলা দিলে এবং চটপট তাদের ধ'রে টপাটপ পুরে ফেললে থলের ভিতরে! তারপর জোড়াসাঁকোয় ফিরে এসে তাদের বাগানের মাঝখানে ছেড়ে দিতে আর কতক্ষণ?

তারপর যখন 'গগনে গরজে মেঘ, ঘন বরষা', তখন বোঝা গেল ঠাকুরবাড়ীর বাগানে এসেও বাস্তুহারা ভেকগণ একটুও ব্যস্ত হয় নি, সবাই মস্ত মস্ত ওস্তাদের মত গলা ফুলিয়ে আকাশমুখো হয়ে অশ্রান্ত স্বরে জুড়ে দিয়েছে গ্যাঙর-গ্যাঙর তান!

অবনীন্দ্রনাথ ভারি আরাম পেলেন! তাঁর কানে বাজে বর্ষার পরিপূর্ণ ছন্দ, তাঁর প্রাণে জাগে বাদলের আসল আনন্দ!

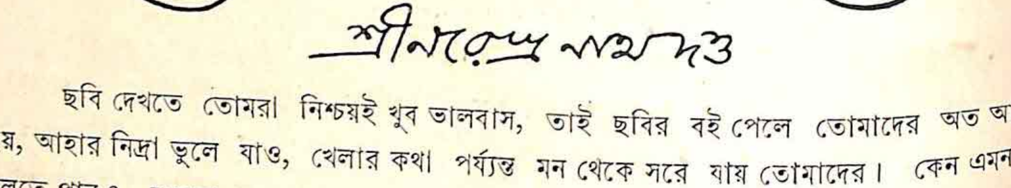
কিন্তু দিনের পর দিন একনাগাড়ে এই ভেক-কন্‌সার্ট শুনতে শুনতে বাড়ীর অন্যান্য লোকদের মনের অবস্থা হয়েছিল কেমন ধারা, আমাদের তা জানা নেই।

সহজে ছবি আঁকা



শ্রীনরেন্দ্র নাথ দত্ত

ছবি দেখতে তোমরা নিশ্চয়ই খুব ভালবাস, তাই ছবির বই পেলে তোমাদের অত আনন্দ হয়, আহার নিদ্রা ভুলে যাও, খেলার কথা পর্য্যন্ত মন থেকে সরে যায় তোমাদের। কেন এমন হয় বলতে পার ? অনেক সময় হয়ত বুঝতে পার না কিন্তু তোমাদের প্রত্যেকের মনেই তৈরী করার একটা স্বাভাবিক ঝোঁক আছে আর সৃষ্টির ইচ্ছা নিয়েই জীব পৃথিবীতে জন্ম নেয় তাই তোমরা তোমাদের কল্পনার জিনিষটিকে রূপ দিতে চেষ্টা কর ছবি এঁকে—কেউ চক দিয়ে, কেউ পেন্সিলে, কেউ দেয়ালে, শ্লেটে বা কাগজে। কল্পনার রূপ দিতে গিয়ে যখন নিজের অক্ষমতা অনুভব কর



তখনও নিরুৎসাহ না হয়ে ছবি আঁকার একটি সহজ সরল পথ খুঁজে বার কর তোমরা, তাই মাথার তেলে কাগজ ঘসে ভাল-লাগা ছবিটির উপরে রেখে ট্রেস্ কর। তাই না ?

ছবি আঁকা শেখা কম বেশী প্রত্যেকের জীবনেই বিশেষ প্রয়োজন। তোমরা হয়ত কথাটা শুনে ভাবছ যে ছবি আঁকার জন্য অভিভাবকরা মোটেই উৎসাহ দেন না বরং মন্দ বলেন সে কাজ আমি কেন করতে বলছি। ছবি তোমাদের আঁকতে বলছি বটে তবে লেখা পড়াটাও সমানতালে চালাতে হবে। লেখাপড়া না করলে বা না জানলে কল্পনাশক্তি বাড়ে না আর কল্পনা যার নাই চিত্র অঙ্কনে কোন দিনই উন্নতি করতে পারেনা সে, পড়াশুনা এতে বিশেষ প্রয়োজন। প্রতিদিন যেমন লেখাপড়া করবে তেমনি প্রতিদিন খানিকটা সময় ড্রইংও করবে। তোমাদের ক্লাশে মাটির কাজ, কাঠের কাজ, দরজির কাজ প্রভৃতি কারিগরী যে কোন বিদ্যায় ত বটেই, জ্যামিতি, ভূগোল, বিজ্ঞান, স্বাস্থ্য প্রভৃতিতেও চিত্র একান্ত প্রয়োজন।

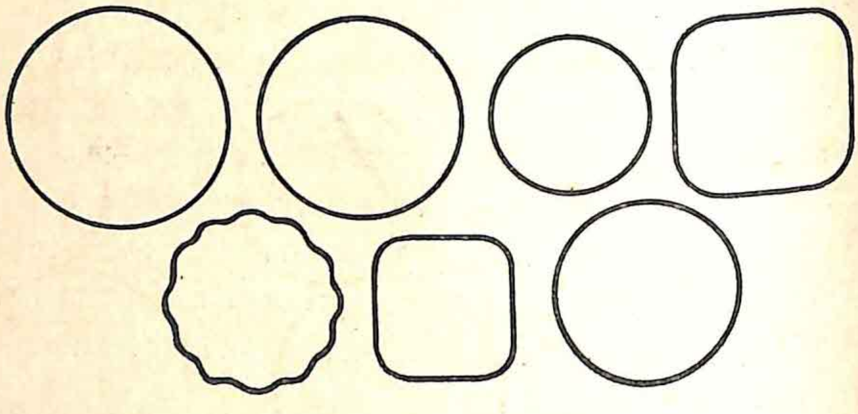
ভবিষ্যতে তোমরা সবাই যে শিল্পী হবে তা নয়। কেউ ডাক্তার, কেউ এঞ্জিনিয়ার, কেউ বৈজ্ঞানিক, কেউ শিক্ষক, কেউ ঐতিহাসিক আবার কেউবা হবে মস্তবড় কারিগর। কিন্তু মনে রেখো যে কাজই করোনা কেন ড্রইং বা আঁকা তোমাদের সব কিছুতেই দরকার হবে। তাই ছবি আঁকার কায়দাকানুনগুলো জানা থাকলে আর কখনও কোন অসুবিধায় পড়তে হবে না। আজকাল ভারত সরকার কারিগরী বিদ্যার উপর বিশেষ জোর দিয়েছেন আর বিদ্যালয়ের শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে সমানভাবে কারিগরী শিক্ষার ব্যবস্থা করেছেন। এই কারিগরী শিক্ষা করতে হলে চিত্র ছাড়া গতি নেই কারণ যে কোন জিনিষ তৈরী করতে হলে প্রথমে মনে মনে তার একটা রূপ কল্পনা করে নিতে হবে অর্থাৎ জিনিষটা দেখতে কত বড় হবে—কি তার রং হবে—কোন অঙ্গ তার কত ছোট বড় হবে—বসালে ঠিক থাকবে কি না—কি করলে দেখতে সুন্দর হবে—লোকের মন আকর্ষণ করবে ইত্যাদি অনেক বিষয় ভেবে তবে কাজে হাত দিতে হবে। হাতে কলমে গঠন করতে হলে প্রথমেই তার একটা নক্সা করে নিতে হবে। তার পরে তাতে রং লাগিয়ে তোমাদের কল্পনা অনুযায়ী ঐ জিনিষটির একটা পুরোপুরি ছবি এঁকে নেবে। তার পরে তাই দেখে আরম্ভ করবে তৈরীর কাজ। নয়ত সব গুলিয়ে যাবে আর কাজও হবে না।

যে এঞ্জিনিয়ার হাওড়ার পুল তৈরী করেছেন, যিনি টাটা কোম্পানীর বিশাল কারখানার পরিকল্পনা করেছেন। সৌন্দর্য্যের রাণী তাজমহল যার তৈরী, যিনি বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ সৌধ আমেরিকার স্কাই স্ক্র্যাপার তৈরী করেছেন তাঁদের সকলকেই সর্ব্বপ্রথমে পরিকল্পনার একটি সম্পূর্ণ নক্সা এঁকে নিতে হয়েছিল। ডাক্তারকে চিত্র এঁকে শরীরের ভেতরকার জিনিষগুলোর বিষয় শিক্ষা করতে হয় নয়ত শিক্ষা সম্পূর্ণ হওয়া অসম্ভব। রাসায়নিকের তো কথাই নাই—যে কোন বৈজ্ঞানিকের পক্ষে চিত্র অপরিহার্য্য, কারণ প্রতিনিয়ত তার সাধনার অগ্রগতির প্রতিটি স্তর চিত্রের সাহায্যে লিখে রেখে ধাপে ধাপে এগিয়ে যান তিনি। শিক্ষকের পক্ষে আঁকার প্রয়োজনীয়তা অত্যধিক। প্রাথমিক, মাধ্যমিক বা বিশ্ববিদ্যালয় সর্ব্বত্রই শিক্ষা ব্যাপারে চিত্রের একান্ত প্রয়োজন। তোমরা যারা শিক্ষক হবে—কোন প্রাকৃতিক বর্ণনা বা ভ্রমণবৃত্তান্ত অথবা কোন বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণকে রেখার সাহায্যে শিক্ষা দেবে দেখবে তোমাদের ছাত্ররা কত সহজে আনন্দের সঙ্গে সে পাঠ গ্রহণ করে। তোমরা হবে কৃতী শিক্ষক, জাতির স্রষ্টা। কোন প্রাচীন তথ্য আবিষ্কার করতে হলে ঐতিহাসিকদের তার গঠন বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে বিশেষ জ্ঞান থাকা দরকার। চিত্রাঙ্কনের দক্ষতা থাকলে তার পক্ষে ঐ সব অধ্যয়ন করা সহজ হয়।

পৃথিবীতে যে জাত যত বড় হয়েছে সৌন্দর্য্যবোধ তার তত বেশী। সৌন্দর্য্যবোধের মাপ কাঠিতেই জাতির বড় ছোট বিচার হয়। এই কথাগুলো এখন থেকেই তোমাদের ভাবতে হবে, তাই এত কথা বলছি।

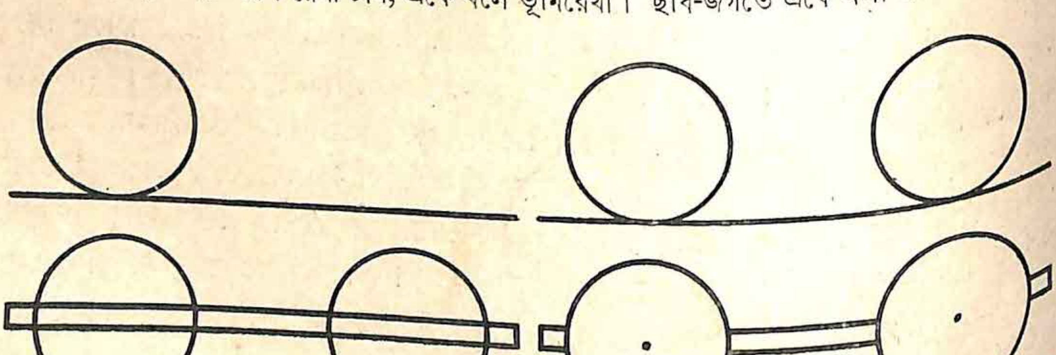
এখন ছবি আঁকা সম্বন্ধে কয়েকটি সহজ উপায় তোমাদের বলব—খুব মন দিয়ে শুনবে আর

সেই সঙ্গে নির্দ্দেশ অনুযায়ী নিজে আঁকতে চেষ্টা করবে, দেখবে কত সহজে ছবি আঁকা যায়। ছবির উপরে কাগজ রেখে তোমরা ট্রেস কর, এতে কোন দোষ নেই। অপরের ছবি ড্রইং বই দেখে নকল করাও প্রথম শিক্ষার্থীর পক্ষে বিশেষ প্রয়োজন, তবে তাতে ততটা আনন্দ পাওয়া যায় না যতটা পাওয়া যায় নিজের হাতে ছবি আঁকলে। অতি সাধারণ কয়েকটি জিনিষের সাহায্যে কত রকমের



ছবি আঁকা যায় দেখ। একটি টাকা, একটি আধুলি, একটি সিকি, একটি দু'আনি, একটি আনি, একটি দু-পয়সা, একটি পয়সা বাবার কাছ থেকে চেয়ে নাও। কাগজ, পেন্সিল আর রাবার যোগাড় কর।

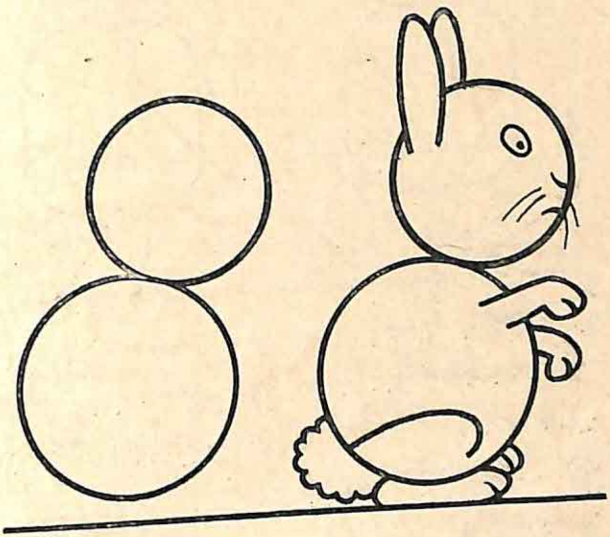
আমরা প্রথমে একটি গাড়ী আঁকব। কি করে হবে দেখ—কাগজের উপরে আড়াআড়ি ভাবে রুলের সাহায্যে একটি সরল রেখা টান, একে বলে ভূমিরেখা। ছবি-জগতে একে বলা হয় 'বেজ লাইন'।



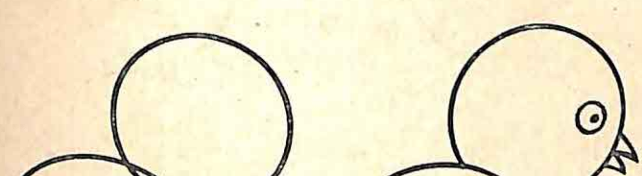
এই ধরনের আরও কতগুলো নাম তোমাদের শিখিয়ে দেব; নামগুলো মনে রেখো, পরে কাজে লাগবে। একটি পয়সা নাও পয়সাটিকে সরল রেখাটির উপরে গা ঘেঁসিয়ে কাগজের উপরে বাঁ হাতের একটি আঙ্গুল দিয়ে চেপে ধর, দেখ যেন নড়ে না যায়, পরে পেন্সিল দিয়ে পয়সাটির চারদিকে

দাগ দাও গাড়ীর একটি চাকা হল। কিছু দূরে যেমন ছবিতে দেখান আছে, আবার পয়সাটি ফেলে আর একটি বৃত্ত আঁক। এখন বৃত্ত দুটির মাঝ বরাবর দুটি রেখা আঁক পরে বৃত্তদুটির ভিতরের পেন্সিলের রেখাগুলো রাবার দিয়ে ঘসে তুলে ফেলে মাঝখানে দুটি ছোট বৃত্ত আঁক।

এস একটা খরগোস আঁকা যাক। প্রথমে ভূমি রেখা দাও, পরে রেখাটির একটু উপরে পূর্বের নিয়মে একটি টাকার বৃত্ত আঁক পরে ছবি দেখে ঐ বৃত্তের উপরে একটু ডানদিক্ হেলিয়ে আর একটি ছোট বৃত্ত কর পয়সা ফেলে। মোটামুটি ড্রইংটা ঠিক হল। এখন এর সঙ্গে কান, চোখ, নাক, মুখ গোঁফ, হাত, পা, লেজ জুড়ে দিলেই চমৎকার খরগোস হয়ে যাবে।



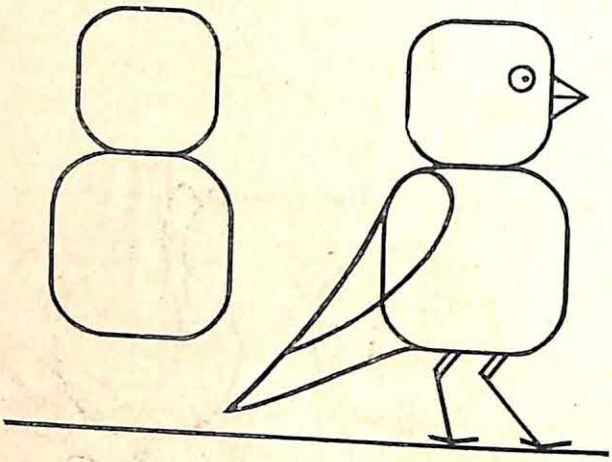
এবারে মোরগের ছানা কর—ভূমি রেখা টানো, সব সময়েই ভূমিরেখাটি প্রথম টেনে নিতে হয় তার পরে অন্য কাজ। ভূমি রেখার পরে কিছু উপরে আঁক একটি টাকার বৃত্ত, (ছবি দেখ), পরে ছোট বৃত্তটি পয়সা দিয়ে আঁকতে হবে। মোটামুটি ছবি দাঁড়িয়ে গেল। এখন ছোট ছোট অংশগুলো, যাকে বলা হয় 'ডিটেল্', জুড়ে দাও যেমন চোখ, ঠোঁট আর পা। পা দুটি খুব সাবধানে ছবিটি লক্ষ্য করে দিতে হবে। পায়ের উপর ঠিকমত দাড়াতে না পারলে যেমন সামনে পেছনে পড়ে যাও ছবিও ঠিক তেমনি সামনে পেছনে পড়ে যাচ্ছে মনে হবে। এই ভারসাম্যকে



ছবির ভাষায় বলা হয় 'ব্যালান্স'। কথাগুলে বুঝতে যদি না পার মুখস্ত করে রেখো। কেমন মোরগের ছানা হলত ?

এখন কি আঁকবে বল! একটা পাখী আঁকা যাক—ভূমি রেখা টান। কিছু উপরে একটি দুআনি

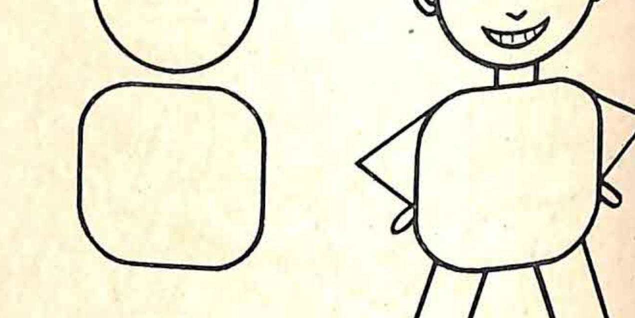
রেখে দাগ দাও, পরে উপরে একটি হু পয়সার দাগ টান। ছবি দাঁড়িয়ে গেল, এখন ডিটেল্ দাও—



চোখ, ঠোঁট, পাখা, পা। পা যেন ঠিক হয়।

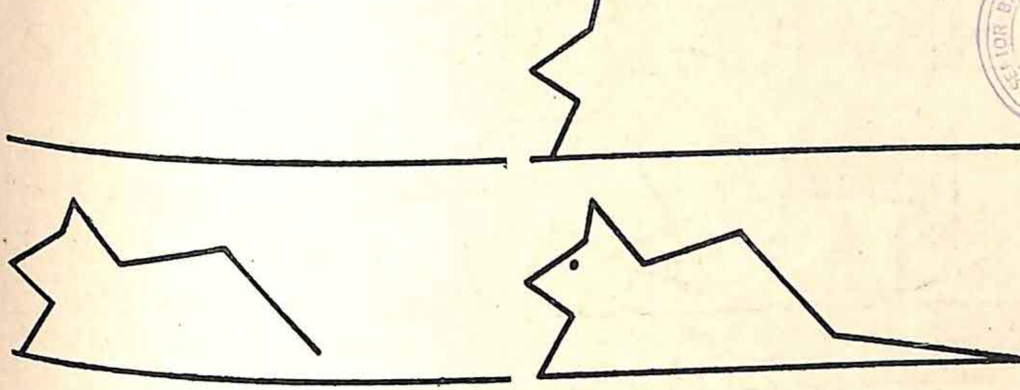
গাড়ী, পশু, পাখী হল। এবার মানুষের পালা—ভূমি রেখা টান, কিছু উপরে হু-আনির চৌকো আঁক তার একটু উপরে আঁক একটি সিকির বৃত্ত। এখন ডিটেল্ দাও —চুল, চোখ, মুখ, দাঁত, কান, গলা, হাত, পায়জামা, নাগরা জুতো। পায়জামার রেখাছুটি যেন মধ্য বিন্দুর সমান ছুদিকে থাকে। দেখ কেমন বীরের মত দাঁড়িয়ে আছে।

অনেকটা শিখে গেলে, এখন মুদ্রার সাহায্য ছাড়াই ছবি আঁকার চেষ্টা কর। সরলরেখা আর ফুটকি দিয়ে কত ছবি আঁকা যায় দেখ—ভূমিরেখা প্রথমেই চাই, পরে ঐ রেখার উপর কাত করে একটি 'দ'এর মত আঁক, ফুটকিটি যায়গামত বসাও। পরে কান থেকে আরম্ভ করে আর একটি কাত করা 'দ' বানাও, পরে পিঠের নীচ থেকে লেজ আরম্ভ করে ভূমিরেখার সঙ্গে মেশাও। দেখ কেমন একটি ইঁদুরের আকৃতি এসে গেল। এই সহজ রেখায় সমস্ত জিনিষটার একটা মোটামুটি আকৃতি তৈরী করাকে 'ব্লক' করা বলে। ভবিষ্যতে যখন তোমরা মস্ত বড় বড় জিনিষের ছবি আঁকবে তখন প্রথমেই তোমাদের



ব্লক করে নিতে হবে। মনে রেখো এর নির্ভুলতার উপরেই সমস্ত ছবিটি নির্ভর করে অর্থাৎ এইটি হচ্ছে চিত্রের কাঠামো। পরে ক্রমে তোমরা যত শিখবে এর উপরে ডিটেল দিয়ে দিয়ে সুন্দর একটি জ্যান্ত ইঁদুরে পরিণত করতে পারবে। এই রকম সরলরেখা দিয়ে আরও কত জিনিষ করা যায় দেখ। কতগুলো সরলরেখার নক্সা দিলাম ঐগুলো তোমরা শুধু হাতে বড়

করে স্লেটে বা কাগজে বা বোর্ডে আঁকার অভ্যেস কর, দেখবে অল্পদিনের মধ্যেই তুমি এক টানে একটি সরলরেখা টানতে পারছ।



সরল রেখা আর ফুটকি



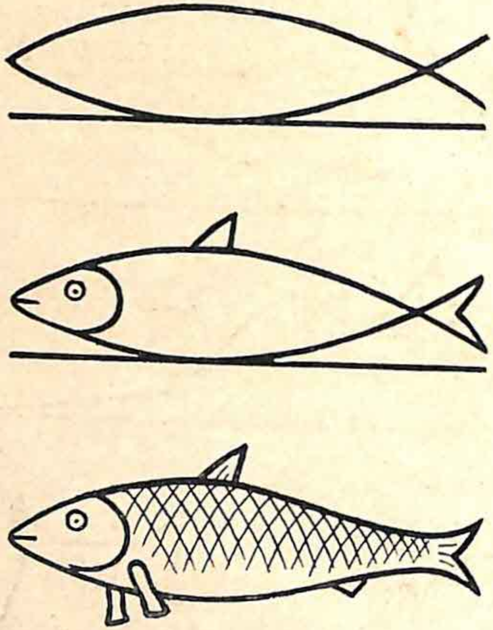
সরল রেখায় কত রকমের চিত্র



সরল রেখার নক্সা

মাছের ছবি কিন্তু আঁকা হয়নি—এবারে মাছের ছবি—এ ড্রইংটা কিন্তু কোন জিনিষ বা যন্ত্রের সাহায্য ছাড়াই করতে হবে। একে বলে 'ফ্রি হ্যাণ্ড ড্রইং'। এই ধরণের চিত্র যত বেশী আঁকবে সূক্ষ্ম নজর আর রেখার দৃঢ়তা তত বেশী বাড়বে। ভূমিরেখা দাও, পরে মাছের প্রধান রেখা দুটি আগে টেনে পরে কানকোর রেখা দিয়ে চোখ দাও, মোটামুটি মাছের আকৃতি এসে গেল এখন শরীরের অন্যান্য অংশগুলো ওর সঙ্গে জুড়ে দাও—দেখ যেন ঠিক হয়।

বাঁকা রেখার নানা ভঙ্গী মিলে কত সুন্দর সুন্দর নক্সা তৈরী হয় দেখ! এগুলো সর্ব্বদা অভ্যেস করলে রেখার গতি সহজ ও দৃঢ় হবে, সৌন্দর্য্যও বাড়বে। এই রেখার সহজ দৃঢ় গতিই হল রেখা চিত্রের প্রাণ।



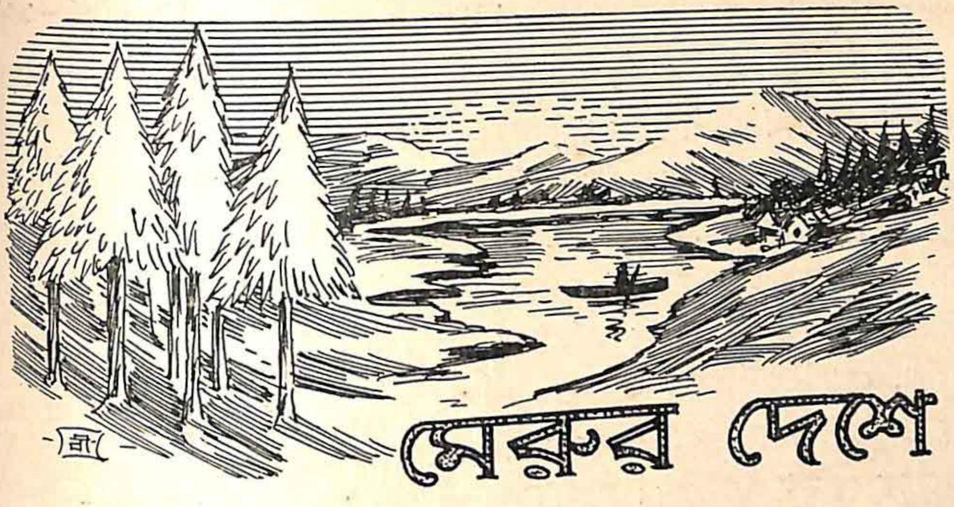
বাঁকা রেখা দিয়ে কত রকমের জিনিষ করা যায় দেখ। প্রথমে এগুলো দেখে দেখে নকল কর আর বিশেষ ভাবে লক্ষ্য কর কি পদ্ধতিতে ঐগুলো আঁকা হচ্ছে। কিছুদিন ছবি দেখে আঁকার পরে বস্তু দেখে আঁকবে। এই বস্তু দেখে ড্রইং করাকে বলা হয় 'মডেল ড্রইং'। বস্তু দেখে আঁকলে তোমাদের জ্ঞান অনেক বেড়ে যাবে, তখন কোন জিনিষের হুবহু ড্রইং করা আর কঠিন বলে মনে হবে না বরং নতুন নতুন সহজ পন্থা খুঁজে পাবে তোমরা। সফলতা আর তৃপ্তির আনন্দে মন হয়ে উঠবে ভরপুর। বস্তু দেখে ড্রইংএ যখন তোমাদের হাতটি বেশ পাকা হবে অর্থাৎ কি তার গঠন, কি তার রং তার আলো ছায়ার সম্পর্ক, তার



সাধারণ অবস্থান ভঙ্গী ইত্যাদি সম্বন্ধে যখন পুরোপুরি জ্ঞান হল তখন ঐ জিনিষগুলোই না দেখে



মন থেকে আঁকতে চেষ্টা করবে। এতে কল্পনাশক্তি বেড়ে যাবে, আর সেই সঙ্গে মনের বলও বেড়ে যাবে প্রচুর; যে কোন কল্পনাকে রূপ দেওয়া হবে তখন অতি সহজ।



মেরুর দেশে

(ভ্রমণ-কাহিনী)

রাধারাণী দেবী

ভারী সুন্দর দেশ ফিনল্যাণ্ড। পৃথিবীর একেবারে উত্তর প্রান্তে। উত্তর মেরুর সীমানার মধ্যে। আমরা মাস কয়েক আগে ওখানে গিয়েছিলুম। মেঘরাজ্যের উপর দিয়ে উড়ে চলেছিল আমাদের আকাশতরী। সেখান থেকে নিচের পৃথিবীকে দেখাচ্ছিল যেন আর-একটা অন্য কোনও অচেনা লোক। গাছপালা পাহাড় পর্বত মরুভূমি সমুদ্র শূন্যলোক থেকে দেখে মনে হয় সত্যিই রূপকথার দেশ দিয়ে চলেছি।

আমরা দিল্লীনগরে রাতের খাওয়া সেরে বিমান তরীতে উঠলুম। সারারাত ভাসলুম মেঘলোক ছাড়িয়ে আরও উঁচুতে শূন্যলোকে। সকালে শূন্য থেকে নেমে প্রাতর্ভোজন করলুম ইরাণ দেশে। মধ্যাহ্ন ভোজন করলুম ভূমধ্যসাগরের মধ্যে সুন্দর ফুলেফলে-ভরা সাইপ্রাস দ্বীপে, নৈশভোজন রোম নগরে। "সপ্ত-শিখরের শিরে চিরন্তনী রোমা মহীয়সী" Rome the eternal city.

আবার সারারাত ঘুমিয়ে রইলুম মেঘের উর্ধ্বে নীল আকাশের ঘন শূন্যে। যেখান থেকে বাতায়নে সারাদিন দৃষ্টি মেলে বসে থাকা আর বই পড়া ছাড়া অন্য কাজ নেই। নিচের পানে তাকালেই দেখা যায় সেই অলকাপুরী। যার ছবি কল্পনার রঙে এঁকেছিলেন কবি কালিদাস। অলকাপুরীই বটে! তবে, শুধু মণিময় স্তম্ভ, হংস ও পদ্মময় দীঘি আর রত্নখচিত প্রাসাদ মাত্র নয়, এই মেঘ-অলকার সৌন্দর্যে ভয়ঙ্করতাও যথেষ্ট। প্রাগৈতিহাসিক যুগের বিরাট বিরাট জন্তু জানোয়ারগুলো শুধু গুহার দেওয়ালের রেখায়, বইয়ের পাতায়

ছবিতে আর দেশে দেশে যাত্নঘরের কঙ্কালেই অবশিষ্ট আছে জানতুম, শূন্যলোক থেকে দেখতে পাওয়া গেল পৃথিবী থেকে পালিয়ে এসে তারা নিশ্চিন্তে এই মেঘলোকে নিজেদের কায়েমী করেচে। বিরাট অদ্ভুত কিম্ভুত চেহারা নিয়ে দৌড়োদৌড়ি করে ফিরচে সবাই।

স্ক্যাণ্ডিনেভিয়ার আকাশে মেঘের বৈচিত্র্যের অবধি নেই। তার রঙেরও যেমন সংখ্যা নেই, আকৃতি আর রূপেরও তেমনি শেষ নেই। মেঘের অরণ্য, মেঘের উত্তাল তরঙ্গময় সাগর, মেঘের বিপুল পর্বতশ্রেণী, বিরাট কৃষিক্ষেত্র, মিনার, প্রাসাদ, মেঘের নদীধারা, কোথাওবা অজস্র রেণু রেণু সোনার গুঁড়ো ছড়িয়ে আছে আকাশের বুক জুড়ে। মর্ত্য থেকে উর্ধ্বে তাকিয়ে আমরা মেঘের খণ্ডিত শোভামাত্রই দেখতে পাই। শূন্য থেকে এর দৃশ্য অন্য রকম। সারা বিশ্ব তখন দৃষ্টি থেকে অদৃশ্য।

সকালে এসে নামলুম হল্যাণ্ড দেশে প্রাতরাশ করতে। তারপর একেবারে ফিনল্যাণ্ডে অবতরণ। স্বপ্নের মতন সুন্দর দেশ ফিনল্যাণ্ড। সারাদিন ঝল্‌মলে রূপোলী রোদ্দুর। সারারাত্রি ঝক্‌ঝকে সোনালী রোদ্দুর। সূর্যিমামা সারাদিন আর সারারাত্তির সমানভাবে ঠায় আকাশ পাহারা দিচ্চেন সে দেশে। রাত হু'টোর সময় চোখে কড়া রোদ্দুর লেগে ঘুম ভেঙে গেলে চোখ মেলে ঘড়ির দিকে তাকিয়ে সময় ঠিক করে নিতে হয়। বাইরে আকাশের দিকে চেয়ে সময় আন্দাজ করার উপায় নেই।

চারিদিকে অজস্র হ্রদ আর দীঘি—ঝিল আর বিল। সবুজ সবুজ পাহাড় আর ক্ষুদে ক্ষুদে ফুল কাটা সবুজ সবুজ মাঠ। বার্চ্চবন আর পাইন বনের ঝালর ঝোলানা নীল নীল হ্রদগুলি ঠিক যেন ছবি। পাহাড় আর গ্রামগুলি রং দিয়ে আঁকা। গ্রামের বাড়ীগুলি যেন খেলনার রঙীন বাড়ী। তুলে এনে কাচের শো-কেসে সাজিয়ে রাখতে ইচ্ছে হয়।

এমন সুন্দর দেশে গিয়ে আমরা দেখতে পেলুম ওদেশের জাতীয়-মহোৎসব। সেদিন তারিখ ছিল ২৫শে জুন। এদিনটিকে ওরা বলে সূর্যি ঠাকুর আর ধ্বজা পূজোর দিন। বছরের মধ্যে সব চেয়ে লম্বা এই দিনটি। আমাদের দেশের দেওয়ালী উৎসবের মতনই এরা ২৫শে জুন সারারাত্রি ধরে বাজী পোড়ায় আর দীপমালা সাজিয়ে রোশ্‌নাই করে। এই দিনটিতে ওদের সারাদিন আর সারারাত্রি ধরে আনন্দ উৎসব। সমস্ত স্কুল কলেজের ছুটি। দোকান-পসার বন্ধ। আপিস কারখানার ছুটি, আদালত পোষ্টাফিসের ছুটি। সকাল থেকে গ্রামের কৃষক ছেলেমেয়ে বুড়োবুড়ীরা—বার্চ্চ গাছের শাখা ভেঙ্গে ভেঙ্গে নিয়ে চলেছে আপন আপন বাড়ীর দরজা সাজাতে। তাদের বিশ্বাস, বনদেবতার

দয়ায় তাদের চলার পথ মোলায়েম হবে আর গরুরা দুধ দেবে বেশী করে। পীস্‌পাইনের শাখা ওদেশে শান্তির প্রতীক।

এই দিনে সারা দেশে নাচ, গান, অভিনয়, উৎসব হতে থাকে। হেল্‌সিঙ্কী সহরে সমস্ত ট্রাম বাস্ মোটর এবং বাইসাইকেল্‌গুলিও বার্চ্চের শাখায় আর পাইনের শাখায় সুসজ্জিত হয়ে উৎসব ঘোষণা করতে থাকে। রোদ্দুর ঝলোমল্ সারারাত্রি চারিদিকে আগুন জ্বেলে হতে থাকে 'বন-ফায়ার'। আমাদের দেশে দোল-উৎসবের আগের রাত্রে চাঁচর-উৎসবের মতন। যতো হ্রদ আর দীঘির চরে এমন কি জলের উপরে নৌকোতেও বন-ফায়ার লাগায় ওরা। ঘড়িতে ঠিক রাত্রি বারোটা বাজলেই এই বন-ফায়ার শুরু হয়ে যায় সারা দেশ জুড়ে। পাহাড়ের চূড়োয় চূড়োয় জ্বলে ওঠে আগুন, হ্রদের বুকে জলের উপরে জ্বলে ওঠে আগুন, সমস্ত বনে জঙ্গলে সহরে গ্রামে পাড়ায় পাড়ায় ছেলে বুড়ো মেয়ে পুরুষ সবাই মিলে মহা উল্লাসে শুরু করে দেয় নাচগান। সমস্ত হ্রদে খালে বিলে আর সমুদ্রের খাঁড়িতে খাঁড়িতে পড়ে যায় বাইচ খেলার প্রতিযোগিতা। সে কী উত্তেজনা আর উল্লাস! নাচ গান, পান ভোজন, আনন্দ হৈ-হল্লায় সমস্ত দেশটা আনন্দে জীবন্ত হয়ে ওঠে। ওরা এই দিনটিকে 'সেণ্ট্ জন্‌স ডে'ও বলে থাকে। এই দিন প্রত্যেক বাড়ীতে বাড়ীতে নিশান ওড়ায় ঠিক রাত বারোটার সময়ে। পতাকা-উৎসব এর আর একটি নাম। মিড্‌নাইট্ সানের বা নিশীথ-সূর্যের দেশ ফিনল্যাণ্ড। দেশটি যেমন সুন্দর আর স্বপ্নময়, মানুষগুলিও তেমনি সরল সাদাসিদে।

এই দিন একটি দূর গ্রামে গ্রাম্য-উৎসব দেখতে গিয়ে আমরা একটি বিরাট উপত্যকার মধ্যে প্রকাণ্ড বল্‌গা হরিণ ছুটে পালাতে দেখেছিলুম। সমবেত জনতা সমস্বরে চেঁচিয়ে উঠলো—হের্‌র্ হের্‌র্ !! প্রকাণ্ড ডালপালা-শিং কালো মেঘের মত রং বিরাট হরিণ তড়্‌বড়্ করে ছুটে পালাচ্ছে দেখলুম।

উৎসব শেষে দেশের সমস্ত সুন্দরী কুমারী মেয়েরা উৎসবের ফুল নিয়ে দুই কাণে গুঁজে বাড়ী ফেরে। তাদের বিশ্বাস, এই দিনে উৎসবের ফুল পরলে তাদের সুখ-স্বপ্ন সফল হবে এবং নিজের মনের মত বরের সঙ্গে বিয়ে হবে। সেদিন বন-ফায়ারে যে-ক'টি কাঠ আধপোড়া থেকে যায়, অর্থাৎ ভালো করে জ্বলে না, ওরা মনে করে সে-বৎসরে ওদের দেশে সেই ক'টি সংখ্যার মেয়ে আইবুড়ো থেকে যাবে।



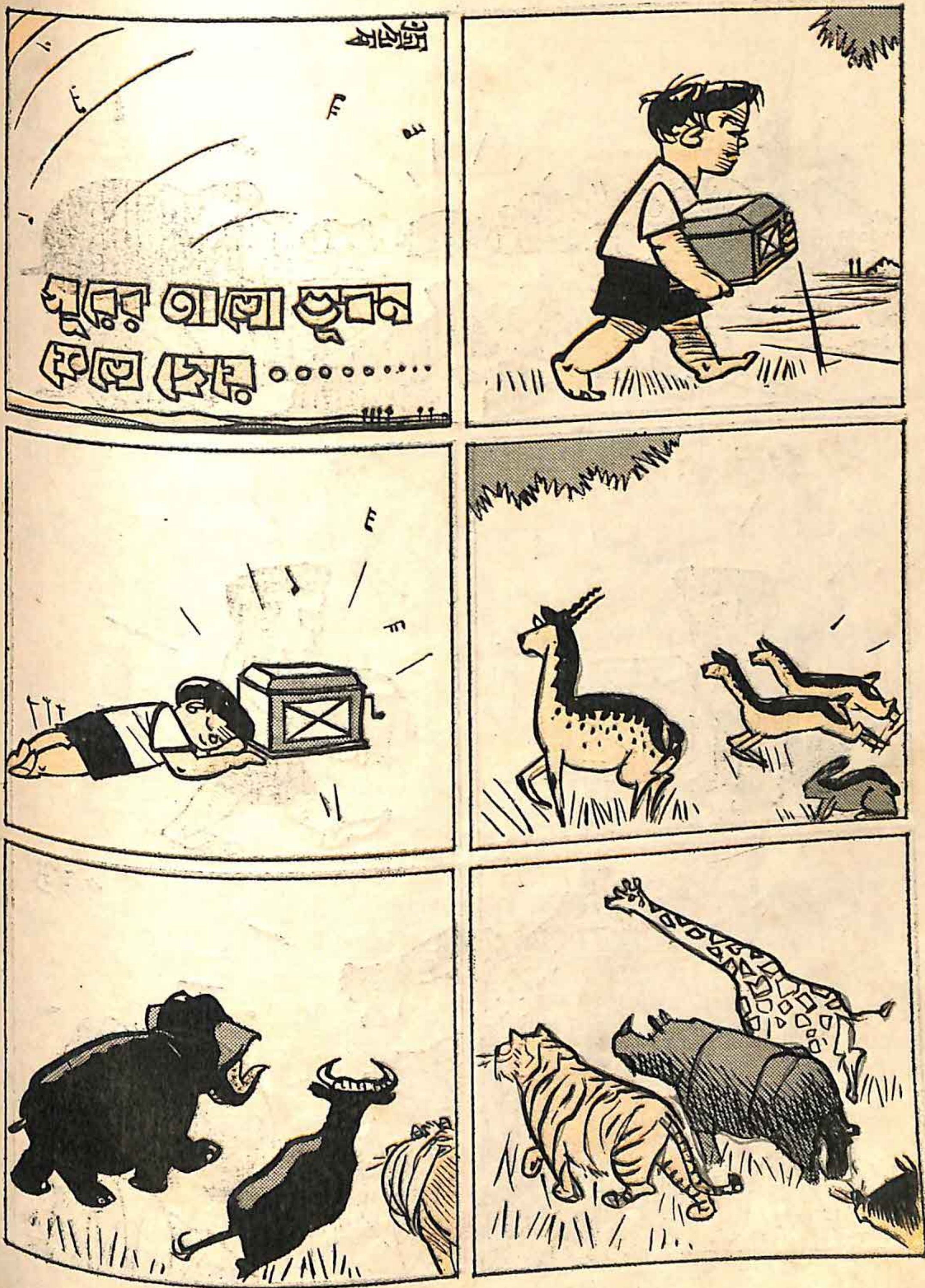
এ মহানগরী ছেড়ে

রণজিৎকুমার সেন

ঝিক্‌মিক্ করে লোনা জল আর চক্‌মক্ করে বন্দর,
তারই তীরে যদি ছোট একখানি বেঁধে তুলি কুঁড়ে ঘর,
বলো তো কেমন হয় ?
মাঝিদের সাথে, চাষীদের সাথে জলে ও কাদায় ঘুরে
সারাদিন যদি গান গেয়ে ফিরি মিঠে ভাটিয়াল সুরে,
মন্দ সে কিছু নয়।

না থাক্ সেখানে কুঠি ইমারৎ গাড়ী ঘোড়া রংদার,
আছে তো মাঠের আল্-পথ ঘিরে নীলাকাশ সন্ধ্যার,
থরে থরে কাঁচা ঘাস !
ঘরামীরা ব'সে ঘর বাঁধে আর তন্তুবায়েরা তাঁত,
হাঁসে ও মোরগে সেথা যে মিতালী সুখে দুখে দিনরাত,
সোনা ফলে বারো মাস।

মরা হৃদয়ের কান্নার পুরী এ মহানগরী ছেড়ে
মেঠো ধূলিপথে যেথায় রাখাল গোচারণ-পথে ফেরে
হাতে নিয়ে বাঁশীখানি :
সাধ জাগে সেথা চির জনমের বেঁধে তুলি ছোট ঘর,
না হোক্ নগর, আছে তো বিছানো একখানি বালুচর,
সেই তো স্বর্গ মানি ॥


সুরের তালে ভুবন
দোলে ……





ম্যাজিক

নন্দগোপাল সেনগুপ্ত

রসা রোডে হঠাৎ দেখা।

বছর পাঁচেক আগে যখন আমাদের বাড়ী আসতেন, তখন ওঁর চেহারা ছিল আরো জমকালো—চুলগুলো ছিল আরো ঘন এবং আরো মিশমিশে কালো। ইতিমধ্যে চেহারায় যেন অল্প একটু বয়সের ছাপ পড়েছে!

আমাকে দেখেই সোল্লাসে বলে উঠলেন, আরে অমল যে! আছিস কেমন?

আস্তেব্যস্তে প্রণাম করে বললাম, এমনি ত ভালোই আছি কাকাবাবু, কিন্তু সংসার প্রায় অচল হয়ে পড়েছে—একটা কাজ-কর্ম্ম না হলে আর চলছে না!

সহানুভূতি দেখিয়ে তিনি বললেন, তুই ত বি-এ পাশ করেছিলি, না? তা এতদিন কিছু না করে বসে আছিস?

বললাম, মেজোকাকার সঙ্গে তাঁর কারবারে বসছিলাম—হঠাৎ দুর্ঘটনায় তাঁর মৃত্যু হল, কারবারও বন্ধ হয়ে গেল!

ঘাড় নেড়ে বললেন, সে ত জানি সবই। বাস থেকে পড়ে গিয়েছিল, কোথায় যেন······

আসানসোলে!

হ্যাঁ—হ্যাঁ! আমি ঠিক সেই সময়ই রওনা হয়ে গেলাম কিনা ইউ-কে'তে, তাই আর খবর নিতে পারি নি। তারপর সারা ইউরোপ-আমেরিকা চষে, এই ত দিন তিনেক হল ফিরেছি!

এখন আপনি আছেন কোথায় কাকাবাবু?

আর কোথায় থাকবো বল? গ্র্যাণ্ডহোটেলে আছি। ক'দিন পরেই চলে যাবো আম্বালায়—বুঝতেই পারছিস, দেশ স্বাধীন হয়েছে, অথচ স্বাধীন দেশের ভার নিতে পারে এমন মানুষ বেশী গড়ে ওঠেনি। তাই আমরা যারা ক'জন আছি, গবর্ণমেণ্ট অব ইণ্ডিয়া তাদের ধরেই হর্দ্দম টানাটানি করছেন!

কেমন সঙ্কোচ বোধ হতে লাগলো। তবু সাহস করে বললাম, কপালের জোরেই আপনার সঙ্গে দেখা হয়ে গেল কাকাবাবু—আমাকে একটা চাকরি করে দিতেই হবে আপনাকে!

সস্নেহে পিঠে থাবা মেরে বললেন, সে ত দেওয়া কর্ত্তব্যই আমার। তোর কাকা ছিল আমার ঘনিষ্ঠ বন্ধু। কিন্তু কি জানিস? ছোটখাটো কাজ-কর্ম্ম কোথায় খালি হয়, সে খবর ত আমার কাছে পৌঁছায় না—খবর আনতে পারিস যদি, তাহলে অবশ্যই করে দিতে পারি। কারণ চেনা-শোনা বা খাতির ত একটু আছে সব মহলেই।

সঙ্গে সঙ্গে পকেট থেকে খবরের কাগজের কাটিং এক টুকরো বের করে, তুলে দিলাম তাঁর হাতে। বললাম, এই ইউনিভার্সেল এক্সচেঞ্জ কোম্পানী—এখানে আপার ডিভিসন ক্লার্ক নেবে একজন······

কাগজটার ওপর বার দুই চোখ বুলিয়ে বললেন, পিতু, মানে পীতাম্বর চৌধুরীর আফিস··· তাই বল!

চেনা আছে না কি?

চেনা মানে? আফিস গড়েই দিয়েছি ত ওর আমি। বাল্যবন্ধু, একসঙ্গে পড়া, একসঙ্গে খেলা—তোর কাকারই মতন আর কি!

আমি কৃতার্থ হয়ে বললাম, তাহলে একটু বলে দিন কাকাবাবু—মাইনে ভালো, শুনেছি ওখানে কাজ করেও নাকি সুখ আছে!

তিনি আর একবার পিঠে হাত বুলালেন। বললেন, এখন ত যাচ্ছি গবর্ণরের ওখানে—জানি না কেন ডেকেছেন তিনি। কাল যাবো তোর জন্যে—তা একটা দরখাস্ত······

টাইপ করা দরখাস্ত একটা পকেটেই ছিল—বের করে দিলাম।

তিনি সেটা নিয়েই ব্যস্তসমস্ত হয়ে একটা ট্যাক্সী ডাকলেন, গাড়ীতে উঠতে উঠতে বললেন,

নিশ্চিন্ত থাকিস—কাজ তোর করে দিয়ে তবে আমি আম্বালায় যাবো। পিতু আমার বিশেষ ভক্ত—সে তোকে না নিয়ে পারবে না।

ট্যাক্সী বেরিয়ে গেল। আমি কিন্তু সেই দিকেই বিমুগ্ধ চোখে তাকিয়ে রইলাম অনেকক্ষণ!

হঠাৎ দেখা ডাঃ মল্লিকের সঙ্গে, সঙ্গে সঙ্গে চাকরির হিল্লা! ভাগ্যের যোগাযোগ একেই বলে! মেজো কাকা বলতেন, ডাঃ মল্লিক হলেন যাদুকর—তাঁর কাছে অসম্ভব কিছু নেই! নিশ্চয় তাঁর যাদুদণ্ড আমার বরাতে সাফল্যের ফসল নিয়ে আসবে।

* * *

একে একে তিন মাস পার হয়ে গেল—চাকরি ত নয়ই, কোন সাড়াশব্দও এলো না ইউনিভার্সেল এক্সচেঞ্জ থেকে। ব্যাপার কি? গবর্ণমেণ্ট অব ইণ্ডিয়া পররাষ্ট্র দপ্তরের বেসরকারী এডভাইসার ডাঃ সঞ্জীবন মল্লিক এম-এ, ডি-লিট, এফ-সি-এস স্বয়ং দরখাস্ত নিয়ে গেছেন—তার ওপর পিতু, মানে পীতাম্বর চৌধুরী তাঁর ছোট বেলার বন্ধু, অফিসই গড়ে দিয়েছেন তাঁর স্বয়ং ডাঃ মল্লিক!

ঠিক করলাম গ্র্যাণ্ডহোটেলে গিয়ে একটু খোঁজ নোব—এখন কোথায় আছেন কাকাবাবু, আম্বালায়, না দিল্লীতে, না আর কোথাও? তারপর চিঠি দোব। অত বড় কাজের লোক, তাঁর কি আর এই সব সামান্য ঘটনা মনে থাকে? কিংবা সাহস করে একদিন ইউনিভার্সেল এক্সচেঞ্জেই যাবো?

সকাল বেলা বসে বসে ভাবছি, এমন সময় দোরে একখানা দামী মোটর দাঁড়ালো এবং তার ভেতর থেকে বেরিয়ে, বিলেতি পোষাক পরা এক হোমরা চোমরা ভদ্রলোক এসে উঠলেন আমাদেরই বাড়ীর রোয়াকে। তারপর কড়া নেড়ে আস্তে আস্তে ডাকলেন, অমলেন্দুবাবু আছেন?

বিস্ময়ে হতভম্ব হয়ে দোর খুলে দিলাম।

আমাকে দেখে ভদ্রলোক বললেন, অমলেন্দু বাবু আছেন?

আমি সবিনয়ে জানালাম, আমারি নাম অমলেন্দু।

তিনি বললেন, আপনি কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়েছিলেন ময়দানে কারুর একটা পেন কুড়িয়ে পেয়েছেন বলে? আমারও একটা পেন হারিয়েছে ঐ ময়দানেই, তাই খোঁজ করতে এসেছি—আমারটাই কি না!

ভদ্রলোককে ঘরে এনে বসালাম।

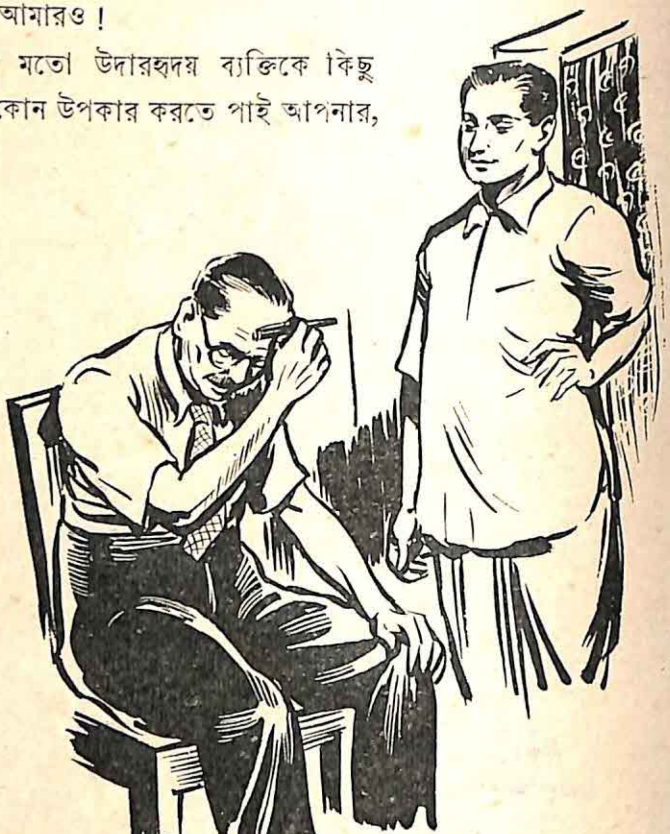
তিনি বললেন, হলদে রঙের পুরানো মডেল পার্কার ডুওফোল্ড—ক্লিপটা একটু ঢিলে, হোল্ডারের গায়ে খোদাই করে একটা 'এম' লেখা আছে! মনু—আমার ডাক-নাম।

আর বলতে হল না, বুঝলাম কলমটা এঁরই। সুটকেশ থেকে বের করে তাঁর হাতে দিয়ে দিলাম।

কলমটি পেয়েই তিনি কপালে ঠেকালেন, তারপর কৃতজ্ঞতায় কাঁদো কাঁদো হয়ে বললেন, অমলেন্দুবাবু, আপনার কাছে আমি চিরঋণী হয়ে রইলাম। এই কলম আমাকে দিয়েছিলেন আমার মা—যেদিন আমি বিলেত যাই। ফিরে এসে আর দেখা হয়নি মার সঙ্গে—এই কলমটা কাছে থাকলে তাই আমার মনে হয়, যেন মা'র আশীর্বাদ সঙ্গে সঙ্গে চলেছে আমার। এটা হারিয়ে ক'দিন কি দুঃখেই যে ছিলাম।

এই মাতৃভক্ত প্রবীণ ভদ্রলোকের কথায় অভিভূত হয়ে গেলাম আমি। কারণ হতভাগ্য বেকার হলেও, মায়ের ওপরে অসীম টান যে আমারও!

ভদ্রলোক বললেন, আপনার মতো উদারহৃদয় ব্যক্তিকে কিছু বলতেই লজ্জা করছে—তবু যদি কোন উপকার করতে পাই আপনার, তাহলে···



বললাম, আপনার হারানো কলম আপনাকে পৌঁছে দিতে পেরেই আমি সুখী—এর ভেতর উদারতার কিছু নেই। তবে বেকার গ্র্যাজুয়েট, অন্নকষ্টে আছি—খেটে খাবার মতো একটা কাজ যদি দয়া করে করে দেন আমাকে···

নিশ্চয়, নিশ্চয়, আজই বিকাল চারটায় আসুন আমার অফিসে—পি. চৌধুরী, ডিরেক্টর, ইউনিভার্সেল এক্স-চেঞ্জ—১২ নম্বর পার্ক স্ট্রীট, দো-তলায়।

চমকে উঠলাম। পি. চৌধুরী, ইউনিভার্সেল এক্সচেঞ্জে? এইবার দ্বিতীয়বার ভাগ্যের যোগাযোগ—এবার আর বরাত না খুলে যায় না!

সত্যি সত্যি চাকরি হল। আপার ডিভিসন ক্লার্ক—মাইনে ও ভাতায় প্রাপ্যের পরিমাণ মন্দ নয়।

মিঃ চৌধুরী বললেন, প্রায় তিন মাস ধরে পোষ্টটা খালি রয়েছে—ঠিক পছন্দ মতো লোক মেলেনি। বুঝতে পারছি, আপনার জন্যেই ছিল!

সশ্রদ্ধ বিনয়ে বললাম, আজ্ঞে, এই পোষ্টের জন্যে দরখাস্ত করেছিলাম আগেই বিজ্ঞাপন দেখে!

তাই নাকি?

আজ্ঞে, আপনার বাল্যবন্ধু ডাঃ মল্লিক···

ডাঃ মল্লিক?

হ্যাঁ, সঞ্জীবন মল্লিক, এম-এ, ডি-লিট, এফ-সি-এস···

কপাল কুঁচকে বললেন মিঃ চৌধুরী, ঠিক ত মনে করতে পারছি না! নিশ্চয় আছেন কোন বন্ধু—এখন স্মরণ হচ্ছে না। যাই হক, বলুন···



বললাম, আমার দরখাস্ত তিনি নিজে জমা করে দিয়ে গেছেন—বলেছিলেন, কাজ আমার হবেই, তাঁর কথা আপনি না রেখে পারবেন না! আপনার অফিস তিনিই আর্গানাইজ করে দিয়েছিলেন···

তবে কি বীরু? জানি না তার আসল নাম সঞ্জীবন কি না! বন্ধু-বান্ধবদের পোষাকী নাম আবার সব সময় জানা থাকে না। আচ্ছা দাঁড়ান, খোঁজ নিচ্ছি!

চাকরিপ্রার্থীদের দরখাস্তের ফাইল চেয়ে পাঠালেন তিনি!

একের পর এক আবেদনপত্র উল্টে যাচ্ছেন তিনি—টেবিলের বিপরীত দিক থেকে আমি শুধু তাকিয়ে দেখছি।

হঠাৎ একখানা হাতে লেখা দরখাস্তের ওপরে থেমে দাঁড়ালেন তিনি। বললেন, কি বললেন, সঞ্জীবন মল্লিক?

আজ্ঞে হ্যাঁ।

তিনি ত আর কারুকে রেকমেণ্ড করেন নি, নিজেই প্রার্থী হয়েছেন এই পদের জন্যে। লিখেছেন, তিনি আণ্ডার গ্র্যাজুয়েট হলেও ভালো ইংরেজী জানেন, টাইপও শিখে নিতে পারবেন! একখানা সার্টিফিকেটও এই সঙ্গে দিয়েছেন আমার বন্ধু গৌরহরি মিত্র এডভোকেটের।

এডভোকেট মিত্র আমার ছোট কাকার বন্ধু—ছোট কাকা হচ্ছেন সাহিত্যিক জ্ঞানানন্দ রায়।

তাই নাকি? তবে ত তুমি আমার ঘরের ছেলে হে। জ্ঞান, গৌর আর আমি—আমরা হলাম বিদ্যাসাগর কলেজের তিন মূর্ত্তি, সবাই বলতো থ্রি মাস্কেটিয়ার্স!

সদ্য চাকরি লাভের আনন্দে ডগমগ হয়ে নেমে এলাম। দরজার কাছেই বিস্ময়করভাবে দাঁড়িয়ে আছেন আর কেউ নয় স্বয়ং ডাঃ মল্লিক।

প্রণাম করে বললাম, চাকরিটা হল কাকাবাবু,—প্রায় দুশো পঁয়ত্রিশ মতো পাওনা।

হবেই ত, হবেই ত, পিতু আমার ছেলেবেলার বন্ধু—আমার কথা কি সে ফেলতে পারে? আচ্ছা চলি রে! বলতে বলতেই লিফ্‌টে ঢুকে পড়লেন তিনি। তারপরেই হুস করে ওপরে উঠে গেলেন। কর্ম্মব্যস্ত লোক!

রাজপুত্র

—আনন্দ বাগচী

সমুদ্দুর কতোদূর, রাজপুত্র বাংলাদেশে ব'সে
বই প'ড়ে ম্যাপ দেখে, কাগজেকলমে অঙ্ক ক'ষে
হিসেব মেলায় তার, রাত্রি আসে রাত্রি চ'লে যায়
উঠোনের আতা গাছে কাক ডাকে, বিকেল ঘনায়।
ডুবো পাহাড়ের গুহা আলো ক'রে মাণিক্যের খাটে
রাজকন্যা নিদ্রা যায় সমুদ্রের অতল তল্লাটে।
এদিকে অবাক কাণ্ড, রাজপুত্র দিগ্বিজয় ক'রে
সোনার কাঠিটা ছুঁয়ে চমকে জাগে চোখমোছা ভোরে।
মন্ত্রী সান্ত্রী কেউ নেই, স্বপ্নে পাওয়া পক্ষীরাজ ঘোড়া।
হঠাৎ ঘুমের শেষে কখন হয়েছে পংগু, খোঁড়া।
সমুদ্দুর কতদূর কি হবে সে কথা জেনে ফেলে
আমাদের রাজপুত্র আসলে যে গরীবের ছেলে॥



নাটকের ভেতর নাটক

শ্রীপরিতোষকুমার চন্দ্র

সহরে সহরে ঘুরে নাটকাভিনয় দেখাতে দেখাতে ভ্রাম্যমাণ 'বীণা থিয়েটার' অবশেষে চন্দ্রগড় সহরে এসে আড্ডা গেড়েছে। এখানেও তারা কয়েক রাত অভিনয় দেখাবে। স্থানীয় রঙ্গমঞ্চ 'আর্যনাট্যমন্দির' ভাড়া নিয়ে তারা ইতিমধ্যেই ক'রাত বিভিন্ন নাটকের অভিনয় করেছে।

থিয়েটার হয় রাত্রে, তাই রঙ্গমঞ্চের জোর আলোর ব্যবস্থা কোরতে হয়। চন্দ্রগড়ে তখনও বিজলী আলোর চলন হয়নি। সহরের রাস্তায় যে সব আলো জ্বলে তা গ্যাসের এবং তা স্থানীয় মিউনিসিপ্যালিটির অর্থাৎ পৌরসভার কর্তৃত্বাধীনে।

বীণা থিয়েটারের ম্যানেজার অন্য কোনো রকম আলোর ব্যবস্থা কোরতে না পেরে মিউনিসিপ্যালিটির সঙ্গেই বন্দোবস্ত কোরে রঙ্গমঞ্চে গ্যাসের আলোর ব্যবস্থা কোরেছে। ভ্রাম্যমাণ থিয়েটার দল, লাভ হোলেই থাকবে,—আর লাভ না হোলেই কোন্ সময়ে হয়তো হাওয়া হোয়ে যাবে,—মানে পালিয়ে যাবে। তখন টাকা আদায় ব্যাপারটা বিশ হাত জলের তলায় চলে যাবে। তাই মিউনিসিপ্যালিটির সঙ্গে থিয়েটার কোম্পানীর এই শর্ত হোয়েছে যে, প্রত্যেক অভিনয়-রাত্রে টিকিট বিক্রী শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গেই দৈনিক গ্যাসের ভাড়া মিটিয়ে দিতে হবে।

এই সর্ত অনুযায়ী প্রথম ছ'রাতের গ্যাসের ভাড়া ঠিক মতো পাওয়া গেছে, কিন্তু তারপরে আর একটা পয়সাও আদায় হয়নি। ছদিন ধরে মিউনিসিপ্যালিটির লোক যথাসময়ে এসে ভাড়ার জন্য তাগাদা দিয়েছে, কিন্তু 'আজ ভালো বিক্রী হয়নি', 'আজ একটা বিশেষ জরুরী খরচ কোরতে হোয়েছে', ইত্যাদি নানা রকমের অজুহাত শুনে তাকে ফিরে যেতে হোয়েছে, ভাড়া আদায় না কোরেই।

এইভাবে পর পর ছ'রাতের ভাড়া না পাবার পর তৃতীয় রাতেও যখন মিউনিসিপ্যালিটির লোক খালি হাতে ফিরে এলো তখন গ্যাসবিভাগের কর্তৃপক্ষ বিশেষ চিন্তিত হোয়ে পড়লেন। এবারে একটা কিছু করতেই হয়, তা না হোলে ওপরওলার কাছে তাঁকে নাস্তানাবুদ হোতে হবে। অনেকক্ষণ চিন্তার পর তিনি গ্যাসবিভাগের হেডমিস্ত্রীকে ডেকে গোপনে একটা উপদেশ দিয়ে তাকে তখনই থিয়েটারের ম্যানেজারের সঙ্গে দেখা কোরতে বল্লেন।

তখন অভিনয় বেশ জমে উঠেছে। প্রথম অঙ্ক শেষ হোয়ে দ্বিতীয় অঙ্ক আরম্ভ হোয়েছে। এমন সময় যন্ত্রপাতির ব্যাগ হাতে ঝুলিয়ে হেডমিস্ত্রী রঙ্গমঞ্চের টিকিট ঘরে এসে উপস্থিত হোলো। সেখানে কেউ নেই। যে ছিল সে টিকিট বিক্রী শেষ কোরে ভেতরে চলে গেছে।

মিস্ত্রী তখন রঙ্গমঞ্চের পেছনে ষ্টেজে ঢোকবার দরোজাতে গিয়ে হাজির হোলো। সেখানে তখন মিশর দেশের ম্যমীর মতো শুঁটকো একটা লোক একটা টুলের ওপর বসে বিড়ি ফুঁকছিল। তার পরনে ময়লা কাপড় ও গায়ে হাতকাটা ছিটের কাপড়ের ফতুয়া। তার কাছে খোঁজ নিয়ে মিস্ত্রী জানলো যে, তিনি খোদ ম্যানেজারের খাস ভৃত্য, নাম গণেশ। পরিচয়ে আপ্যায়িত হোয়ে মিস্ত্রী তাকে জিজ্ঞাসা কোরল: তোমার মনিব, মানে ম্যানেজার সাহেব কোথায় হে?



প্রশ্ন শুনেই লোকটা তার বাঁ হাতটা চোখের সামনে তুলে ধরলো। মিস্ত্রী অবাক্, তার হাতেও একটা রিষ্টওয়াচ, অর্থাৎ হাতঘড়ি। সামান্য চাকরের হাতে ঘড়ি! মিস্ত্রী ভাবলো, আশ্চর্যের কি? খোদ ম্যানেজারের যখন খাসভৃত্য।

যাহোক্, গণেশ ঘড়ি দেখে বিড় বিড় কোরে কি একটা হিসাব কোরে বললো: ম্যানেজারবাবু এখন ষ্টেজে।

লোকটার কাছে আর একটু এগিয়ে এসে মিস্ত্রী বললো: তোমার ম্যানেজার সাহেবকে বলো যে, গ্যাসের মিস্ত্রী এসেছে। তিনি যেন এখুনি আমার সঙ্গে দেখা করেন। তুমি তাঁকে খবর দাও।

সামান্য একটা মিস্ত্রী, কিন্তু হুকুম করছে যেন লাটসাহেব। লোকটা বিরক্তি চেপে বললো: আরে মশাই, তিনি এখন ষ্টেজের ওপরে এ্যাক্টো কোরছেন। এখন তিনি কি কোরে আপনার সঙ্গে দেখা কোরবেন? আধঘণ্টা অপেক্ষা করুন, তিনি ষ্টেজ থেকে বেরুলেই খবর দেবো।

তার কথা ন্যায্য হোলেও মিস্ত্রী কিন্তু তা গ্রাহ্যের মধ্যে আনলো না। বেশ গম্ভীরভাবে মিস্ত্রী বললো : আমি এক মুহূর্ত অপেক্ষা কোরতে পারবো না। তুমি তাঁকে শীঘ্র ডেকে আনো।

লোকটা তখন মিস্ত্রীকে বোঝাতে সুরু কোরলো যে, অভিনয় কোরতে ষ্টেজে নেমে মাঝপথে বেরিয়ে আসা যায় না, তাতে অভিনয় নষ্ট হয় এবং দর্শকরা ক্ষেপে যায়, তখন সে এক যাচ্ছেতাই ব্যাপার হয়।

মিস্ত্রী কিন্তু তার কোনো কথাই কানে তুললো না। সে এখুনি ম্যানেজারের সঙ্গে দেখা কোরতে চায়, তাতে থিয়েটার নষ্টই হোক্ বা ভেঙ্গেই যাক্। এইভাবে বেশ কিছুক্ষণ কথা কাটাকাটির পর মিস্ত্রী রেগে গেলো এবং বেশ জোর দিয়ে কেটে কেটে তাকে বললো : আভি ম্যানেজারকো বোলাও। তিনি যদি এখুনি এসে কদিনের গ্যাসের ভাড়া মিটিয়ে না দেন, তবে আমি গ্যাসের পাইপ কেটে দিয়ে যাবো। আমার ওপর আমার ওপরওলার এই হুকুম।

এই ব্রহ্মাস্ত্রের ঘায়ে লোকটা একেবারে চুপসে গেলো। সে হাত জোড় কোরে মিস্ত্রীকে অনুরোধ করলো পাঁচমিনিট অপেক্ষা কোরতে। তারপরেই ভেতরে চলে গেলো। সেখানে গিয়ে খোঁজ নিয়ে জানলো, যে দৃশ্যে ম্যানেজার ষ্টেজে নেমেছেন তা শেষ হোতে এখনও কুড়ি পঁচিশ মিনিট লাগবে। অথচ সে মিস্ত্রীকে স্রেফ পাঁচমিনিট অপেক্ষা কোরতে বলে এসেছে। কিন্তু এখন কি কোরে সে ষ্টেজে অভিনয়রত ম্যানেজারকে মিস্ত্রীর হুমকির কথা জানাবে? ভাবতে ভাবতে হঠাৎ তার মাথায় একটা বুদ্ধি এসে গেলো।

অভিনেতা না হোলেও গণেশ থিয়েটার দলেরই লোক। দলের সঙ্গে বছরের পর বছর ঘুরে ঘুরে এবং রাতের পর রাত অভিনয় দেখে দেখে অভিনয় ব্যাপারটা তার বেশ সড়গড় হোয়ে গিয়েছিল। প্রয়োজন হোলে মাঝে মাঝে তাকে ছোট খাটো পার্টে ষ্টেজে নামতেও হোতো। তাই আনাড়ি লোকের মতো তার ষ্টেজ-ভীতি ছিল না।

সে চট্ কোরে সাজঘরে ঢুকে পড়লো এবং কাউকে কিছু না বলে চট্পট্ এক হিন্দু-সৈনিকের পোষাক পরে নিলো। তারপর মাথায় একটা পরচুল চাপিয়ে তার ওপরে পাগড়ী বেঁধে ও কোমরে একটা তরোয়াল ঝুলিয়ে সটান ষ্টেজের উইংসের পাশে এসে দাঁড়ালো।

সে রাত্রে যে নাটকের অভিনয় হোচ্ছিল তার নাম "দেবাসুর"। অসুররা দেবতাদের হারিয়ে স্বর্গরাজ্য দখল কোরেছে এবং বাৎসরিক কর দেবার শর্তে দেবতাদের হাতেই রাজ্য পরিচালনার ভার দিয়ে অসুররা নাক ডাকিয়ে ঘুমুচ্ছে। ম্যানেজারই ইন্দ্রের পার্ট নিয়েছেন। সেই দৃশ্যে তিনি তখন ষ্টেজে বসে বিষণ্ণবদনে দেবসেনাপতি কার্তিকের সঙ্গে গোপনে পরামর্শ কোরছেন কি কোরে অসুরদের হারিয়ে স্বর্গরাজ্য পুনরুদ্ধার করা যায়। নাটকের নির্দেশ অনুযায়ী সে সময়ে অন্য কারো ষ্টেজে ঢোকবার কথা নয়। কিন্তু আমাদের গণেশ কাউকে কিছু না বলে সটান ষ্টেজে ঢুকে পড়লো

এবং কায়দা মাফিক দেবরাজকে প্রণাম জানিয়ে রঙ্গমঞ্চের পেছনের দরোজাতে যেখানে মিস্ত্রী দাঁড়িয়ে আছে সেই দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ কোরে বলে উঠলো :

দেবরাজ, অপরাধ নাহি লহ মোর।
দৈত্যরাজ কার লাগি পাঠায়েছে দূত।
প্রাসাদতোরণে তারে অপেক্ষিতে বলি সত্বর এসেছি হেথা।
কর ত্বরা প্রভু, নচেৎ অমরাবতীর নিভিবে আলোক।

অমরাবতীর আলো নেভাবার কথা বলবার সময় সে হাত উঁচু কোরে তুলে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে রঙ্গমঞ্চের সব কটা আলো দেখিয়ে দিতে ভুললো না। সে এই ভাবে তার মনিবকে বোঝাতে চাইলো যে, গ্যাসের ভাড়া নেবার জন্য পেছনের দরোজায় লোক দাঁড়িয়ে আছে। এখুনি ভাড়া না পেলে গ্যাসের পাইপ কেটে আলো নিভিয়ে দেবার ভয় দেখিয়েছে। যা করবার হয় শীঘ্র করো।

এই রকম হঠাৎ তার ষ্টেজে ঢোকাটাকে দর্শকদের কেউই একটা অসঙ্গত ব্যাপার বলে ধরতে পারলো না। তারা মনে কোরলো দেবসেনার এই প্রবেশও নাটকের একটা অঙ্গ। তার ওপরে নাটকটা অমিত্রাক্ষর ছন্দে লেখা। দেবসেনাটিও যখন অমিত্রাক্ষর ছন্দে কথা বলেছে তখন সব ঠিক আছে।

এদিকে কিন্তু তার আকস্মিক প্রবেশে ইন্দ্ররূপী ম্যানেজার প্রথমটা বেশ একটু চমকে গিয়েছিল— এ আবার কোথা থেকে এলো? তারপর এ্যাক্টোর ভেতর দিয়ে তার বক্তব্য শুনে এবং সেই সঙ্গে আলো নেভাবার ইশারা দেখে সে ব্যাপারটা সবই বুঝতে পারলো।

ইন্দ্র আসন ছেড়ে উঠে দাঁড়ালো এবং কিছু যেন একটা চিন্তা কোরছে এই ভাব দেখিয়ে ষ্টেজের ওপর কিছুক্ষণ পায়চারি কোরে নিলো। তারপর দেবসেনারূপী তার প্রিয় ভৃত্য গণেশের দিকে ফিরে গম্ভীর ভাবে বললো :

যাও দেবসেনা,
কহ গিয়া দৈত্যরাজ দূতে
সত্বর দর্শন দানে
আপ্যায়িত করিব তাহারে।

যেমন মনিব তার তেমনি চাকর। মনিবের কথা শুনে গণেশ বুঝলো মিস্ত্রীটাকে আর কিছুক্ষণ ঠেকিয়ে রাখতে হবে। তাই সে আর দেরী না কোরে দেবরাজকে নতি জানিয়ে বললো :

যথা আজ্ঞা দেবরাজ, কহি গিয়া দৈত্যরাজ দূতে
অপেক্ষিতে ক্ষণকাল।

এই বলে ষ্টেজ থেকে বেরিয়ে সে এক দৌড়ে মিস্ত্রীর কাছে গিয়ে হাঁফাতে হাঁফাতে বললো : ম্যানেজারবাবু এখুনি আসছেন। বাপ্‌স্, যে ফ্যাসাদে ফেলেছিলেন মশাই!



দেয়াল জুড়ে ভারতের প্রকাণ্ড ম্যাপের মাঝামাঝি এসে ম্যাপপয়েন্টিং-এর ছড়িটা থেমে গেল।

—এই যে কালো শুঁয়ো পোকার মত পাহাড়-শ্রেণী, এখান থেকে আমাদের কাজ সুরু হবে। জায়গাটির স্থানীয় নাম 'মাতরিঙ্গা' যার মানে হোলো, আর এগিয়ো না। চল্লিশ বছর আগে এখানে একদল মানুষ বাস করতো—যারা আগুনের ব্যবহারই জানতো না।

বিশ্ববিখ্যাত জীববিৎ ডাক্তার বসু ম্যাপকে পেছনে রেখে ঘুরে দাঁড়ালেন। টেবিলের ওপর হাত রেখে একটু ঝুঁকে পরে শুরু করলেন,—

—পৃথিবীতে সর্ব্বপ্রথম যে ভূমি দেখা দিয়েছিল আমাদের ভারতবর্ষের এ অংশটিও তার সঙ্গে যুক্ত ছিল। ভূ-তত্ত্বের ভাষায় একে গণ্ডোয়ানাভূমি বলা হয়।

আবার ম্যাপের কাছে এগিয়ে গেলেন তিনি।

—চুরাশী-অক্ষাংশ যেখানে চব্বিশ দ্রাঘিমাকে ভেদ করে গেছে ওই যায়গা লক্ষ্য কর—এই যে নদী উত্তরে শোণ আর দক্ষিণে সম্বলপুরের কাছে মহানদীতে পড়েছে—এর নাম 'রেড়' নদী। এবার আর একটু পশ্চিমে এগিয়ে চল, এই তো জব্বলপুর—তলা দিয়ে বয়ে চলেছে নর্মদা। আমাদের অভিযান এই দু' নদীর মাঝখানে হবে।

দেয়ালের কাছ থেকে সরে এসে, চেয়ার টেনে বসে পড়লেন। পকেট থেকে রুমাল বের করে বেশ করে মুখ মুছে বল্লেন—

ভূ-তত্ত্বের অনুসন্ধানে আমরা এই জায়গা থেকেই পেয়েছি ডাইনোসারাসের কঙ্কাল, প্রস্তরীভূত লতাগুল্মের ছাপ, বকসাইট, ম্যাঙ্গানীজ, লোহা, কয়লা, প্রত্ন প্রস্তরযুগের পাথরের অস্ত্র, গুহাচিত্র। প্রায় চারকোটি বছর থেকে পনেরো লক্ষ বছর আগে যে সব জিনিষ পৃথিবীতে ছিল।

একটু থেমে উজ্জ্বল বুদ্ধিদীপ্ত দৃষ্টি ছেলেদের মুখের ওপর বুলিয়ে নিয়ে আবার বল্লেন, আমাদের এই বুড়ি পৃথিবীর শৈশব যৌবনের কত কথা এখানে—এই সব পাহাড়ের খাঁজে খাঁজে—খনির স্তরে স্তরে—মাটির তলায় চাপা রয়েছে—যা আজো আমাদের অজানা।

ডাক্তার বসু চেয়ার ঠেলে উঠে দাঁড়ালেন। সঙ্গে সঙ্গে শ্রোতার দলও দাঁড়িয়ে পড়ল।

—একটা কথা তোমাদের মনে করিয়ে দিই, এ অভিযান প্রমোদ-ভ্রমণ নয়। অনেক কষ্ট

সহ্য করতে হবে,—বন-জঙ্গল, পাহাড়-পর্বত হেঁটে পাড়ি দিতে হবে। হিংস্র জন্তুর মুখোমুখি হওয়াটা বিচিত্র নয়—প্রতি পদক্ষেপে জীবন বিপন্ন হতে পারে। এর জন্য প্রস্তুত হয়েই আশা করি তোমরা আমার সঙ্গে যাবে।

—দুই—

লোকালয় থেকে দুশো মাইল তফাতে গভীর জঙ্গলে ডাক্তার বসু তাঁর দলবল নিয়ে তাঁবু গেড়েছেন। পেছনে মাতরিঙ্গা পাহাড়-শ্রেণী পাঁচিলের মত আকাশকে আড়াল করে রেখেছে। চারিদিকে পাহাড়—মাঝখানে একটি মাঝারী টিলার ওপর তাঁদের ক্যাম্প। শীতের ধোঁয়াটে সকাল,—স্বচ্ছ রোদের আলো মাটিতে ঠাণ্ডায় জমে যাওয়া শিশিরে পড়ে রামধনু রঙের রোশনাই জ্বলছে—সাধারণ ভূমিতে। গাছের পাতা চুয়ে রোদের তাপে গলে পড়া শিশির-বিন্দু টপ্‌ টপ্‌ করে পড়ছে গাছের গোড়ায়—জমে যাওয়া শুকনো পাতায়। তারি শব্দে উপত্যকাতে প্রতিধ্বনিত হয়ে বাতাসে মিলিয়ে যাচ্ছে। সারারাত গাছের যে গুঁড়িটা জ্বলছিল—তার মুখে ধূসর ছাই জমে উঠেছে। আর তা থেকে সরু ধোঁয়ার রেখা সোজা আকাশের দিকে উঠছে। তুলো পেজা হালকা কুয়াশা শিশু মেঘের মত শালগাছগুলোর শাখার কোলে যেন শুয়ে আছে।

তাঁবুর বাইরে আগুন ঘিরে চা পান করতে করতে গল্প হচ্ছিল।

ডাক্তার বসু মগে শেষ চুমুক দিয়ে বল্লেন,—আমাদের অভিযান সার্থক হয়েছে বলবো। এবার পাহাড়ের মাথায় সপ্তাহখানেক অভিযান চালিয়ে ফেরা যাবে, কি বল?—তারপর একটু হেসে বল্লেন, বাড়ীর জন্য মন কেমন করছে না তো?

ছেলেরা সমস্বরে আপত্তি করে উঠল।

মুচকে হেসে আসর ছেড়ে উঠে পরে বল্লেন—তাহলে এখানকার পাট এখনই তোলা যাক। তোমরা প্রয়োজনীয় জিনিষ নিয়ে তৈরী হও। আর রামসাইকে বলে দাও তার দলবল নিয়ে পেছু পেছু আসুক। ওখানেই দুপুরের খাওয়া হবে।

যে যার ঝোলাঝুলি কাঁধে নিয়ে প্রস্তুত হল। কিন্তু রামসাইয়ের দেখা নেই। এমন কি তাদের দলবল যে কোথায় মিলিয়ে গেল তারও পাত্তা নেই। জঙ্গলে এদের ছাড়া এক পা চলা অসম্ভব। এরা পথঘাট সব চেনে। জঙ্গলে এরা মানুষ, জঙ্গলই এদের সব। ভারী সরল, আবার ভয়ানক একগুঁয়ে। ঠিক ভাল্লুকের মত গোঁ। যদি কোনো একটা কিছু ধারণা একবার হয়—বুঝিয়ে দূর করা অসম্ভব। সহুরে মানুষকে এরা ভয় করে, বিশ্বাস করে না। অবশ্য না করার কারণও অনেক আছে।

রামসাইয়ের অনুপস্থিতি সকলকে চিন্তিত করে তুললো। দিন কয়েক আগে থেকেই ওদের হাবভাব সুবিধের মনে হয়নি। ওদের ধারণা দেওস্থানে সাহেবরা খুঁড়ে দেওতাদের বিরক্ত করছে। দেওতাদের ধনরত্ন নিয়ে যাচ্ছে।

চাট্যার্জী বল্লে—স্যার ওরা পালালো না ত। চা দেওয়ার পর আর কাউকে তো দেখা গেল না।

ডাঃ বসু উদ্বিগ্ন হয়ে বল্লেন—কেন ওদের তো এমন কিছু করা হয়নি যে পালাবে।

সেন বল্লে—ওই যে সেদিন বলছিল, দেওতা-স্থান খুঁড়ছি আমরা—ওরা থাকবে না।

শীতের ঠাণ্ডা জলো হাওয়ার বদলে শুক্‌নো ঝড়ো হাওয়া উঠছে জঙ্গলে। এ হলো পাতা খসানো হাওয়া, বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে ঝড়ের মত বইবে। তখন পাহাড়ে ওঠা অসম্ভব।

কাঁধের ঝোলা নামিয়ে সবাই বসে পড়ল। সবাইয়ের মুখে কি রকম অসহায় ভাব।

প্রায় ঘণ্টা দুয়েক বাদে দেখা গেল, ত্রিশমাইল নীচুতে যে গ্রাম, তারই গাঁউটিয়া অর্থাৎ মোড়ল আর বৈইগা অর্থাৎ পুরোহিত এলো ডাক্তার বসুর সামনে।

তারা দুজন প্রবল হাত পা নেড়ে মিনিট পনেরো একটানা যা বলে গেল তার মোদ্দা কথা হল—সাহেবরা তাদের দেওস্থান খুঁড়ে দেওকে রাগিয়ে দিয়েছেন। তাই দেও খসু ছড়িয়ে গ্রাম উজার করে দিচ্ছে। কাজেই সাহেবরা এখান থেকে চলে যান, আর তাদের কেউ সাহায্য করতে আসবে না।

ডাক্তার বাবু ভ্রূ কুঁচকে প্রশ্ন করলেন ঃ খসু ?

জী সাব। বেইগা বল্লে।

ডাঃ বসু কিছুক্ষণ ভ্রূ কুঁচকে থেকে গম্ভীর ভাবে হুকুমের সুরে বল্লেন ঃ খসু, বসন্ত, প্রতি বছরই তো তোমাদের এখানে হয়। বর্ষা পড়লে ঠিক হয়ে যাবে।

গাঁউটিয়া এগিয়ে এসে বল্ল ঃ ভিন্ গাঁয়ে হয় আমাদের গাঁয়ে হয় না—দেওস্থান বলে। এবার হচ্ছে।

এরপর আর কোনো কথাই তারা শুনলো না। তখন ডাক্তার বসু বল্লেন, আচ্ছা আজই আমরা এখান থেকে চলে যাচ্ছি—রামসাইকে পাঠিয়ে দাও।

দুজনে ঘাড় নেড়ে বিদায় নিল।

রামসাই কাছাকাছি কোথাও ছিল বোধ হয়। ওদের যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই এসে হাজির। কোনো রকম ভূমিকা না করেই বল্লে ঃ "কব্‌ লে তু জাগা" অর্থাৎ কখন রওনা হবেন।

ডাক্তার বসু আর একবার চেষ্টা করলেন বোঝাতে, কোনো কাজ হল না।

—তিন—

ঠিক হলো রামসাই এদের খাইয়ে গ্রামে চলে যাবে। সেখান থেকে আরো কয়েকজনকে নিয়ে ফিরে আসবে। তারা মালপত্র নিয়ে আজই রওনা হবে। কাল তাঁবু ইত্যাদি নিয়ে বাকী দল সকাল বেলাই রওনা হবে।

হাতে কোন কাজ নেই। রান্নারও অনেক দেরী।

ডাঃ বসু ছাত্রদের শোনাতে বসলেন আদিম যুগের গল্প। তিনি বলছিলেন—

ঘন বাষ্প ধীরে ধীরে ঠাণ্ডা হয়ে এলো। দেখা দিল শক্ত জমি। প্রবল বৃষ্টি সুরু হলো। আকাশ হয়ে গেল বাষ্পশূন্য—দেখা দিল প্রাণের স্পন্দন। কিল বিল করছে কোটী কোটী প্রাণী জলের মধ্যে, সাগর উপসাগর, নদী নালার ধারে ধারে জন্মাচ্ছে তৃণ-গুল্ম। তারপর সেই এককোষী জীব থেকে বহুকোষী জীব মানুষের আবির্ভাব। বিবর্ত্তনের ইতিহাস যা চলেছে সেই আদ্যি কাল থেকে আজো—যেন একটি বিরাট বংশের কাহিনী! এ পৃথিবীতে কেউই একক নয়, আলাদা নয়—সাগর-নদী-পাহাড় দেশকে ভাগ করেছে কিন্তু প্রাণ সবার সেই একই সূতোতে গাঁথা।

ছেলেরা মুগ্ধ হয়ে শুনছে। দুপুরের নিস্তব্ধতায় চারিদিক্ থম্ থম্ করছে। শাল গাছগুলো ছোট ছোট তারার মত ফুলে সর্বাঙ্গ ঢেকে রেখেছে; তারি চারপাশে ব্যস্ত মৌমাছির দল। তাদের পাখার শব্দ এস্রাজের সুরের মত বাতাসে কাঁপছে। দূরে কোথায় কোন বনে মাঝে মাঝে ডাকছে বন-মুরগী।

ঘন সবুজের সঙ্গে হালকা সবুজ মিলিয়ে—ছবির মত মনে হয়। জমি মাটি আর বুনো ফুলের গন্ধে হাওয়া ভারী হয়ে উঠেছে। যেন বনটা ঘুমিয়ে পড়েছে ঠিক দুপুরে।

কথা বলতে বলতে ডাক্তার বসু হঠাৎ থেমে গেলেন। মনে হলো মাতরিঙ্গা পাহাড় ছাড়িয়ে তার দৃষ্টি চলে গেছে কোন সুদূর অতীতে......

—কূর্মযুগ শেষ হল। এল সরীসৃপের রাজত্ব। পঞ্চাশ লক্ষ বছর আগে এদের দাপটে সারা পৃথিবী টলমল করতো। এরা আকারে যেমন ছিল প্রকাণ্ড ওজনেও ছিল তেমনই ভারী। কারো কারো দেহ ছিল একশ ফুট লম্বা, ষোল শ মণ ভারী। কৈ মাছের পিঠে যেমন কাঁটা, এই রকম শক্ত বর্শার মত কাঁটা আর পুরু চামড়ার বর্ম এঁটে রাজত্ব করতো এরা। তীরের ফলার মত সারি সারি দাঁত সর্বদাই বেরিয়ে আছে। ঠোঁটের চামড়া দিয়ে সে দাঁত ঢাকা থাকতো না। ডাঙ্গার এই অতিকায় প্রাণীরা ঘুরে বেড়াত সাগর উপসাগরের ধারে ধারে লতা-গুল্মের বনে।...

আকাশে ছিল যাদের রাজত্ব—যদিও তাদের বংশধররা আজকের পাখী, এদের দেখে এদের পূর্ব্বপুরুষদের ছবি যদি আঁকো, তাহলে তোমরা ভীষণ ঠকে যাবে।...

ডাইনোসরস, টাইনোসরসের মত সাউরীয়ারা ছিল অতিকায়। এক কথায় অতিকায় গিরগিটি অথবা কৃকলাশ বলতে পারো।

কয়েক মূহূর্ত্ত চুপ করে থেকে যেন মনে মনে ছবি এঁকে নিয়ে বল্লেন—

উঃ কি কুৎসিত আর বীভৎস ছিল প্রাগৈতিহাসিক পাখী। বকের ঠোঁটের মত লম্বা চামড়া-হীন ঠোঁটে করাতের মত ধারাল দাঁত, লাল গোলাকার চোখ হিংস্র ভাবে সর্বদাই ভাঁটার মত জ্বলছে। মাটিতে চলার সময় পেছনের পা আর শক্ত ল্যাজে ভর দিয়ে লাফিয়ে লাফিয়ে হাঁটতো। ওড়ার সময়

কুড়ি ফুট পাখা ছড়িয়ে হাওয়ায় ভাসতো। টিকটিকির মত ধূসর শক্ত চামড়ায় ঢাকা পাখা। যেমন চেহারা তেমনি স্বভাব !

এত যে শক্তি—এত যে দাপট তারাও টিকতে পারলো না পৃথিবীতে। সময়ের সঙ্গে খাপ খাওয়াতে না পারায়—নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল।

যুগান্তর ঘটল প্রকৃতির রাজ্যে।

এলো স্তন্যপায়ী জীব, বিজ্ঞান যাদের ম্যামাল বলে।—তারপর মানুষ।…

পশ্চিমে সূর্য্য হেলে পড়েছে। তারি ছায়া উপত্যকায় পড়েছে। অপরাহ্নের ঝিকিমিকি আলোর দিকে ক্ষণেকের জন্য চেয়ে ডাক্তার বসু যেন আত্মগত-ভাবে বল্লেন, মানুষ দুই পায় ভর করে সোজা হয়ে দাঁড়াল। মাথা সে নীচু করলো না প্রকৃতির কাছে…

ছেলেরা নির্বাক্ হয়ে গেছে। জায়গাটার আবহাওয়া যেন কিরকম হয়ে গেছে। সেই অতীতের স্বপ্ন যেন নেমে এসেছে সকলের মনে। সারাদিন যে খাওয়া হয়নি সে খেয়াল পর্য্যন্ত লোপ পেয়ে গেছে।

কুলিদের সোরগোলে সকলের চমক্ ভাঙ্গল। তারা হুড়মুড় করে ডাক্তার বসুর সামনে এসে হাজির। প্রত্যেকেই উত্তেজিত, ভয়ে সকলের মুখই যেন কেমন হয়ে গেছে। সবাইকে ঠেলে রামসাই সামনে এসে দাঁড়াল। উত্তেজনায় আর ভয়ে সে কাঁপছে। কিছুক্ষণ সময় নিলে সামলে নিতে। তারপর, তার বক্তব্য সে যা বল্লে তাতে সবার চক্ষু স্থির! যে স্বাভাবিক জলের উৎস চুয়ার জল এদের গ্রামে আর ক্যাম্পে ব্যবহার হতো—সেই জল শুকিয়ে গেছে। শুধু একটা নয়, কাছাকাছি যতগুলো চুয়া সবগুলোরই এক অবস্থা। দেওতা ভয়ানক রেগে গিয়ে জল বন্ধ করে দিয়েছে।

হঠাৎ রামসাই ডাক্তার বসুর পায়ের সামনে শুয়ে পড়ে কাঁদো কাঁদো সুরে বল্লে—"সাহেব, চলে যাও, দেওতার রাগ থেকে গ্রামকে বাঁচাও।"

চিন্তিত বসু ব্যস্ত হয়ে বল্লেন—কাল তো যাবই। এখন খেয়ে নিয়ে একটু বিশ্রাম কর।

—রান্না কিছুই হয়নি। জল নেই একটুও, রামসাই হতাশার সঙ্গে বলে উঠল।

রান্নার কথায় সকলের খিদে যেন মাথা চাড়া দিয়ে উঠল।

দত্ত বল্লে, স্যার একটু চা খেয়ে এখনকার মত আগে খিদে থামাই। তারপর দেখা যাক জলের কি ব্যবস্থা করা যায়।

ডাক্তার বসু বল্লেন, সেই ভাল একটু চা আগে হোক।—

চ্যাটার্জী হাঁপাতে হাঁপাতে এসে বল্লে—স্যার এ সবই এদের চালাকী তাঁবুতে এক ফোঁটা জল নেই, সব ফেলে দিয়েছে।

একথা শুনে সেন তেড়ে রামসাইয়ের কাছে যেতেই, ডাক্তার বসু তাকে টেনে নিলেন। তারপর একটু ভেবে বল্লেন—চল রামসাই কোথা থেকে জল আসে,—সেখানে যাবো।

রামসাই প্রবল আপত্তি করে বল্লে যে সে ভেবেছিল জল পাওয়া যাবে, তাই জল সব ফেলে জল আনতে গিয়ে এ বিপত্তি। তারা ইচ্ছে করে করেনি।

দুটো বড় বড় টিলা পার হয়ে তারা চুয়ার কাছে পৌঁছাল। একটা বিরাট কালো পাথরের তলায় চুয়া। জল পড়ে পড়ে জায়গাটা গর্ত হয়ে গেছে। গর্ত্তের চারপাশে সবুজ শ্যাওলা আর ফার্ণ দল বেঁধে রয়েছে। টিলার ওপর বা গায়ে একটাও গাছ জন্মায়নি।

চুয়া শুকনো, এক ফোঁটা জলও পড়ছে না। জায়গাটা ভাল করে দেখে ডাক্তার বল্লেন,—এটি একটি স্বাভাবিক জলের উৎস। পাহাড়ের ফাটলে বর্ষার জমানো জলের চুয়া নয়। কাজেই জল সম্বন্ধে দুর্ভাবনা এখন আর নেই। ছেলেদের দিকে প্রশ্ন করলেন। এই কালো টিলাটা কিসের বলত?

দত্ত বল্লেঃ আমার মনে হচ্ছে গ্রেনাইট স্যার। এইজন্য কোনো গাছপালা জন্মায়নি।

না, তোমরা বলতে পারবে না। তার ওপর এখন খিদেতে নারীভুঁড়ি পর্য্যন্ত হজম হয়ে যাবার দাখিল।

চুয়ার যে জায়গাটা জল পড়ে গর্ত্ত হয়ে গেছে, ডাক্তার বসু ছেলেদের বল্লেন—কোনো কারণে মুখ বন্ধ হয়ে গেছে একটু খুঁড়লেই জল পাওয়া যাবে।

সেন বল্লে, স্যার, খোঁড়ার কি দরকার, ডিনামাইট তো সঙ্গেই রয়েছে।

হ্যাঁ, ডিনামাইটই ব্যবহার করবো। তাতে এ জল আর কোনো দিন বন্ধ হবে না। এর ফলে এদের কুসংস্কারও হয়তো চলে যেতে পারে।

না দত্ত, তা হয় না, এত সহজে আজন্মের সংস্কার চলে যায় না। প্রকৃত যুক্তিবিজ্ঞানে না শিক্ষিত হলে সংস্কারমুক্ত হওয়া যায় না।

—চার—

ডিনামাইট ফাটার গুম্ গুম্ শব্দে চারিদিক কেঁপে উঠল। কালো টিলাটা থেকে একটা বড় চাঙড়া ধ্বসে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে কল কল করে জল ফাটলের মুখ বেয়ে নালা দিয়ে গড়িয়ে স্রোতের মত চল্‌লো।

রামসাইয়ের দলবল শব্দ শুনেই কোথায় পালিয়ে গিয়েছিল। জলের শব্দে আবার ফিরে এসে জলে হাত দিয়ে সবাই মিলে নাচতে সুরু করে দিলে। দেওতা খুসী হয়ে জল দিয়েছে।

কয়েক আঁজলা জল সবাই মিলে খেয়ে নিলে। তেষ্টায় বুক সব শুকিয়ে গিয়েছিল। জল পেয়ে যেন আবার প্রাণ ফিরে পেলে।

অপরাহ্নের রোদ ট্যারচা ভাবে এসে পড়েছে—টিলার গায়ে। ধ্বসে যাওয়া দেয়ালে সেই

আলো চক্‌চক্‌ করছে। চল্লিশ-পঞ্চাশ ফুট উঁচু একটা মসৃণ কাচ যেন খাড়া করে রাখা হয়েছে! ওর দিকে তাকিয়ে ডাক্তার বসু বল্লেন ঃ টিলা কোনো পাথরের নয়। এটি 'এ্যাসফালট্‌ রেসিন'— অর্থাৎ লোবানের টিলা। লোবান ধাতু নয় অধুনা লুপ্ত এক জাতের পাইন গাছের আঠা। ধুনো যেমন শাল গাছের আঠা, এও তেমনি গাছের আঠা।

দত্ত জিজ্ঞাসা করলে পাথরের মত আঠা জমলো কি করে স্যার।

লক্ষ লক্ষ বছর আগে এ জঙ্গল ছিল পাইন গাছের। তখন তার আঠা জলে ঝড়ে গড়াতে গড়াতে এক জায়গায় জমতে জমতে এই রকম অবস্থা হয়েছে—একে প্রস্তরীভূত লোবান বলা হয়। গ্রীষ্মমণ্ডলে এ রকম লোবানের স্তূপ আরো অনেক জায়গায় পাওয়া গেছে।



পড়ন্ত রোদের উজ্জ্বল আলোয় মসৃণ শ্বেত লোবানের দেওয়াল অত্যধিক উজ্জ্বল দেখাচ্ছে। অস্বাভাবিক বলেই মনে হচ্ছে। সেদিকে বেশীক্ষণ তাকানো যায় না।—

সেদিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে ডাক্তার বসু হঠাৎ বলে উঠলেন—আরে রঙ বদল হচ্ছে যেন। তার কথা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে দত্ত বলে উঠল ঃ

স্যার দেখুন কি রকম সবুজ হয়ে উঠল।

দেখতে দেখতে সকলে চঞ্চল হয়ে উঠল। সবুজ বর্ণ তার মধ্যে। ও বাবা ওটা কি!

টাইনোসোরাস,—ডাক্তার বসু বিস্ময় ভরা কণ্ঠে বলে উঠলেন।

পনেরো লক্ষ বছর আগে এরা যে ভঙ্গিতে এ প্রদেশে ঘুরে বেড়াত ঠিক সেই ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে। বৈজ্ঞানিকের মন ক্ষণেকের জন্য বিহ্বল হয়ে গেল।

বড় বড় অতিকায় গাছের জঙ্গল লতাগুল্মে ঢাকা বনভূমির মাঝে টাইনোসরাস পেছনের পা আর ল্যাজে ভর করে দাঁড়িয়ে। সামনের পা দুটো বুকের কাছে গুটানো। ধারালো নখগুলি ছড়িয়ে যেন খিঁমচাতে যাচ্ছে। বড়শীর মত বাঁকা নাক ফুলে উঠেছে, কুমীরের মত করাতে দাঁত রাগে কিড়মিড় করছে।

হিংস্র গোলাকার রক্তবর্ণ চোখ তাদের দিকেই চেয়ে রয়েছে।

স্যার, ভূ-উ-উ-ত……

গোঁ গোঁ করতে করতে ঘাড় গুঁজে একজন পড়ে গেল। রামসাইয়ে চায়ের জল উল্টে গেল গরম আগুনের ওপর। মুহূর্তের মধ্যে যেন প্রলয় কাণ্ড ঘটে গেল। গরম ধোঁয়া এক ঝলক ডাক্তার বসুর মুখে চোখে লাগাতে—তিনি সম্বিৎ ফিরে পেলেন।

পড়ন্ত রোদের আলো সরে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ছবিও মিলিয়ে গেল।……

অভিযান থেকে ফিরে ডাক্তার বসু একেবারে অন্য মানুষ হয়ে গেলেন। ভূত বলে কিছু আছে এ বিশ্বাস কোনো বিজ্ঞানীর নেই। তারও নেই। কিন্তু তার এই প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতাকে কোনো যুক্তি দিয়েই সমর্থন করতে পারছেন না।

চিন্তায় তার কপাল কুঁচকে গেছে, চোখ কোটরের মধ্যে ঢুকে যাচ্ছে দিনের পর দিন। ভাবেন তাঁদের জ্ঞান কত পরিমিত। এক বিষয় তিনি আজীবন চর্চ্চা করেছেন—কিন্তু তাতে প্রকৃতির রহস্যময় কুঠুরীর দরজা যে খোলা যায় না, সে প্রমাণ পেলেন এবার। আলো-বিজ্ঞান, মানুষের দৃষ্টির ক্ষমতা সম্বন্ধে জ্ঞান অর্জন করতে হবে। তবে যদি সমস্যার সমাধান হয়।

পৃথিবীর সমস্ত কাজ থেকে নিজেকে সরিয়ে তাঁর নতুন ভাবে গবেষণা সুরু হলো। লাইব্রেরী-ঘর ছাড়া আর কোথাও তিনি যান না। টেবিলে বইয়ের স্তূপ পাহাড়ের মত জমে উঠেছে। রাতের পর রাত চলে যায়, দিনের পর দিন চলে যায়……সমস্যা সমস্যাই থেকে যায়……দেখতে দেখতে বছর ঘুরে আসে। রাত প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। ভোরের ঠাণ্ডা হাওয়া এক ঝলক জানলা দিয়ে ঢোকায় বইটার গোটা কয়েক পাতা ফড় ফড় করে উড়ে উল্টে গেল। তাঁর চিহ্নিত জায়গাটি খুঁজতে গিয়ে বৈজ্ঞানিকের নজরে পড়ল, "—এবং এ্যাসফাল্ট রোসিনের প্রলেপের ওপর বিশেষ একটি কোণের আলো-রশ্মি ফেললে, আলোবিম্ব বস্তর স্বাভাবিক রঙ নিয়ে যে ছায়া ফেলবে তার ওপর—পুনরায় যদি সেই একই কোণের আলো পড়ে তাহলে পূর্বের ছায়া প্লেটে স্বাভাবিক রঙ নিয়ে প্রতিফলিত হবে। রোসিন প্রলেপের তারতম্যে ছবির গভীরতা নির্ভর করে। নিউটনের আলো বিম্বের নিয়ম অনুসারে এই ঘটনা ঘটে।"

অন্ধকারে আলোর সন্ধান পেলেন ডাক্তার বসু। আনন্দে তাঁর চোখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল।

জানালা দিয়ে বাইরে তাকালেন। তখন সবে ফর্সা হচ্ছে পূবদিক্। আত্মগতভাবে বলে উঠলেন —পথ পেয়েছি এবার, বাস্তবে পরীক্ষা করতে হবে।……

দশ বছর বাদে দেখা গেল ডাক্তার বসু তাঁর পুরাণো বন্ধুদের সামনে মঞ্চে দাঁড়িয়ে বক্তৃতা

দিচ্ছেন। যে ছাত্রদল তাঁর অভিযানে ছিল—তারা রয়েছে, আরো অনেকে। এর এই নতুন আবিষ্কারের কথা শুনছে—মুগ্ধ হয়ে—

"আপনাদের যে ছবিগুলি দেখালাম—এগুলি কোনো শিল্পী কল্পনা করে আঁকেনি, প্রকৃতি তার নিজের এই ছবিগুলি লুকিয়ে রেখেছিল প্রস্তরীভূত লোবান, কয়লা আরো অনেক খনির মধ্যে। আমি সেগুলি সংগ্রহ করে এনেছি। এ রঙ স্বাভাবিক, এ দৃশ্য সেই পনেরো লক্ষ বছর আগেকার। দশবছর আগে এক অভিযানে প্রথম আমি এর সন্ধান পাই, তখন আমার বন্ধুরা আমায় ঠাট্টা করে বলেছিলেন, আমার দৃষ্টিভ্রম ঘটেছে—আমি পাগল। স্থানীয় লোকেরা বহুকাল ধরে এ ছবি দেখে আসছে। তারা ভাবে দেবতার যাদু। তাদের এ যুক্তির হদিশ পাওয়া যায়—কিন্তু আমরা বৈজ্ঞানিক, এ যুক্তি আমাদের নয়—আমাদের পরিমিত জ্ঞান দিয়ে কতটুকুই বা জানতে পারি।...

একটু থেমে প্যালিওনটোলজিষ্ট ডাক্তার বসু আবার সুরু করলেন—

প্রস্তরীভূত শিলার মত ভূবিজ্ঞানের এই নতুন অধ্যায় আশা করি আমাদের বিজ্ঞান-সাধনায় আর এক যুগ এগিয়ে নিয়ে যাবে। মানুষ প্রকৃতির দাস নয়—প্রকৃতিই মানুষের দাসী হয়ে সেবা করবে—এ বিশ্বাস আমার আছে।...

কয়েক মুহূর্ত শ্রোতাদের দিকে সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে চেয়ে থেকে তাঁর বক্তব্য শেষ করলেন:

আমি একা আর কতটুকু করতে পারি—এই সব ছেলেরা নিশ্চয়ই এগিয়ে আসবে বিজ্ঞান-সাধনায়।

নিবেদন

—কণা সেন

তুমি যদি হও আকাশের আলো আমি যেন হই পাখী;
তোমার আলোকে আমার নীড়ের আঁধার দিও গো ঢাকি'।

অসীম শূন্যে স্বপনে রাজিবে;
কণ্ঠে আমার সে সুর বাজিবে,
কুসুমে কুসুমে মধুরে বাঁধিবে রাঙা আলোকের রাখী।
তোমার আলোকে আমার নীড়ের আঁধার দিও গো ঢাকি'।

আমি আনন্দে ঘুমানো পুরীতে, জাগাবো সবায় জাগরণী গীতে
তোমারি আদেশ সবে শোনাইতে, গানে গানে যাব ডাকি'।



যদি ডাক্তার হতে চাও

ডাঃ পশুপতি ভট্টাচার্য

তুমি কি ডাক্তার হতে চাও? অল্প বয়স থেকেই মনে মনে অনেক ছেলেমেয়ে ডাক্তার হতে ইচ্ছা করে। যারা সত্যি-কার ডাক্তার হয় তারা যে সবাই ছেলেবেলাতে সেই মতলব এঁটে রাখে তা' অবশ্য নয়, এমন অনেকেই আছেন যাঁরা আগে কোন ইচ্ছা না থাকলেও শেষ পর্য্যন্ত ঘটনাচক্রে ডাক্তার হয়ে পড়েছেন। আমাদের রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের ইচ্ছা ছিল যে তিনি ইঞ্জিনিয়ার হবেন, ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে ভর্তি হবার জন্য দরখাস্তও করেছিলেন, কিন্তু ঘটনাচক্রে হয়ে পড়লেন ডাক্তার। তবে সকলের বেলায় এমন হবার কথা নয়। কারো কারো খুব ছেলেবেলা থেকেই ডাক্তার হবার খুব বেশি শখ থাকে। আমার নিজের অন্ততঃ তাই ছিল। তখনকার সব কথা এখন আমার স্পষ্ট মনে পড়ে যাচ্ছে। তোমাদের কাছে সেই গল্পটাই আগে বলি।

সে অনেককাল আগের কথা। বর্দ্ধমানের পাড়াগাঁয়ে বাস করতাম, শহর সেখান থেকে দু-ক্রোশ পথ দূরে। শহরে নামজাদা ডাক্তার ছিলেন জগবন্ধু ডাক্তার, বাড়িতে কারো অসুখবিসুখ হলেই লোক পাঠিয়ে তাঁকে ডেকে আনতে হতো। আমাদের বাড়িতে সেই ডাক্তার আসার দিনটি আমার কাছে পরম ঔৎসুক্যের দিন ছিল। আমি বাড়ির ফটক থেকে বেরিয়ে অনেকখানি এগিয়ে রাস্তার দিকে চেয়ে বসে থাকতাম, কখন রাস্তার মোড়ে জগবন্ধু ডাক্তারের টমটমের টাট্টু ঘোড়াটি দেখা দেবে। গাড়ীখানা কাছে এলেই দেখা যেত গলাবন্ধ কোট পরা, পাকা চুলে চেরা সিঁথি কাটা জগবন্ধু ডাক্তারের প্রশান্ত মূর্তি। তিনি আমায় দূর থেকে দেখেই একটু হাসতেন, অমনি যেন আমার সমস্ত অন্তরটা আনন্দে আটখানা হয়ে উঠত। মনে হতো এ লোকটি অতি অসাধারণ, আমাদের মতো সাধারণ মানুষের চেয়ে একেবারেই স্বতন্ত্র। সকল মানুষের দেহের ভিতরকার কলকব্জার সকল খবরই ইনি জানেন, পকেটের ভিতর থেকে ঐ যে কাঠের চোঙাটি বেরিয়ে রয়েছে ঐটি একবার কানে লাগিয়ে কার শরীরের ভিতর কোথায় কি বিগড়েছে তা কত সহজেই ইনি ধরে ফেলতে পারেন। বিদ্যা যদি কিছু শিখতে হয়, তবে এই বিদ্যাটাই শেখা উচিত, এর চেয়ে বড়ো

বিদ্যা আর জগতে নেই। এইসব কথা ভাবতে ভাবতে আমি তাঁর সঙ্গ নিতুম। তারপর তিনি খুব ধীরপদে বাড়ির মধ্যে ঢুকতেন, নিঃশব্দে রোগীর কাছে গিয়ে বসতেন, মৃদুস্বরে দু-একটি কথা তাকে জিজ্ঞাসা করতেন, পকেট থেকে সোনার জেবঘড়িটা বের করে রোগীর নাড়ী পরীক্ষা করতেন, তারপর সেই কাঠের চোঙাটি বের করে অনেকক্ষণ পর্যন্ত রোগীর বুক পিঠ পরীক্ষা করতেন। বাড়ির লোকেরা আশেপাশে স্তব্ধ হয়ে ততক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকত, কেউ তখন টুঁ শব্দটি পর্যন্ত করতে সাহস করত না! এ পরীক্ষা শেষ ক'রে তিনি একবার পেটটা টিপে দেখতেন, তারপরেই গম্ভীর হয়ে বলতেন—"জিব দেখি।" তাঁর মুখের এই "জিব দেখি" কথাটির মধ্যে এমন একটা জোরালো আদেশের সুর ছিল যে নিতান্ত বেঁহুশ অবস্থার রোগীও সচেতন হয়ে জিব বের ক'রে দেখাত। সবরকম পরীক্ষার শেষকালে তিনি ঐ কথাটি বলতেন। তাঁর ঐ "জিব দেখি" কথাটি শুনলেই আমি বুঝতাম যে এবার তাঁর পরীক্ষা শেষ হয়ে গেছে, যা কিছু জানবার তা' তিনি সবই জেনে নিয়েছেন, আর কিছুই জানতে বাকি নেই। তারপরেই তিনি রোগীর ঘর থেকে বেরিয়ে আসতেন, বাইরে এসে সাবান জল দিয়ে হাত ধুয়ে পকেট থেকে নিজের রুমালটি বের ক'রে হাত মুছতেন, তারপরে একটা চেয়ারে কিছুক্ষণ স্থির হয়ে বসে বলতেন—"কাগজ কলম নিয়ে এস।" প্রেস্‌ক্রপশন লিখতে বসে প্রথমেই তিনি লিখতেন একটিমাত্র অক্ষর—"R"। আমি আগের থেকেই জানতাম যে এটি তিনি নিশ্চয় লিখবেন, কিন্তু কেন এটি লেখেন তা তখন বুঝিনি। অনেক পরে বুঝেছিলাম। R মানে Recipe—অর্থাৎ এই সব জিনিস নিয়ে প্রেস্‌ক্রপশনের ওষুধটা তৈরি কর। তিনি কেমন একটুখানি কলমের টান দিয়ে ঐ অক্ষরটি লিখতেন। তিনি চলে গেল আমিও হুবহু তাঁর নকল ক'রে ঐ ধরণের প্রেস্‌ক্রপশন লিখতাম, আর মনে মনে কামনা করতাম,—কবে আমি ডাক্তার হয়ে অমনিভাবে একদিন সত্যিকার প্রেস্‌ক্রপশন লিখব।

তবে কেবল যে ঐ জন্যেই আমার ডাক্তার হবার ইচ্ছা হয়েছিল তা নয়। জগবন্ধু ডাক্তারের মধ্যে এমন কতকগুলি গুণ ছিল যা সচরাচর সাধারণ মানুষের মধ্যে দেখা যায় না। ওর মধ্যে একটা হচ্ছে অবিচল একাগ্রতা ও প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব। তার মানে ধীর স্থির উপস্থিত বুদ্ধি, কোনো কিছুতে ঘাবড়ে না গিয়ে বিপদের মুখে ঠিক জিনিসটি বুঝে নিয়ে ঠিক কাজটি করতে পারা। রোগী এবং রোগীর বাড়িশুদ্ধ লোকেরা অস্থির হলেও তিনি কখনো অস্থির হতেন না, দিব্যি নির্বিকার হয়ে থেকে নিজের কাজটি করে যেতেন। একবার জাঁতি দিয়ে পেন্সিল কাটতে গিয়ে আমার হাতটা এমন কেটে গেল যে কিছুতেই রক্ত বন্ধ হতে চায় না। ঝর্‌ঝর্ করে রক্ত পড়ছে দেখে বাড়ির লোকেরা অত্যন্ত ভয় পেয়ে আমাকে তাড়াতাড়ি নিয়ে গেল জগবন্ধু ডাক্তারের বাড়ি। ভয়ে তখন আমি একেবারে কাঠ হয়ে গেছি। জগবন্ধু ডাক্তার তখন নিজের খাটের উপর বসে গুড়গুড়িতে তামাক খাচ্ছিলেন। সেখানেই আমাকে নিয়ে যাওয়া হলো। সেই তামাক খেতে খেতেই তিনি আমার হাতটা ধরে একটু নেড়েচেড়ে দেখলেন, তারপর হেসে বললেন—"কিছুই তো হয়নি, ভয় কিসের?" এই বলে বুড়ো

আঙুল দিয়ে আমার হাতের একটি শিরা টিপে ধরলেন। বাস্, মুহূর্তের মধ্যে রক্তপড়া বন্ধ হয়ে গেল। সেই অবস্থাতেই ধরে থেকে কম্পাউণ্ডারকে ডেকে তিনি ওষুধ দিয়ে ব্যাণ্ডেজ ক'রে দিতে বললেন।

শুধু এমনি নির্বিকার প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব নয়, ভালো ডাক্তার হতে গেলে আরো এই ধরণের কতকগুলি বিশেষ গুণ থাকা দরকার। আর সেগুলি ছেলেবেলা থেকে অভ্যাস করলেই সব চেয়ে ভালো হয়। যেমন যথেষ্ট সাহস থাকা, কোনো কিছুতেই ব্যস্ত বা উত্তেজিত হয়ে না ওঠা, সব সময় মেজাজটিকে ঠাণ্ডা রাখা। ডাক্তার হতে গেলে এই সব গুণ নিশ্চয়ই থাকা চাই। হঠাৎ রেগে ওঠা বা রাগ প্রকাশ করা ডাক্তারের পক্ষে একটা মস্ত দোষ। খাঁটি ডাক্তার হতে গেলে কিছুতেই ওটি চলবে না। জগতের সব রকম জাতের মানুষই রাগ প্রকাশ করতে পারে, কিন্তু ডাক্তার কখনো সেটি করবে না। এই হলো ডাক্তার জাতের আদর্শ ধর্ম। ডাক্তারি করতে গিয়ে তোমাকে যে যাই বলুক, যে যতই তোমায় অপমান করুক, নিন্দা করুক, কটু কথা বলুক, কোনো কিছুতেই বিচলিত না হয়ে শান্ত থেকে নিজের কাজ করে যাবে। তোমরা মনে করছ, এমন উপদেশ দেওয়া খুব সোজা, কিন্তু কাজে করা খুব শক্ত? আমি কিন্তু নিজের চোখে অন্ততঃ এমনই একজন ডাক্তারকে দেখেছি। তাঁর নাম ডাক্তার নীলরতন সরকার। তোমরা চোখে না দেখলেও কেউ কেউ নিশ্চয় তাঁর নাম শুনেছ। তাঁকে জীবনে কেউ কখনো রাগতে দেখেনি। মানুষের মধ্যে তিনি দেবতার মতো ছিলেন। ততটা অবশ্য না পারা গেলেও ডাক্তার হতে হলে তোমাকে সাধারণ মানুষের চেয়ে খানিকটা উপরে উঠতেই হবে, সাধারণ মানুষের মধ্যে যে সব দুর্বলতা থাকে সেগুলোকে মন থেকে ঘুচিয়ে ফেলতে হবে, যতখানি পারা যায়। তার কারণ কি বুঝতে পারছ? তার কারণ মানুষের প্রাণ বাঁচাবার মস্ত দায়িত্ব তোমাকে নিতে হয়েছে। কিন্তু তুমি যদি নিজেই দুর্বল থাকো তাহলে অন্যের প্রাণরক্ষার ভার তুমি নেবে কেমন ক'রে? ডাক্তার হবার কাজটাই যে মহা ঝকমারি, অসুস্থ হয়ে মরবার-মতো-মানুষকে বাঁচিয়ে তোলা। এ কাজে যখনই তোমার ডাক পড়বে তখনই তোমায় ছুটতে হবে,—দিন নেই, রাত নেই, সময় নেই, অসময় নেই। তখন নিজের সুবিধা অসুবিধা বা মান-অপমানের দিকে তাকালে চলবে না, একমাত্র লক্ষ্য হবে মানুষটিকে বাঁচানো।

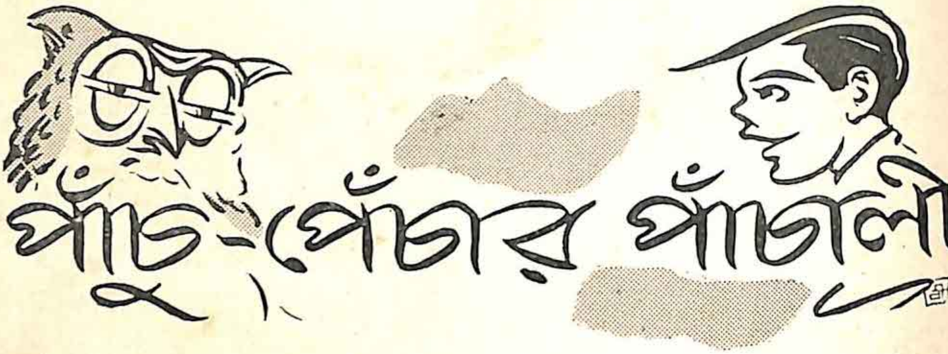
আর একটা কথা, ডাক্তারি শেখবার যদি শখ থাকে তাহলে আগে তোমাকে নির্ভীক হতে হবে। রক্ত দেখে মূর্চ্ছা যাওয়া, কাউকে মরতে দেখলে ভয় পাওয়া, মরামানুষ বা মৃতদেহ দেখলে ভূতের ভয়ে আঁৎকে ওঠা, এসব জিনিস থাকলে চলবে না। এসব অহেতুক ভয় মন থেকে না ঘোচালে ডাক্তারি শেখাই মুশকিল হয়ে পড়ে, কলেজে ভর্ত্তি হয়েও পড়া ছেড়ে দিতে বাধ্য হতে হয়। আমি অনেক ছেলেকে এইভাবে পড়া ছেড়ে দিতে দেখেছি। তারা মড়া দেখে ভূতের ভয় পেত, অপারেশন টেবিলের কাছে দাঁড়িয়ে রক্ত দেখে মাথা ঘুরে পড়ে যেত। তার কারণ তারা ছেলেবেলা থেকে ভয় পেতেই শিখে এসেছে, ভয় ত্যাগ করতে কখনো শেখেনি।

যারা ডাক্তারি শিখবে তাদের গোড়া থেকে ঐদিকে একটু ঝোঁক থাকলে ভালই হয়। স্কুলে

পড়তে পড়তেই তারা স্বাস্থ্যতত্ত্ব ও শারীরবিদ্যা সম্বন্ধে খানিকটা কিছু জ্ঞান সঞ্চয় করে নিতে পারে। পরে একটু কেমিষ্ট্রি বা রসায়নবিদ্যা আর বায়োলজি বা জীবতত্ত্ব শিখে নেবারও দরকার হয়। কলেজে পড়বার সময় সেই সব বিষয়ই পাঠ্য বেছে নিতে হয়।

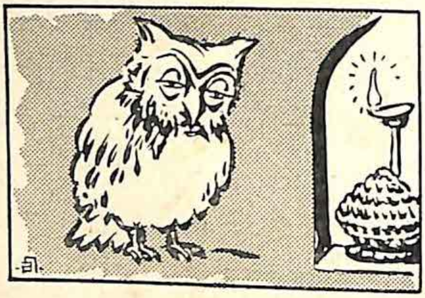
কিন্তু এতে আর একটি জিনিষ থাকা বিশেষ দরকার, সেটি নির্বিচার নিরপেক্ষ মানবসেবার এক মহান্ আদর্শ। কথাটা একটু বুঝিয়ে বলি। এ হলো একরকমের বীরত্বের কাজ। যুদ্ধ করতেও যেমন বীরত্ব থাকা চাই, ডাক্তারি করতেও তেমনি কিছু বীরত্ব থাকা চাই। মনের মধ্যে কোন উঁচু আদর্শ থাকলেই তবে বীরত্বটা আসে। কিন্তু দুইএর মধ্যে অনেকখানি তফাৎ আছে। যোদ্ধা যারা নিজের দেশকে বাঁচাবার জন্যে তারা অন্য দেশের মানুষকে হত্যা করে,—এটা হলো তাদের বীরত্ব। কিন্তু ডাক্তার যে হবে সে মানুষকেই বাঁচাতে করবে শল্যধারণ কিংবা ছুরি ধারণ,—তার জন্যে কোনো কিছুই দ্বিধা করবে না,—এই তাদের বীরত্ব। লোকে বলে ডাক্তার হলেই তাদের মনে কোনো দয়ামায়া থাকে না, নির্মমভাবে মানুষের গায়ে ছুরি বসিয়ে দেয় কিংবা ছুঁচ ফুটিয়ে দেয়। কিন্তু একথা ঠিক নয়, দয়ামায়া তার যথেষ্টই আছে, সে দেখছে যে এই একটুখানি কষ্ট দিয়ে সে একটা মানুষের জীবনরক্ষা করছে। তার দয়ামায়া সাধারণের চেয়ে বরং অনেক উঁচু ধরণের। রোগী মাত্রেরই উপর তার সমান দয়া, সমান মায়া, যেমন করে হোক লোকটাকে বাঁচাতেই হবে—এই তার লক্ষ্য। রোগী নিজের দেশের লোক হোক কিংবা পরের দেশের হোক, সাধু কিংবা অসাধু হোক, কোনো কথাই সে তখন ভাববে না, এমন কি পরম শত্রু হলেও সে কথা সে তখন ভুলে যাবে। যে হেতু সে রোগী হয়ে ডাক্তারের হাতে তার জীবনরক্ষার ভার দিয়েছে, সেই হেতু ডাক্তার তার জন্যে প্রাণপণে চেষ্টা করবে, যতক্ষণ পর্যন্ত সে সেরে না উঠছে ততক্ষণ পর্যন্ত সে রোগী ছাড়া অন্য কিছুই নয়। ডাক্তার তখন আর কোনো রকমের কথা না ভেবে তীক্ষ্ণ-দৃষ্টিতে তার মধ্যে কেবল রোগের লক্ষণই দেখতে থাকবে। এই যে সব রকম চিন্তা ভুলে গিয়ে কেবল রোগ দেখা এবং তাকেই সারিয়ে তোলবার কথা ভাবা, আমি এই মহৎ আদর্শের কথাই বলছি। এমন আদর্শ কেবল ডাক্তারি কাজ ছাড়া দুনিয়াতে আর কোনো কাজের মধ্যে নেই। আমি তো বলি ডাক্তারি কাজে মানুষের মনকে যতখানি মহৎ ক'রে তুলতে পারে, জগতে আর কোনো কাজে তা পারে না। তবে সত্যিকার ডাক্তারি শিখতে হলে আগে মনকে অনেকখানি গড়ে পিটে তৈরি করে নিতে হয়। রীতিমত কষ্টসহিষ্ণু হতে হয়, শক্ত হতে হয়, হুঁসিয়ার ও সাহসী হতে হয়। মোটের উপর একটু অসাধারণ হতে হয়।

এখন জিজ্ঞাসা করি, সব কথা শুনেটুনে তোমাদের কি মনে হচ্ছে? ডাক্তারি বিদ্যেটা শিখতে কারো কারো যথার্থই ইচ্ছা হচ্ছে কি?



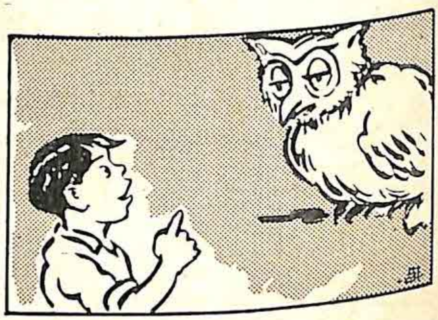
পাঁচু-পেঁচার পাঁচালী

দুর্গাদাস সরকার



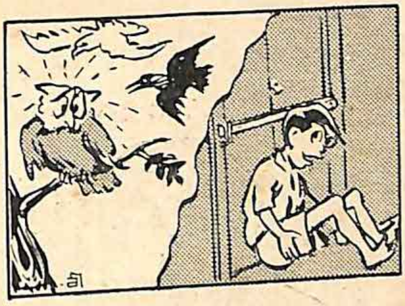
লক্ষ্মী-ঘরে বারমাসই বৃদ্ধ পেঁচার বাস।
একমাত্তর বন্ধু যে তার পাঁচু গোপাল দাস ॥
ঝাপ্‌সা চক্ষু রুক্ষকায়া পেঁচার আদর ভারী।
রাত্তিরে সে হয় আঁধারে একলা আকাশচারী ॥

পাঁচু বলে ঃ "এই বয়সে দিনেই হয়ো বা'র।
তোমায় করবে জ্বালাতন সে-সাধ্যি আছে কার ॥
তুমি আমার বন্ধু জেনে' আস্‌বে না কাক চিল"।
পেঁচা ভাবে, 'বলুক, তবু নড়ছি না এক তিল' ॥

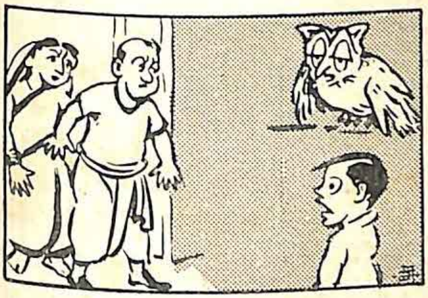




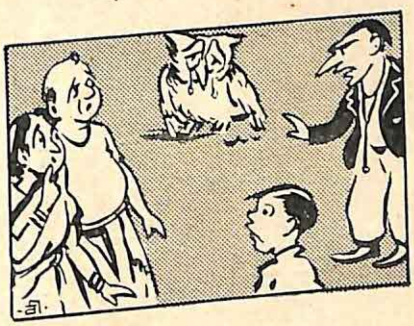
বললো পাঁচু ঃ "তোমার দুঃখ দেখ্‌তে নারি আর।
রূপসপুরে আছে জানা বৈদ্য চমৎকার" ॥
আঁধার রাতে ডাক্তার এলো, জান্‌লো নাক' কেহ।
পাঁচুই হোল পেঁচা, পেল পেঁচাই পাঁচুর দেহ ॥



সকাল হোলেই ছুট্‌লো পাঁচু, বস্‌লো গাছের 'পরে।
পাঁচু হোয়েও থাক্‌লো পেঁচা দুয়ার এঁটে ঘরে ॥
পাঁচুর মাথায় মারছে ঠোকর রাজ্যেরি কাক চিল।
বন্ধুর দশা ভেবেও পেঁচা খুল্‌লো নাক' খিল ॥



সন্ধ্যা হোলে ফিরলো পাঁচু, ভগ্ন তার দু পাখা।
পেঁচাও ভাবে, 'রাত্রি হোল, আর চলেনা থাকা' ॥
বাড়ীর সবাই আস্‌লো ছুটে, বল্‌লে ঃ "ভীষণ ছেলে।
রাত্রি বেলায় বেড়িয়ে আসার বুদ্ধি কোথায় পেলে" ॥



পাঁচুই তখন বল্‌লো কেঁদে সকল ইতিহাস।
পেঁচা হোলেও সে যে নিজেই পাঁচুগোপাল দাস ॥
পুরাতন সেই ডাক্তার এলো, শুন্‌লো কাণ্ডখানা।
বল্‌লো ঃ "কিন্তু পুনর্‌ভবের বিদ্যা তো নেই জানা" ॥

নূতন সমাজের গোড়ার কথা হইবে সকলের জন্য সমান অধিকার, সমান সুযোগ—ঐশ্বর্য্যের উপর সকলের সমান অধিকার। বৈষম্যমূলক সামাজিক বিধান প্রত্যাহার, জাতিভেদ প্রথার বিলোপ এবং বৈদেশিক শাসন হইতে মুক্তি।

—নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু



পয়লা এপ্রিল

শুদ্ধসত্ত্ব বসু

পয়লা এপ্রিলের ঠাট্টা কত লোকের কাছে যে কত ভাবে দেখা দেয়—তার আর ইয়ত্তা নেই। এই গত পয়লা এপ্রিল আমার জীবনে যে কাণ্ডটি ঘটেছে—তা যেমন বিচিত্র, তেমনি করুণ। আমি তোমাদের কাছে আজ সেই কথাটাই ব্যক্ত করছি।

সন্ধ্যের সময় ক্লাবে গেলাম। উদ্দেশ্য হলো—শম্ভুর কাছে গোটা তিরিশ টাকা পাবো, আজঃ পয়লা তারিখ—যদি সে সেইটে শোধ দেয়। কাল সকালে মা গয়া যাবেন, তাঁকে ওই টাকা দিতে হবে। ক্লাবে গিয়ে শুনলাম—শম্ভু এসে চলে গেছে। তবে আমার জন্যে তিরিশটা টাকা রেখে গেছে বঙ্কুর কাছে।

বঙ্কু দিলে সেই টাকা কটা। তিনখানা দশ টাকার নোট পকেটে পুরে সেখান থেকে বেরিয়ে পড়লাম। ক্লাব থেকে রোজই প্রায় বাড়ী ফিরি পায়ে হেঁটে; তখনো ট্রামে বাসে ভিড় কমে না,—আর ফাঁকা মাঠের একটুখানি হাওয়া খাওয়াও হয়। সেদিনও গড়ের মাঠ ধরে হাঁটতে সুরু করলাম।

সন্ধ্যে পার হয়ে গেছে। জায়গায় জায়গায় দু'চারজন লোকের জটলা থাকলেও মাঠ বেশ

নির্জন। এলোমেলো হাওয়া বইছে। কোলকাতায় বসন্ত আসে না, কিন্তু গরমকালের গোড়ার দিক্‌টায় রাত্রে বাতাসে যেন বসন্তের আমেজ পাওয়া যায়, বিশেষ করে এইরকম খোলা মাঠে।

হঠাৎ আমাকে কে যেন পেছন থেকে ডাকলে—দেখুন, শুনছেন।

পেছন ফিরে তাকালাম। প্রায় প্রৌঢ়, ঋজু, বলিষ্ঠ চেহারার একজন লোক। একমুখ দাড়ি গোঁফ, অনেকদিন যেন কামানো হয় নি। তবু সেই মুখের ডান দিকে একটা আব পাকা কুলের মতো ঝুলছে। উস্কখুস্ক এক মাথা চুল। নীল আর সাদায় ডোরাকাটা হাফসার্ট গায়ে, আধ ময়লা ছেঁড়া কাপড়, খালি পা। দেখলেই খুব দুঃস্থ বলে মনে হবে লোকটিকে। আমি দাঁড়ালাম তার ডাকে। তার দিকে চেয়ে বললাম—আমাকে ডাকছেন?

করুণ দৃষ্টিতে লোকটি আমার দিকে বিস্মিতভাবে তাকালে। সেই রকম বিহ্বল, বিস্ফারিত অথচ করুণ অসহায় দৃষ্টি আমি জীবনে আর দেখেছি বলে মনে করতে পারলাম না। আজো আমার চোখের সামনে যেন সেই দৃষ্টি ফুটে রয়েছে। প্রথমে খানিকটা ভয়ে, খানিকটা সংকোচে সে কিছুই বলতে পারলো না, কিন্তু আমার কাছে আশ্বাস পেয়ে সে পরিষ্কার করে তার জীবনের আনুপূর্বিক কাহিনী বলে যেতে লাগলো—বড় বে-কায়দায় পড়েছি এখন। বাড়ীতে বউ ছেলেপিলে না খেয়ে রয়েছে, উদ্বাস্তু হয়ে এসেছি, সরকারের সাহায্যে চলছে কোনো রকমে, কিন্তু রোগ, শোক, অনাহার যে আমাদের একেবারেই শেষ করে দিচ্ছে; যার কাছে যাচ্ছি কাজের জন্যে, তাড়িয়ে দিচ্ছে। দুটো টাকা সাহায্য পাবার জন্যে হাত পাতছি এখানে ওখানে, শুধু রূঢ় তিরস্কারই মিলছে। আজ সন্ধ্যায় ছোট ছেলেটা—অনেকদিন থেকেই লিভার শুকিয়ে যাওয়ায় কষ্ট পাচ্ছিল সে—আমাদের মায়া কাটিয়ে, সব দুঃখকষ্ট ছাড়িয়ে—

লোকটির কণ্ঠ বেদনায় ভিজে এল। বুঝলাম ছেলেটি মারা গেছে। তারই সৎকারের জন্যে গোটা তিরিশেক টাকা চাইছে সে। বহু জায়গায় প্রত্যাখ্যাত—বহুজনের দ্বারা প্রতারিত; কেমন যেন অসহায় এক কারুণ্য এসে আমারও মনটাকে ভিজিয়ে দিলে। আমি বুক পকেট থেকে সেই দশটাকার তিনখানি কড়কড়ে নোট বের করে দিলাম। কি জানি মনটা স্বর্গীয় আনন্দে ভরে উঠলো। লোকটির চোখ দুটো চকচক করে উঠলো; মুখের ওপর দিয়ে অশেষ খুসির এক হিল্লোল বয়ে গেল যেন। সামান্য ওই তিরিশটা টাকা পেলে মানুষ যে এরকম সন্তুষ্ট হয়ে উঠতে পারে—এর আগে আমি তা কখনো দেখিনি। দুটি হাত ওপরে তুলে লোকটি আমাকে আশীর্ব্বাদ করে গেল—আমি সেই আশীর্ব্বাদ জীবনে কখনো ভুলতে পারবো না। সে বলে গেল—সমস্ত মানুষ জাতটার ওপরই আমার অবিশ্বাস আর ঘেন্না ধরে গিয়েছিল। আপনি আজ আমাকে সেই পথ থেকে রক্ষা করলেন। মনের সেই কষ্টকর অবস্থা থেকে মুক্ত করলেন। আবার মানুষের প্রতি আমার শ্রদ্ধা, মানুষের প্রতি বিশ্বাস ও ভালবাসা যেন আমার ফিরে আসছে। আপনি আমার নমস্কার গ্রহণ করুন।

টাকা দেবার সময়ও যেমন, দেবার পরও বটে আমার মনে কোনো নতুন চিন্তা আসেনি। কাল সকালে মাকে এই তিরিশ টাকা দেবার খুবই দরকার ছিল—না দিতে পারার জন্যে একটু দুঃখ হয়তো হতো, কিন্তু তার চেয়েও বেশী উপকারে এই কটি টাকা কাজে লেগেছে—ভাবতেই আমার আনন্দ। মনটা কিন্তু খুসীতে ভরপুর হয়ে উঠলো।— হেঁটেই বাড়ী ফিরলাম সে রাত্রে। বিস্তীর্ণ গড়ের মাঠ ওপারে নির্মেঘ খোলা নীল আকাশের চাঁদোয়া নীচে এমন একখানা অবিরাম হাওয়ার ঢেউ।

ঘুম থেকে উঠেই আমার খবরের কাগজ না হলে চলে না—অবশ্য আমি উঠি খুব দেরীতে, তখন সকলের কাগজ পড়া প্রায় শেষ হয়ে যায়। এক হাতে চা আর অন্য হাতে কাগজ নিয়ে সকালটা অলস ভাবেই কাটিয়ে দিই—কিন্তু পরদিন সকালে খবরের কাগজের একটা ছোট্ট খবরের দিকে চোখ পড়তেই আমি চমকে উঠলাম—সংবাদটি একটি আত্মহত্যা সম্পর্কিত। গতরাত্রে গড়ের মাঠের পুকুরে মনোহর দাস তড়াগ না কি যেন নাম তার, তাতে একজন লোকের মৃতদেহ ভাসমান অবস্থায় দেখা যায়, পুলিশ মৃতদেহটি এখনো সনাক্ত করতে পারেনি—তার চেহারার বর্ণনা এই রকম—লোকটি বয়সে প্রৌঢ়, বলিষ্ঠ গঠন, দাড়ি গোঁফ বিশিষ্ট মুখ, ডান গালের ঠিক নীচে ছোট আকৃতির আলুর মতো একটি আব আছে, নীল আর সাদা স্ট্রাইপের হাফ সার্ট পরা।

কি রকম যেন খটকা লাগলো আমার। সেই লোকটিই না কালরাত্রে আমার কাছে দুঃস্থ জীবনের আনুপূর্বিক ইতিহাস জানিয়েছিল! অধীর অথচ বিশৃঙ্খল এক উদ্বেগে মনটা ছটফট করতে লাগলো।

তৎক্ষণাৎ আমি ছুটে বেরিয়ে গেলাম—মনোহর দাস তড়াগের সামনে। কিন্তু ধারে কাছে কোথাও কোনো মৃতদেহ রক্ষিত হয়েছে কিনা দেখতে পেলাম না, আশেপাশের লোকজনদের—তাদের কেউ বা পথিক, কেউ বা গাছতলার বাসিন্দা—জিজ্ঞাসা করলাম—একজন বললে—ঘটনাটি সত্য। মৃতদেহটি পুলিশ নিয়ে গেছে ময়না তদন্তের জন্যে।

সারাটা দিন মনটা বিক্ষিপ্ত হয়ে রইলো। কেমন যেন একটা করুণ বিষণ্ণতা মনটাকে ভার করে তুললো।

এই ভার মন নিয়েই বিকেলের দিকে ক্লাবে গেলাম। দেখি আমার জন্যে সেখানে সকলেই প্রতীক্ষা করে বসে আছে। আমি যেতেই সকলে কেমন যেন চঞ্চল হয়ে উঠলো।—আমার খবর কি, কাল সন্ধ্যা থেকে আজ এই সময় পর্যন্ত কি করেছি আমি, কি কি ঘটেছে আমার—সেই সংবাদ জানবার জন্যেই তারা সাংঘাতিক রকম ব্যগ্র।

আমারও কেমন সন্দেহ হলো, কৌতূহলও হলো। কোথায় যেন ব্যাপারটা জটিল হয়ে পড়েছে। গড়ের মাঠে কাল সন্ধ্যার ঘটনাটি বিশেষ করে দুঃস্থ মানুষটিকে ওই তিরিশটি টাকা দেওয়ার কাহিনী বর্ণনা করলাম।

বন্ধু, সামু—সকলেই প্রায় চমকে উঠলো—হ্যাঁ করেছিস কি ? ওই টাকা তিরিশটা তুই দান করলি ? রাসকেল—

তখনো ব্যাপার যে কি ঘটেছে বুঝতে পারলাম না। হাঁ করে বন্ধুবান্ধবদের মুখের দিকে ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে থাকলাম।

বন্ধু বললে—কাল কোন্ তারিখ ছিল—তোর স্মরণ নেই ? পয়লা এপ্রিল। ওই তিনটে দশ টাকার নোট যে আমাদের আর্টিষ্ট নবেন্দুর আঁকা—তোকে ঠকাবার জন্যে ও তিনটি নিখুঁত করে আঁকানো হয়েছে, আর তুই কিনা সেই নকল নোট তিনটে দান করে বসলি ?

চলতি দোতলা বাস থেকে ধপ করে পড়ে গেলে মানুষের যে দশা হয়—বন্ধুর কথা শুনে আমারও সেই দশা। মাথাটা যেন সহসা ঘুরে গেল। আমি বেরিয়ে পড়লাম ক্লাব থেকে গড়ের মাঠের দিকে ফাঁকা জায়গায়। আজ আর আকাশে বাতাসে সে বৈচিত্র্য নেই, বিস্ময় বা বিমোহন কিছুই নেই ; মানুষ জাতটার প্রতি বিশ্বাস আর শ্রদ্ধা যেন আমারই কমে আসতে লাগলো !





শহীদ-বেদী

সেই প্রত্যক্ষ সংগ্রামের যুগের কাহিনী।

সারাটা দিন এক রকম হৈ-হুল্লোড় করে কাটে। গোটা পাড়া একেবারে যাকে বলে সরগরম।

পড়ুয়াদের ইস্কুল-কলেজে যেতে হয় না, চাকুরেদের অফিসে যাওয়া বন্ধ, উকিল-মোক্তার, ব্যারিষ্টারদের আদালতে যাবার সাহস

শ্রীঅখিল নিয়োগী (স্বপনবুড়ো)

নেই! কি জানি, পথে কখন কি অঘটন ঘটে। পাড়ার তু' চার জন ডাক্তার—যাঁরা সকাল থেকে সন্ধ্যে অবধি সারা শহরে টহল দিয়ে বেড়াতেন—তাঁরাও একেবারে হাত গুটিয়ে বসে আছেন। ব্যবসায়ীরাও বেকার!

পৈতৃক প্রাণ বাঁচলে তবে ত' চিকিৎসে আর ব্যবসা! পাড়া থেকে কেউ বেরুতে পারে না বলেই সারাদিন গোটা পাড়া একেবারে জম্‌জমাট থাকে।

সকলের যখন আয় একেবারে বন্ধ সেই সময় খোঁড়া নিত্যানন্দের বৃহস্পতির দশা চল্‌ছে। তু'হাতে পয়সা কুড়িয়ে নিত্যানন্দ হাঁফিয়ে উঠ্‌ছে।

গলির মোড়েই ওর বেগুনী-ফুলুরীর দোকান।

যত অকর্ম্মার বিকেল বেলাটা আর কাট্‌তে চায় না! খেলাধূলো সব বন্ধ, পার্কে-ময়দানে কোনো সভা-সমিতি নেই, জলসা, নৃত্য-নাট্য, সিনেমা দেখার পথে একেবারে পাকা বেড়া। লোকের ব্যবসা নেই, বাণিজ্য নেই, বেড়ানো নেই, সারাটা সন্ধ্যে সময় কাটে কি করে? তাই ভীড় জমে খোঁড়া নিত্যানন্দের বেগুনী-ফুলুরীর দোকানের আশে-পাশে।

পাড়ায় যতগুলি রোয়াক ছিল সব ঘসে-মেজে তক্‌তকে ঝক্‌ঝকে করা হয়েছে। বিকেল থেকেই প্রত্যেকটি রোয়াক একেবারে সিনেমা-হাউসের মতো ফুল হাউস্‌ হয়ে ওঠে।

প্রত্যেকটি রকই আবার নানাভাবে বিভক্ত হয়ে গেছে। একটি হচ্ছে বুড়োদের রক। সেখানে হুঁকো থেকে ক্রমাগত ধোঁয়া উঠছে এবং দেশের কি তুর্দ্দিন উপস্থিত হল—সে সম্পর্কে প্রচুর

আলোচনায় কুণ্ডলীকৃত দীর্ঘ নিঃশ্বাস বাষ্প হয়ে আকাশে উঠে যাচ্ছে। প্রৌঢ়দের রক আলাদা, সেখানে বিপুল চীৎকারে তাস পেটানো চল্‌ছে।

পাড়ার বেকার যুবকবৃন্দের একটি পৃথক্ রক নির্দ্দিষ্ট আছে। সেখানে গোপনে বোমা তৈরীর সলা-পরামর্শ চল্‌ছে।

ইস্কুলের ছেলেদের রকে লুডো খেলা চল্‌ছে সকাল-বিকেল।

কিন্তু প্রত্যেক রকের অধিবাসীরাই এক প্রস্তাবে সবাই একমত যে, খোঁড়া নিত্যানন্দের দোকান থেকে গরম-গরম বেগুনী-ফুলুরী ভাজিয়ে চায়ের সঙ্গে আসর জমাতে হবে।

ফলে নিত্যানন্দ চাহিদা মেটাতে গিয়ে একেবারে হিম্‌সিম্ খেয়ে উঠ্‌ছে। বিকেল থেকে একা কুলিয়ে উঠ্‌তে পারছে না। ওর পিসি বাড়ীর ভেতর থেকেও গরম গরম ফুলুরী ভেজে পাঠিয়ে দিচ্ছে। তাই সোনা-মুখ করে গিল্‌ছে পাড়ার ছেলেবুড়ো, আণ্ডা-বাচ্চা সব।

নিত্যানন্দের পিসি উনুনে ঘন ঘন কাঠের চ্যালা ঢুকিয়ে দেয় আর বলে, ভাগ্যিস্ দাঙ্গা বেধেছিল—তাই আমাদের নিত্যানন্দ এমন দু পয়সা কামাতে পারছে। মারামারিটা যদি আরো বেশ কিছুদিন চলে তবে আমার নিত্যানন্দ একটা কোঠাবাড়ী তুল্‌তে পারবে।

একেই বলে কারো পৌষ মাস, কারো সর্ব্বনাশ! সব রোয়াকের আসরই দিব্যি জম্-জমাট চল্‌তে লাগ্‌লো, শুধু ইস্কুলের ছেলেরাই একেবারে অতিষ্ঠ হয়ে উঠল। কাঁহাতক্ আর দিন-রাত্তির লুডো খেলে ছয় ফেল্‌বার তপস্যা করা যায়!

দিনের বেলা তবু যাহোক গল্পের বই পড়ে, হাতের লেখা পত্রিকা লিখে, ছবি এঁকে কেটে যায়, কিন্তু রাত্তিরের থম্‌থমে আবহাওয়ায় ঘুম যেন আর কিছুতেই আস্‌তে চায় না!

আর মাঝে মাঝে দূর থেকে সেই বীভৎস চীৎকার ভেসে আসে! ওদের ঘুম যায় ভেঙে! বিছানায় শুয়ে শুয়েই ঘাম্‌তে থাকে ছেলের দল!

অনেক সময় মনে হয়—বাইরের গুণ্ডাগুলো বুঝি হৈ-হল্লা করে পাড়ার মধ্যে ঢুকে পড়ল! এই রকম অবস্থা হলে এক বাড়ীর সঙ্গে আর এক বাড়ীর সংবাদ চলাচল কি করে করা যায় সে সম্পর্কে একদিন পাড়ার সকলকে নিয়ে এক বিরাট সভা ডাকা হল।

নানা মুনির নানা মত!

কেউ বল্লেন, ইট, পাটকেল কাঠ দিয়ে গলির মুখ বন্ধ করে দেয়া হোক্। কেউ মন্তব্য করলেন, সব বাড়ীর ছাদের ওপর পিচ্ জ্বাল দিয়ে রাখা হোক্…গুণ্ডা ব্যাটারা এলেই তাদের মাথায় ঢেলে দেয়া হবে। পাড়ার যুবকেরা বল্লে, কিছু টাকা-কড়ি চাঁদা তুল্‌তে হবে। আমরা এমন জিনিস তৈরী করে রাখ্‌বো যে, বাছাধনদের আর ফিরে যেতে হবে না।

কিন্তু এইখানে প্রতিবাদ করে ছেলেরা। ঘণ্টেশ্বর বল্লে, একটা বিপদের আভাস পাওয়া গেলে যাতে এক বাড়ী থেকে আর এক বাড়ী খবর পাঠানো যায় তার বিজ্ঞান-সম্মত ব্যবস্থা রাখতে হবে।

একজন ইঞ্জিনিয়ার বল্লেন, ঠিক! ঠিক! ছেলেদের মাথা আছে। যুদ্ধের সময় খবর চলাচল করাটাই আসল দরকার। তার ওপরই জয় নির্ভর করে। আপনারা পাড়া থেকে চাঁদা তুলুন, আমি এমন ইলেক্‌ট্রিক বেলের ব্যবস্থা করে দেবো যে, সুইচ্ টিপ্‌লেই ঘণ্টা বেজে উঠবে। কিন্তু ইঞ্জিনিয়ারবাবু সেজন্যে যে হিসেব দাখিল করলেন তাতে সবাই সাত হাত পিছিয়ে গেল!

ভট্‌চাজ মশাই বল্লেন, কেন? আমাদের দেশী শঙ্খই ত' রয়েছে। কোন একটা বিপদের শব্দ কাণে এলেই শঙ্খ বাজিয়ে দেবে—

আবার কেউ সে প্রস্তাবের প্রতিবাদ জানিয়ে বল্লে, না, না, আমাদের কাঁসর ঘণ্টাই ত রয়েছে—

কিন্তু ইস্কুলের ছেলেদের এ প্রস্তাব মনঃপূত হয় না। ওরা চুপি চুপি বারোয়ারী সভা থেকে বেরিয়ে চলে এলো।

ভোলানাথদের পোড়ো বাগানের পেয়ারাতলায় বস্‌লো ওদের গোপন সভা।

খ্যাঁদারাম বল্লে, ধরতে গেলে এ ত' আমাদের একরকম যুদ্ধই চল্‌ছে, কাজেই—

ওর মুখের কথাটা লুফে নিয়ে চট্‌পটি উত্তর দিলে, নিশ্চয়, যুদ্ধই ত'! সেই যুদ্ধের সংবাদ আদান-প্রদানের জন্যে আমাদের বিংশ শতাব্দীর ব্যবস্থাকেই মেনে চল্‌তে হবে।

কাসুন্দী নাকটা কুঁচ্‌কে জিজ্ঞেস্ করলে, কিন্তু কি সেই বিংশ-শতাব্দীর ব্যবস্থা সেইটেই আগে খোলসা করে বলো শুনি—

ঘণ্টেশ্বর বল্লে, পায়রা পুষতে হবে।

—পায়রা? সবাই অবাক্ হয়ে জিজ্ঞেস্ করলে।

—পায়রা ত' লোকে খায় শুনেছি।

মন্তব্য করলে কাসুন্দী।

ভোলানাথ ফোঁড়ন কাট্‌লে, হ্যাঁ, পেঁয়াজ লঙ্কা বাটা দিয়ে তোফা হয়!

ঘণ্টেশ্বর রেগে উঠে উত্তর দিলে, তোর মুণ্ডু হয়। যুদ্ধের ইতিহাস পড়িস নি? শিক্ষিত পায়রা যুদ্ধের সময় এক শিবির থেকে আর এক শিবিরে সংবাদ নিয়ে চলে যায়, আবার সেই খবরের জবাব নিয়ে ফিরে আসে।

—ঠিক! ঠিক! একটা বইয়ে পড়েছিলাম বটে! উত্তর দিলে চট্‌পটি।

গম্ভীরভাবে ঘণ্টেশ্বর বল্লে, আমরাও ঠিক সেই রকম ভাবে পায়রা জোগাড় করে নেবো।

ভোলানাথের মনে দারুণ উৎকণ্ঠা।

—কিন্তু পায়রাকে ট্রেনিং দেবে কে?

ঘণ্টেশ্বর নাছোড়বান্দা। উত্তর দিলে, কেন আমরাই ট্রেনিং দেবো। কুকুরকে শেখানো যায়, ভালুককে শিখিয়ে নাচানো চলে, বানরকে শিক্ষা দিয়ে কসরৎ দেখানো হয়, আর আমরা এতগুলি ছেলে—একটি নিরীহ প্রাণী পায়রা,—তাকে ঠিক মতো শিখিয়ে নিতে পারবো না?

ওর কথায় সবাইকার উৎসাহ বেড়ে গেল। চীৎকার করে উঠ্‌ল এক সঙ্গে—ঠিক! ঠিক!

কিন্তু বেড়ালের গলায় ঘণ্টা বাঁধবে কে? পায়রা জোগাড় হবে কোত্থেকে?

এখন ত' আর শহরের সে অবস্থা নয় যে, চট্‌ করে বাসে চেপে বৈঠকখানার বাজারে চলে গেলাম, তারপর, পায়রা হোক, রাম পাখী হোক—যা হয় একটা কিনে নিয়ে এলাম। ছেলেদের মুখ দুশ্চিন্তায় কালো হয়ে ওঠে।

তাইত! এমন সুন্দর একটা প্ল্যান! সামান্য একটা পায়রার অভাবে এমন করে ভেস্তে যাবে?

সবাই ভুরু কুঁচকে মাথা নাড়ে,—কেউ কোনো হদিস পায় না।

হঠাৎ ভোলানাথ লাফিয়ে উঠে বল্লে, হয়েছে, হয়েছে,—মিলে গেছে।

কাসুন্দী উত্তর দিলে, কোথায় মিল্‌লো? তোর মগজে নাকি?

ভোলানাথ উত্তর দিলে, ঠাট্টা নয়রে, ঠাট্টা নয়। তবে বলি শোন। আমাদের পাড়ায় উত্তর কোণে ওই যে ভূতুড়ে বাড়ীটা আছে—ওর ভেতর প্রচুর পায়রা বক্‌-বকম্‌-কম্‌ করছে।

চট্‌পটি ভয়ে ভয়ে চোখ দুটি ছোট করে জিজ্ঞেস করলে, কিন্তু ওই ভূতুড়ে বাড়ীতে ঢুক্‌বে কে—শুনি?

ঘণ্টেশ্বর মাথা দুলিয়ে উত্তর দিলে, যদি বলি, চট্‌পটি ঢুক্‌বে—

তিড়িং লাফ মেরে চট্‌পটি আঁৎকে উঠে বল্লে, ওরে বাবা, আমি দিনের বেলাতেও ওবাড়ীতে ঢুক্‌তে পারবো না।

কাসুন্দী ফোঁড়ন কাট্‌লে, বেশত, দিনের বেলা ঢোকায় যদি অসুবিধে থাকে তাহলে নিশুতি রাত্তিরে ঢুকিস্‌!

এবার আর চট্‌পটি কোনো উত্তর দিলে না। শুধু শব্দ শোনা গেল—হুঁ!

কিন্তু পায়রার সন্ধান যখন পাওয়া গেছে—ঘণ্টেশ্বর তখন আর অপেক্ষা করতে রাজি নয়। তুড়ি মেরে বল্লে, ফুঃ! এই বিংশ শতাব্দীতে শহরের বুকের ওপর ভূত? ভূত যদি থাক্‌তো তা হলে ত' এই পায়রাগুলোকেই ওরা ধরে ধরে খেয়ে ফেল্‌ত!

ভোলানাথ এইবার উৎসাহিত হয়ে উত্তর দিলে, তা ত' হয়-ই নি, বরং ছা-পো নিয়ে ওরা গোটাবাড়ী দখল করে বসেছে।

ভূতের ভয়টা কিন্তু ছোঁয়াচে। একবার ওর নিঃশ্বাস গায়ে লাগ্‌লে সহজে যেতে চায় না। ফলে সবাই আম্‌তা আম্‌তা করে, কেউ আর এগুতে চায় না।

শেষকালে ঘণ্টেশ্বর চটে উঠে বল্লে, এতই যদি তোদের প্রাণের মায়া তবে থাক তোরা ঘরের কোণে বসে। কাউকে যেতে হবে না। আমিই গিয়ে একটা পায়রা ধরে নিয়ে আস্‌তে পারবো।

সবাই স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচলো।

চট্‌পটি বল্লে, রাগ না লক্ষ্মী। এম্‌নি মাঝে মাঝে একটু আধটু রাগ হলেই ত' ভালো।

কাসুন্দী ফোঁড়ন কেটে বল্লে, পুরুষ মানুষের রাগ থাকা ভালো, ওতে জীবনে উন্নতি হয়।

ঘণ্টেশ্বর আর ওদের কোনো কথার উত্তর দিলে না। কিন্তু ওর যে কথা সেই কাজ। পরদিন দেখা গেল, ঠিক একটা পায়রা ধরে নিয়ে এসেছে।

ছেলে-মহলে একেবারে হুল্লোড় পড়ে গেল। ওদের নিষ্কর্ম্মা জীবনে কাজের মতো একটা কাজ জুটেছে। আর সত্যি কথাই ত! দায়িত্ব ত' বড় কম নয়!



একটি পায়রাকে রীতিমত ট্রেনিং দিতে হবে—যাতে সে এক বাড়ী থেকে আর এক বাড়ী অন্ধকারের মধ্যে সংবাদ আদান-প্রদান করতে পারে।

ঘণ্টেশ্বরের দাবী সব চাইতে বেশী—কারণ সে পায়রাটা খুঁজে পেতে জোগাড় করে নিয়ে এসেছে। সকলের সম্মতিক্রমে সেই হল দলের গোদা। মানে "লিডার অফ দি পার্টি"।

প্রচুর উৎসাহ নিয়ে ছেলের দল পায়রাটাকে শিক্ষা দেবার কাজে লেগে গেল।

কাসুন্দীদের সোনা-রূপোর দোকান আছে। সে বল্লে, আমি পায়রাটার পায়ে রূপোর ঘুঙুর পরিয়ে দেবো। দেখ্‌তে ভারী সুন্দর হবে।

চট্‌পটি বল্লে, আমি চট্‌পট্ ওকে অ-আ-ক-খ আর A-B-C-D শিখিয়ে দেবো। সেই যে একটা সিনেমায় দেখেছিলাম একটা ওরাং ওটাং কেমন চমৎকার লেখাপড়া করতে পারে! ওরাং ওটাং এর মগজে যদি বুদ্ধি থাকে তা হলে আমাদের পায়রা আর লেখাপড়া শিখ্‌তে পারবে না?

ভোলানাথ বল্লে, আমি ভার নিলাম—ওকে বিভিন্ন দিকটা শিখিয়ে দেবো। কোন্‌টা উত্তর, কোন্‌টা দক্ষিণ, কোন্‌টা পূর্ব্ব—আর কোন্‌টা পশ্চিম—ও ঠিক-ঠিক জেনে নিতে পারবে। যুদ্ধের ব্যাপার,—দিক ভ্রম হলে আর রক্ষে আছে? হয় ত শত্রুপক্ষের শিবিরে গিয়ে হাজির হবে!

খ্যাঁদারামই বা পিছিয়ে থাক্‌বে কেন?

সে এগিয়ে এসে শুধোলে, তোরা ত সবাই এক এক জনে এক একটা ভার নিচ্ছিস, কিন্তু আসল কাজেই যে গলদ রয়ে গেল!

সবাই একসঙ্গে হৈ-হৈ করে উঠ্‌ল।

—অ্যাঁ! গলদ? কি গলদ শুনি?

—গলদ নয়? তেড়ে এলো খ্যাঁদারাম।

—সক্কলের আগে পায়রাটার একটা নাম ঠিক করতে হবে ত? কি বলে ওকে ডাক্‌বো আমরা শুনি?

তখন সকলের খেয়াল হল।

—হ্যাঁ, সত্যি কথাই ত! পায়রাটার একটা নাম আগে ঠিক করা দরকার। নইলে যে পড়ুয়ার নাম নেই, কি করে তাকে শিক্ষা দেয়া যাবে?

খ্যাঁদারাম মাথা দোলাতে থাকে।

—হুঁ! হুঁ! তোরা আঁকুপাঁকু করলে কি হবে? নাম আমি একটা ঠিক করে ফেলেছি।

পরম বিজ্ঞের মতো খ্যাঁদারাম মত প্রকাশ করে। ঘণ্টেশ্বর অসহিষ্ণু হয়ে উত্তর দেয়, আহা, নামটা যদি ঠিক করেই থাকিস্ ত বলে ফেল্ না!

খ্যাঁদারাম জিবটা দুই ঠোঁটের ওপর বুলিয়ে নিয়ে বল্লে, নাম হবে ওর "উড়ন্ত চাকি"—

সবাই একসঙ্গে সমর্থনসূচক উল্লাসধ্বনি জ্ঞাপন করে।

—চমৎকার নাম হয়েছে।

—বিউটিফুল!

—স্পেল্‌নডিড্!

—উড়ন্ত চাকি! হ্যাঁ, একটা নামের মতো নাম বটে!

—তোর মাথা আছে খ্যাঁদারাম। বেছে বেছে নামটা দিয়েছিস্ বেড়ে!

এই জাতীয় প্রশস্তি-বচনে খ্যাঁদারাম সম্বর্দ্ধিত হতে থাক্‌লো।

উড়ন্ত চাকিকে নিয়ে পাড়ায় তখন উড়ো খবর কত ছড়াতে লাগ্‌লো।

কেউ বল্লে, পায়রাটা ভূতসিদ্ধ। এতদিন ভূতুড়ে বাড়ীতে ছিল। কেউ রটিয়ে দিলে অসাধ্য সাধন করতে পারে এই পায়রা। আবার কেউ ফিস্ ফিস্ করে মন্তব্য করলে, মন্তর পড়ে ছেড়ে দিলে আর রক্ষে নেই! গুণ্ডার দল মরে একেবারে ভূত হয়ে থাক্‌বে।

গভীর রাত্তিরে উড়ন্ত চাকি শ্মশানে চলে যায় আর এক কাপালিকের হাত থেকে লাল সিঁদুরের কৌটা পরে আসে—পাড়ার কেউ কেউ নাকি এ ব্যাপারটাও দেখেছে!

এ হেন ভূত-সিদ্ধ উড়ন্ত চাকিকে নিয়ে পাড়ার ছেলে মহলে যে একটা হৈ-চৈ পড়ে যাবে—সে বিষয়ে আর সন্দেহ কি ?

উড়ন্ত চাকির থাক্‌বার যায়গা হল—ভোলানাথদের বাড়ী। একটা ঝুড়ির তলায় ওকে রেখে দেয়া হল।

ভোলানাথ সগর্ব্বে ঘোষণা করলে যে, সে খুব শীগ্‌গির একটা কাঠের বাক্স দিয়ে সুন্দর ঘর তৈরী করছে। সেইখানেই হবে উড়ন্ত চাকির আস্তানা।

ইতিমধ্যে ট্রেনিং দেয়ার কাজ পুরোদমে চল্‌তে থাক্‌লো। দলের গোদা ঘণ্টেশ্বর সারা সকাল এসে যা শেখায়—দুপুরবেলা চট্‌পটি এসে সে সব ভুলিয়ে দেয়। তার শেখাবার প্রণালী আবার সম্পূর্ণ আলাদা।

খ্যাঁদারাম যে চুপি চুপি সন্ধ্যের পর এসে কি শেখায় তা কেউ বল্‌তে পারে না!

কথায় বলে ওস্তাদের মার শেষ রাত্তিরে।

সেই ওস্তাদী বুদ্ধি ভোলানাথের মাথায় খেলেছে!

সে গভীর রাত্তিরে পায়রাটাকে নিয়ে ছাদে গিয়ে যে কী বিড় বিড় করে সে কথা বলা শক্ত!

ভোলানাথের বুড়ো ঠাকুমা বলেন, ওই ভূতুড়ে পায়রাটার ছোঁয়া লেগে ওকেও ভূতে পেয়েছে। নইলে অত রাত্তিরে ওই পায়রাটাকে নিয়ে ভোলানাথ ছাদে কি করে ?

এই ত গেল একদিককার খবর। অন্যদিকে আরো মজাদার খবর আছে।

উড়ন্ত চাকিকে খাওয়ানো নিয়েও ছেলেদের মধ্যে বেশ লুকোচুরি খেলা চল্‌ছে। কে যে কখন ফুড়ুৎ-ফুড়ুৎ করে এসে পায়রাটাকে কি বস্তু খাইয়ে যাচ্ছে—দেব্‌তারাও বুঝি তার সন্ধান রাখেন না।

কেউ খাওয়াচ্ছে—ক্ষুদ, কেউ পকেটভর্ত্তি করে নিয়ে আসছে নানাজাতীয় শস্য, অন্য কেউ ছাতু, পোকা-মাকড়ও কৌটোতে পুরে নিয়ে আস্‌ছে উৎসাহী ছেলেরা।

গোপনে আবার অনেকে বিজ্ঞানের বই পড়তে সুরু করেছে। পায়রা কখন কি খায়, সব জেনে নিতে হবে ত!

এত আদর আর অভ্যর্থনার চাপে পড়ে পায়রাটা ত্রাহি-ত্রাহি ডাক ছাড়ছে। কিন্তু মাষ্টার-মশাইদের সেজন্যে উৎসাহের বিন্দুমাত্র কামাই নেই। তারা সবাই পণ করেছে উড়ন্ত চাকিকে বিভিন্ন বিষয়ে শিক্ষা দেবেই।

ঘণ্টায় ঘণ্টায় ক্লাশ বস্‌ছে, কিন্তু কেউ কারো ট্রেনিংএর কথা অপরকে জানাচ্ছে না! প্রত্যেকেরই মনের বাসনা—তারই শিক্ষায় পায়রাটা রাতারাতি দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত হয়ে উঠুক।

ওদিকে পাড়ার ছেলেরা ক্রমাগত ভোলানাথের পেছনে লেগেই আছে। কবে উড়ন্ত চাকির জন্যে কাঠের ঘর তৈরী হবে সেটা না জান্‌তে পারলে তাদের পেটের ভাত হজম হচ্ছে না!

ভোলানাথ বলে, আমি ভালো মিস্ত্রির কাছে অর্ডার দিয়েছি। এমন নক্সাকাটা সুন্দর কাঠের ঘর তৈরী করে দেবে যে, তোদের সবাইকার দেখে একেবারে তাক্ লেগে যাবে!

ছেলেরা ত' অবাক্ হয়ে ভিরমী খেয়েই পড়তে চায়। কিন্তু সেই সুযোগ তাদের দিতে হবে ত?

ইতিমধ্যে কে কে যেন রটিয়ে দিয়েছে যে, ভূতসিদ্ধ এই পায়রার এক টুক্রো পালক নিয়ে মাদুলী করে ধারণ করলে লোকের অসুখ-বিসুখ সারে, কাণা ও অন্ধের চোখ মেলে, বিকলাঙ্গ পূর্ণদেহ ফিরে পায়, অপুত্রকের পুত্র হয়, নির্ধনের ধন মেলে!

এই খবরের পর পাড়ার মেয়ে মহলে সাজ—সাজ রব পড়ে গেছে। অমূল্যের পিসি, হাদার দিদিমা, ফট্‌কের মাসি, কার্ত্তিকের ঠাকুমা, ক্যাবলার ঠান্‌দি সবাই এসে হুম্‌ড়ি খেয়ে পড়েছে ভোলানাথদের বাড়ী।

—ও বাবা ভোলানাথ, আমার জন্যে একটুক্‌রো পালক তুলে দে। একশ বছর তোর পরমাই হবে। ধনে পুত্রে লক্ষীলাভ হবে তোর।

কিন্তু ভোলানাথ একেবারে মারমুখী। একটা লোহার ডাণ্ডা হাতে করে ক্রমাগত মাথার ওপর ঘোরাচ্ছে আর বল্‌ছে, খবরদার, কেউ উড়ন্ত চাকির কাছে এগুবে ত তার মাথা আমি গুঁড়িয়ে ছাতু করে দেবো।

ওর ওই মারমুখী মূর্ত্তি দেখে সবাই শাপ-মুন্যি দিতে দিতে ঘরে ফিরে গেছে।

—হুঁ! এত বাড় ভালো নয়। আমরা পাড়ার ঠান্‌দি, পিসিমা, দিদিমা, মাসিমা……আমাদের এমনি করে ফিরিয়ে দেয়া। তেরাত্তির পোয়াবে না। দেখে নিস্…বলে দিলাম একটি কথা!

ভোলানাথ রসিকতা করে উত্তর দিলে, হুঁ! শকুনের শাপে যদি গরু মরত তা হলে আর ভাবনা ছিল না! এখন আমি দিব্যি করে খাবো-দাবো, তারপর উড়ন্ত চাকিকে এমন ট্রেনিং দেবো যে, কোনো শাপ-মুন্যি তার গায়ে লাগবে না।

ছুতোর মিস্ত্রিটা বলেছে, কাল সকালে সে পায়রার কাঠের বাসা তৈরী করে দিয়ে যাবে। সেইটে দেখবার জন্যে পরদিন সকালবেলা পাড়ার ছেলেদের দারুণ ভীড় হবে। উড়ন্ত চাকির গৃহ-প্রবেশ উপলক্ষে ছেলেদের গরম মুড়ি আর বেগুনী খাওয়াতে হবে।

অনেক রাত্তির পর্য্যন্ত ছাদে নিয়ে গিয়ে ভোলানাথ পায়রাটাকে কি যেন সব শেখালে। তারপর রোজকার মতো ওকে ঝুড়িটার তলায় চাপা দিয়ে শুয়ে পড়ল।

ঘুমের ভেতর শেষ রাত্তিরে সে স্বপ্ন দেখতে লাগল, যেন উড়ন্ত চাকির গৃহ-প্রবেশ উৎসব হচ্ছে। পাড়ার ছেলেরা নানারকম সাজে সেজে এসেছে। ঘন্টেশ্বর যেন সানাইয়ে পোঁ ধরেছে। কিন্তু উড়ন্ত চাকি কিছুতেই নতুন কাঠের বাড়ীতে ঢুক্‌বে না। প্রবল আপত্তি জানাচ্ছে সে।

হঠাৎ একটা ঝট্‌পট্ শব্দ আর বিচ্ছিরি আওয়াজ শুনে ভোলানাথের ঘুম ভেঙে গেল!

কী সাংঘাতিক কাণ্ড !

ঝুড়িটার তলায় পায়রাটা দিব্যি চাপা দেয়া ছিল। কোত্থেকে ওদের হুলো বেড়ালটা এসে, ঝুড়িটা উল্টে দিয়ে উড়ন্ত চাকির টুটি কামড়ে ধরেছে।

একটা দারুণ চীৎকার করেই পায়রাটা একেবারে নেতিয়ে পড়ল।

ভোলানাথ কি যে করবে কিছুই বুঝ্তে পারল না। শুধু বোকার মত ফ্যাল্ ফ্যাল্ করে তাকিয়ে রইল !



তাদের এত সাধের উড়ন্ত চাকি শেষকালে এই ভাবে পটল তুল্‌লো ?

ওই যে কথায় বলে না—দুঃসংবাদ বাতাসের আগে যায় !

দেখ্তে দেখ্তে এই খবর চারদিকে ছড়িয়ে পড়ল। ছেলের দল হুম্ড়ি খেয়ে পড়ল সক্কলের আগে। তাদের সবাইকার মুখে কে যেন বোবাকাঠি ছুঁইয়ে দিয়েছে। না পারছে এই হৃদয়-বিদারক দৃশ্য দেখ্তে, না পারছে প্রাণ খুলে দুদণ্ড কাঁদ্তে !

ইতিমধ্যে পাড়ার ঠান্‌দি, পিসিমা, দিদিমার দলও এসে হাজির। দাঁতে মিসি দিয়ে তারা কোমরে আঁচল জড়িয়ে ঝগড়া করতেই এসেছে।

বল্লে, আমাদের শাপ-মুন্যিতে নাকি কোনো কাজ হয় না ? তখুনি বলেছিলাম, এত বাড় ভালো নয় ! শকুনের শাপে গরু মরে কিনা—এইবার তাকিয়ে দেখ সবাই !

কিন্তু আশ্চর্য্য কাণ্ড !

এত শক্ত-শক্ত কথা শুনেও ছেলের দল আদপেই চট্‌ল না।

ওরা যেন সবাই একেবারে ষ্ট্যাচু হয়ে গেছে !

এ সময় কি বলা উচিত, কি করা উচিত—ওরা যেন সব ভুলে গেছে !

এই অসহ্য নীরবতা কি চিরকাল ধরে থাকবে ?

হঠাৎ দেখা গেল ঘণ্টেশ্বর ভেউ ভেউ করে কাঁদ্‌ছে! তারপর সে চীৎকার করে বল্লে, শহীদ হয়েছে আমাদের উড়ন্ত চাকি—!

—অ্যাঁ! শহীদ!!!

ছেলের দল বিস্ময়ে, বেদনায় আর উল্লাসে আর্ত্তনাদ করে উঠ্‌ল সঙ্গে সঙ্গে!

ঘণ্টেশ্বর বল্লে, হ্যাঁ, শহীদই ত! ও এসেছিল গুণ্ডাদের হাত থেকে আমাদের উদ্ধার করতে। এমনি সাঙ্ঘাতিকভাবে সে আত্মোৎসর্গ করল! শহীদের দুর্লভ স্থান অধিকার করেছে আমাদের উড়ন্ত চাকি। তার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার যথাযোগ্য ব্যবস্থা আমাদেরই করতে হবে।

ঠাকুমা-পিসিমা-দিদিমার দল মুখ ঝাম্‌টা দিয়ে চলে গেল। যেতে যেতে ফোঁড়ন কাট্‌লে, হুঁ, এইবার যাও সবাই, খুড়োর গঙ্গা যাত্রা করাও গে।

কিন্তু ছেলের দল আজ আদপেই চট্‌ল না।

ভোলানাথ বল্লে, তুই ঠিক বলেছিস ঘণ্টেশ্বর। উড়ন্ত চাকি শহীদ হয়েছে। ওর মৃতদেহ নিয়ে একটি শোকযাত্রা বের করতে হবে।

চট্‌পটি বল্লে, আমি তাড়াতাড়ি একটা শোক-সঙ্গীত লিখে নিয়ে আসি। শোকযাত্রা পরিচালনার সময় সবাই মিলে সেই গানটা কোরাসে গাইতে হবে।

খ্যাঁদারাম বল্লে, নিশ্চয়। আমি হারমোনিয়ামটা নিয়ে আসি আমাদের বাসা থেকে,—একটা রিহার্সেল দিয়ে নিতে হবে ত!

কাসুন্দী এইবার এগিয়ে এলো। বল্লে, একটি "শহীদ-বেদী" তৈরী করতে হবে। আমি জনকয়েককে নিয়ে পাড়ার যত ইট পাবো সব কুড়িয়ে নিয়ে আস্‌বো।

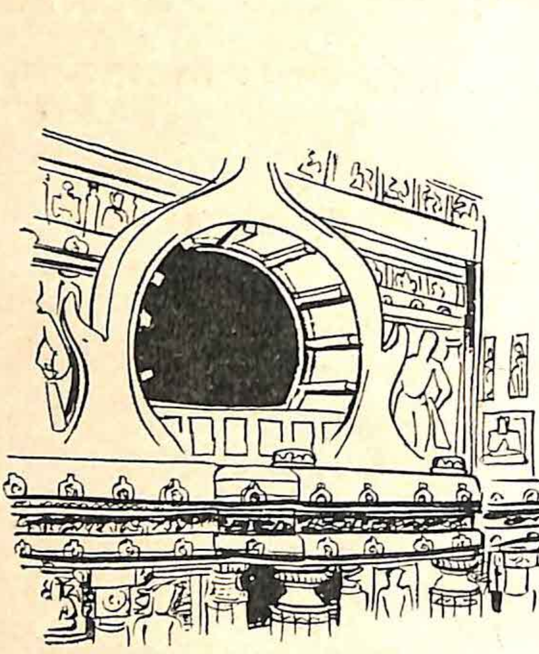
খ্যাঁদারাম শুধোলে, কিন্তু শহীদ-বেদী কোথায় তৈরী হবে?

বুক চিতিয়ে এলো ভোলানাথ। উত্তর দিলে, আমাদের বাগানের পেয়ারা গাছের তলায় শহীদ বেদী হতে পারবে। তাতে ভাবনা কি?

কোথা থেকে এলো রাশি রাশি ফুল, কে যেন নিজের টেবিল ক্লথ ছিঁড়ে সাদা কাপড় নিয়ে এলো। তাই দিয়ে মৃতদেহ ঢেকে দেয়া হবে। ছেলেরা এক শোক-যাত্রা বের করে শোক-সঙ্গীত গাইতে গাইতে পেয়ারা তলার দিকে এগিয়ে চল্লো। ইতিমধ্যে বহু ভাঙা আর আস্ত ইট সংগ্রহ করা হয়েছে সেখানে।

তাই দিয়েই শহীদ-বেদী তৈরী করা হবে।

তারপর বহুদিন কেটে গেছে। যদি তোমরা কোনো দিন নাম ভুলে গোকুল গণেশ গন্ধ-বণিকের গলিতে ঢোকো ত' দেখ্‌তে পাবে—ভোলানাথদের সেই পড়ো জমির পেয়ারা তলায় সেই শহীদ-বেদী আজও আছে!



অজন্তা গুহা

তোমরা সবাই অজন্তা গুহার কথা শুনেছো। আর তার বিশ্ববিখ্যাত ছবির কথাও জানো। কিন্তু ঐ গুহার কারুকার্য্য আর ঐ ছবি ছাড়া আর তেমন কিছু শুনেছো কি?

অজন্তা জায়গাটা উত্তর হায়দরাবাদ ষ্টেটে আওরঙ্গাবাদ জেলায়। অথচ অত নাম করা জিনিষটা যে কোন্ রাজা কত সন তারিখে তৈরী করেছেন তার কোন হদিসই পাওয়া যায় না। এটাই আশ্চর্য্য! মানুষের বিশ্ববিখ্যাত সৃষ্টিগুলোকে বিশ্ববিখ্যাত লোকেরাই করেছে দেখা যায়, —যেমন তাজমহল তৈরী করিয়েছে সাজাহান, মিশরের বড় পিরামিড তৈরী করিয়েছে মিশরের ফারাও খুফু (Cheops), ইত্যাদি। কিন্তু অজন্তা তৈরীতে কোনো ইতিহাস-বিখ্যাত রাজার নাম নেই!

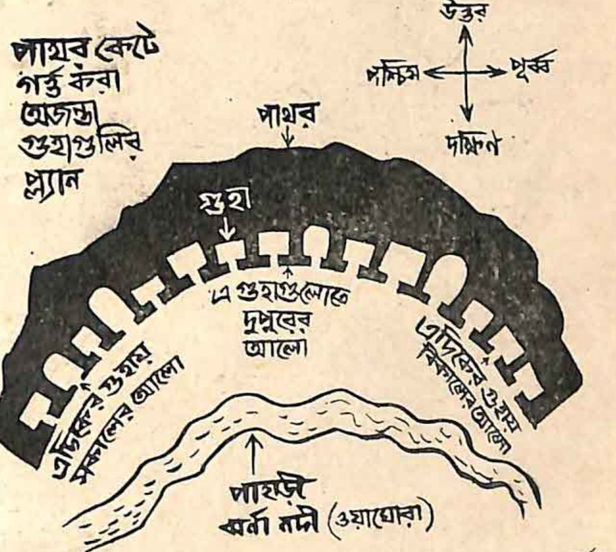
এর কারণ বলছি শোনো! অজন্তা গুহাগুলো কোনো একজন রাজার তৈরী নয়! শুধু তাই নয়। এই ২৯টী গুহা একটা একটা করে প্রায় আটশো বছর ধরে তৈরী হয়ে এসেছে। এক একটা গুহা এক একজন সামন্ত ধরণের রাজা বা তখনকার দিনের অবস্থাপন্ন গোষ্ঠী বা বণিক্ তৈরী করিয়েছে। তাই সব চাইতে মজা এই যে, ভারতের লোকেরা হাজার বছর ধরে জানতোই না যে তাদের দেশে অমন সুন্দর একটা জিনিষ আছে। নেহাৎ, হঠাৎ ১৮১৯ সালে মহারাষ্ট্র-যুদ্ধের শেষ সময়ে ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানীর কতকগুলো গোরা সৈন্য তৃষ্ণার্ত্ত হয়ে জলের খোঁজে গিয়ে ওখানকার ঝরণাতে উপস্থিত হয়। তখন ওপরে পাহাড়ের দিকে তাকাতেই ওদের মাথা ঘুরে গেল!—

"হ্যালো জনি! ওপরে এগুলো কীরে? এ যে আলাদীনের দৈত্যের দেশের চমৎকার রাজবাড়ী সব বনের মধ্যে লুকিয়ে রয়েছে! ঐ দেখ, ঐ দেখ! আরে বাঃ! ওয়াণ্ডারফুল।"

এমনি করেই অজন্তা গুহার পুনঃ আবিষ্কার হলো! তাও হাজার বছর পরে। তবেই বুঝে দেখ, আমরা ভারতীয়েরা কত অপদার্থ যে বাইরের থেকে সাহেবরা এসে আমাদের বলে দিয়ে গেলে তখন আমাদের জ্ঞান হয় আমাদের দেশে কত অমূল্য সম্পদ্ রয়েছে! কিন্তু তা জেনেও আমরা আমাদের জাতির উন্নতির জন্যে এতদিন ধরে কি করেছি? তাই বোধহয় রবীন্দ্রনাথ দুঃখ করে বলেছিলেন—

মোক্ষমুলর বলেছে "আর্য্য"
তাই শুনে সব ছেড়েছি কার্য্য,
আমরা মহান্ করেছি ধার্য্য;
আরামে রয়েছি শুয়ে!

যাক্। এখন আসল কথা শোনো। অজন্তা গুহাগুলোর তৈরীর ধরণটা জানোতো? জায়গাটা ভারী সুন্দর একটি বনের পরিবেশের মধ্যে রয়েছে। একটা পাহাড় অর্ধচন্দ্রাকৃতি ভাবে দক্ষিণ-মুখো হয়ে উঠেছে। ঠিক এরই নীচু দিয়ে ছোট্ট একটা ঝরণা কুলুকুলু করে বয়ে যাচ্ছে। গোরা সৈন্যেরা ঐ ঝরণাতেই জল খেতে গিয়েছিলো। এই ধরণে, ঐ অর্ধচন্দ্রের পশ্চিম ধারটা পূব-মুখো হয়ে পড়ে, আর পুবের দিক্‌টা পশ্চিম-মুখো হয়ে পড়ে। তবেই বুঝে দেখো, সূর্য্য ওঠার থেকে বেলা পড়ে আসা পর্য্যন্ত সমস্ত গুহাগুলোতে ধীরে ধীরে সূর্য্যের আলো ঘুরে এসে সূর্য্য ডুবে যায়।

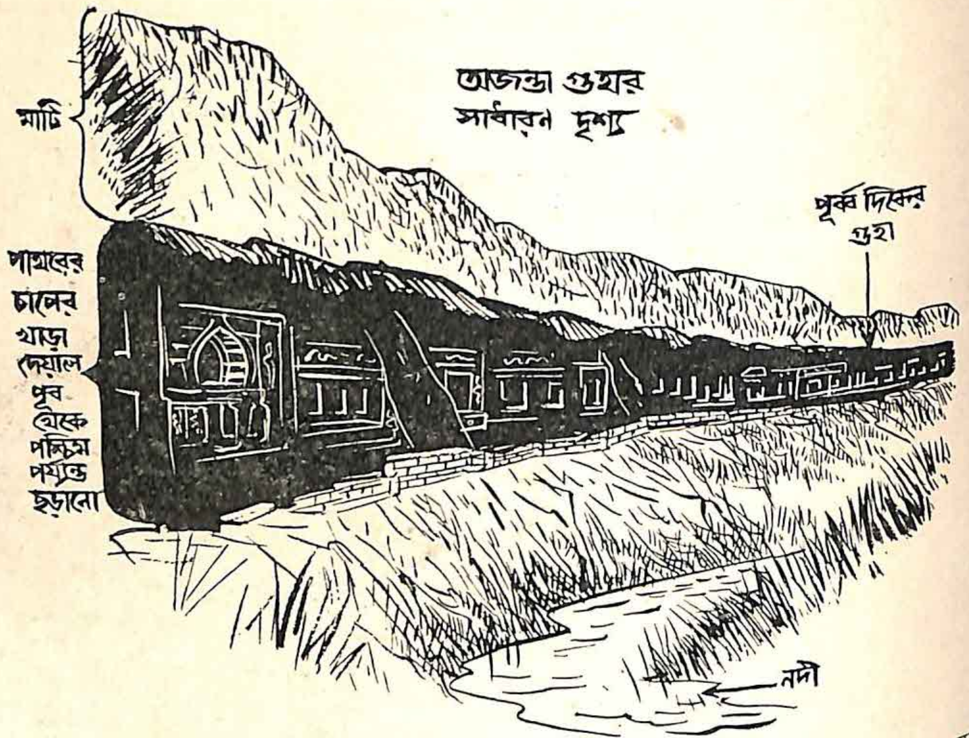


কি সুন্দর দৃশ্য তা'হলে এ জায়গাটার! ভারতীয়েরা তাদের মন্দির ও বিহারগুলোকে চিরকাল এমনি সুন্দর পরিবেশে বসিয়ে এসেছে। কোণারক ও জগন্নাথকে সমুদ্রের বেলাভূমির উপরে, কেদারবদরীকে তুষারশুভ্র snow-line বা দেবলোকের দেশে, অমরনাথকে বরফের গুহায়, কন্যাকুমারীকে দক্ষিণ সাগরে দক্ষিণ মেরুর দিকে মুখ করে।

এবার অজন্তা গুহা তৈরীর পদ্ধতির কথা শোনো। অজন্তার পাহাড়টা খাড়া হয়ে উঁচু উঠে গেছে। এই পাহাড়েরই নীচ থেকে দোতলা, তেতলা আন্দাজ উঁচু জায়গা ধরে একটা মস্ত

পাথরের স্তর পাহাড়ের অর্ধচন্দ্রটাকে ধরে এধার ওধার পর্য্যন্ত চলে গেছে। এটা শুধুই পাথর। আর এই পাথরগুলোর মধ্যেই হাতুড়ী ছেনী দিয়ে কেটে অজন্তার গুহা বানানো হয়েছে।

আচ্ছা, বলো দেখি তোমাকে যদি এই রকম একটা পাথরের লম্বা স্তরের মধ্যে গুহা-মন্দির বানাতে দেওয়া হয়, তবে তুমি এই পাথরের কোন্‌খানটাকে বেছে নেবে? নিশ্চয়ই ঠিক মধ্যিখানটা, তাই না? অজন্তাতেও সেইজন্য প্রথম যুগে গুহা যেগুলো তৈরী হয়েছিলো সেগুলো হচ্ছে মধ্যিখানকার গুহা। আর, যতই যুগের পর যুগ পেরিয়ে যেতে লাগলো ততই পরের গুহাগুলো ডাইনে বাঁয়ে তৈরী হতে হতে শেষে সমস্ত পাথরের স্তরটা ধরেই দুদিকে ছড়িয়ে পড়লো আস্তে আস্তে।



এবার গুহাগুলোর কথা বলি। গুহাগুলো কত কালের পুরানো জানো? ওর শেষ সময়কার গুহাগুলো গুপ্তদের শেষ যুগ পর্য্যন্ত তৈরী হয়েছে। হিউয়েন-সাং এ গুহাগুলো দেখেছেন। তখন পর্য্যন্ত নিশ্চয়ই ও জায়গাটা মানুষজনে জমজমাট হয়েছিলো। এখন অবশ্য ওর আশপাশে চার মাইল পর্য্যন্ত স্থান জনমানবশূন্য। একেই বলে কালের গতি!

গুহাগুলো ওখানে প্রথম কবে তৈরী হয় জানো? প্রথম গুহাগুলো অশোকের পরের সময়ে তৈরী। তাহ'লে হিসাব করলে দেখা যায়, অজন্তা গুহাগুলো অশোকের সময় থেকে গুপ্ত যুগের শেষ পর্য্যন্ত এই ৮০০ বছর ধরে তৈরী হয়ে এসেছে। আটশো বছর কতদিন বল দেখি! এখন ১৯৫৫ সাল

থেকে পৃথ্বীরাজ ও সংযুক্তার ঘটনা আটশো বছর আগে ঘটেছিলো। তবেই আন্দাজ করে নাও, অজন্তা গুহাগুলো কতকাল ধরে মানুষের ধর্ম্মস্থান হয়ে ছিলো।

অজন্তা গুহাগুলো কিন্তু সবই বৌদ্ধদের তৈরী। ওর মধ্যে জৈন বা ব্রাহ্মণদের কোন চিহ্ন নেই। তোমরা ইতিহাসে পড়েছো বৌদ্ধধর্ম্মকে দু'ভাগে ভাগ করা হয়েছিলো। প্রথমকার বৌদ্ধধর্ম্ম ছিলো 'হীনযান', অর্থাৎ যেটাতে বুদ্ধদেবকে মূর্ত্তি গড়ে ও খুব অলংকার দিয়ে দেবতার ভাবে উপাসনা করা হতো না। দ্বিতীয়টি হচ্ছে, 'মহাযান' বৌদ্ধধর্ম্ম, এটা কনিষ্কের যুগের থেকেই আরম্ভ হয়, আর এতে বুদ্ধকে মূর্ত্তি গড়ে ও খুব অলংকার দিয়ে অন্যান্য হিন্দু দেবদেবীর সংগে পূজো করা হয়।

তাই, তোমরা যদি অজন্তায় কখনো যাও তবে দেখবে যে মাঝখানকার গুহাগুলো খুব সাধারণ



মধ্যেকার স্তূপে বুদ্ধের মূর্ত্তি নেই



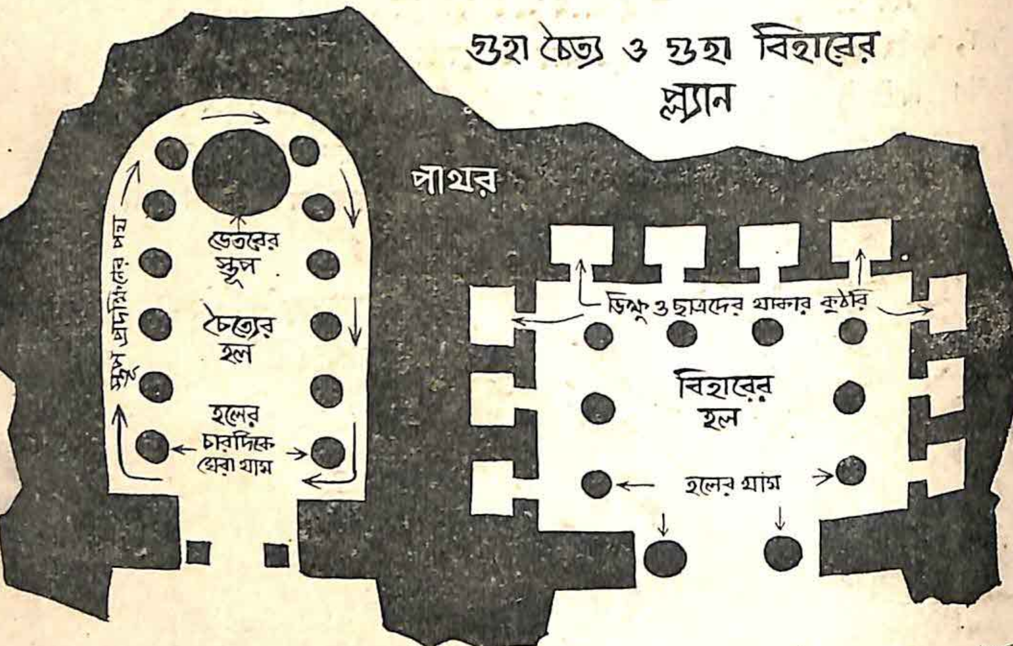
স্তূপের বুদ্ধমূর্ত্তি ও কারুকার্য্য

ভাবে তৈরী। আর ওতে অলঙ্কারের কাজ কম, অর্থাৎ, ওগুলো হচ্ছে (যেমন নয়, দশ নম্বর গুহা) হীনযান-ওয়ালাদের তৈরী গুহা।

বৌদ্ধদের গুহা দু'রকমে তৈরী হতো। একটাকে বলা হয় "চৈত্য" অর্থাৎ যেটাতে উপাসনা করা হয়। এগুলোর ভেতরটা অনেকটা গির্জার ধরণে তৈরী ও ভেতরে শেষ কোণার মাঝখানে একটা স্তূপ থাকে সেটাতে মহাযান-ওয়ালারা বুদ্ধের মূর্ত্তি বসাতে আরম্ভ করলো উপাসনা করার জন্য দ্বিতীয় ধরণের গুহার নাম হচ্ছে "বিহার"। এগুলোতে বৌদ্ধ ভিক্ষু ও ছাত্রেরা মেস-বোর্ডিয়ের মতো বাস করতো লেখাপড়ার জন্য। এর মাঝখানটাতে মস্তবড় একটা হল থাকে। আর চারদিকে ছোট ছোট কুঠুরি থাকে যেগুলোতে বৌদ্ধ ছাত্র মাষ্টাররা বাস করতো।

বৌদ্ধধর্ম্মের একটা বিশেষত্বই হলো এই যে ওটা একটা ফূর্ত্তিবাজ ও আনন্দের ধর্ম্ম। এখানে কোনো উপোস-কাপোসের বালাই নেই; কোনো শারীরিক, মানসিক কষ্ট নেই। খালি লেখাপড়া

করো আর আনন্দে জীবন কাটিয়ে নির্ব্বাণ লাভ করো। কোনো প্রাণীকে মেরে পর্য্যন্ত নিজের মনকে কষ্ট দেবে না। গৌতম বুদ্ধের এই সব উপদেশ ত তোমরা জানোই। এইজন্য, এইসব বৌদ্ধগুহার মধ্যে যে সব ছবি রয়েছে সেগুলো খুবই স্বাভাবিক আর ধর্ম্মের নীতি ও গোঁড়ামি বর্জিত জিনিষ।



আর তার ফলেই আর্টিষ্টরা প্রাণ খুলে তুলির এক একটা বলিষ্ঠ টানে মনের আনন্দে ছবি আঁকতে পেরেছে যার জন্যে অজন্তা পৃথিবীবিখ্যাত। এখনও অজন্তার ছবির পাশে সৌন্দর্য্যে একমাত্র দাঁড়াতে পারে ইটালীর বিশ্ববিখ্যাত ছবিগুলি। এটা হচ্ছে সাহেবদের নিজ মুখের কথা।

যে মহাসত্য সর্ব্বব্যাপী ও সর্ব্বভূতে বিদ্যমান তাহার পূর্ণ পরিচয় লাভ করিতে হইলে বিশ্বের ক্ষুদ্রতম পদার্থকেও ভালবাসিবার শক্তি লাভ করিতে হইবে। যিনি এই শক্তি লাভ করিবার আকাঙ্ক্ষা হৃদয়ে পোষণ করিয়া থাকেন তিনি জগতের কোনও কাজ হইতেই দূরে থাকিতে পারেন না। সত্যের প্রতি এই আনুরক্তিই আমাকে রাজনীতিক্ষেত্রে আকৃষ্ট করিয়াছে।

—মহাত্মা গান্ধী



মজার চাষা

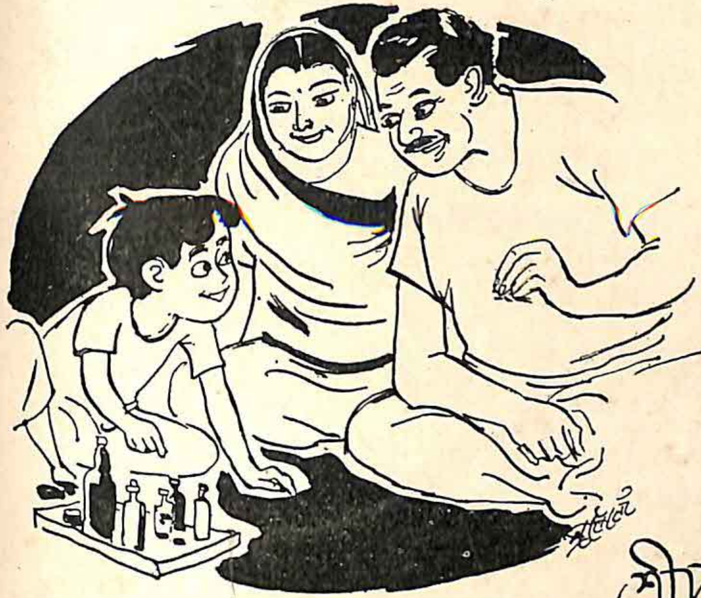
পৃথ্বীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

রাজার যত শান্ত্রী সেনা ছুটলো দেশে দেশে :
শুনল সবে, 'কোনো রসিক রাজপুরীতে এসে
গল্প যদি করতে পারে এমন মজা করে
যা শুনে খোদ রাজামশাই অবিশ্বাসের ভরে
খাঁটি গুজব ভাবতে পারেন,—সোনার আনারস
সেই গুণীরে দেবেন রাজা বাড়াতে তার যশ !'...
দেশ-বিদেশের ছোট বড় গুণীর সমাবেশে
রাজার প্রাসাদ গল্পে কথায় উঠল যেন হেসে।
কিন্তু সবার গল্প শুনেই রাজা বলেন, "আরে
এই কি আবার গুজব নাকি ?"—গুণীরা সব হারে।
এমন করে দিন কাটে আর কাটে অনেক রাত—
হঠাৎ প্রাসাদ-দুয়ারতলে জানায় প্রণিপাত
অজানা এক গেঁয়ো চাষা, হাতে বিরাট জালা ;
ঘৃণার বশে সবাই তাকে বললে, "বেটা পালা,
নয়ত রাজার সৈন্য এসে কয়েদখানায় তোকে
রাখবে পুরে" !—কিন্তু চাষা গোঁয়ারতুমির ঝোঁকে

ঢুকল সোজা রাজার ঘরে, করল নমস্কার,
তারপরে সে বললে, "প্রভু, দয়ার অবতার,
মনে পড়ে গত বছর এমনিতর সাঁঝে
আমার থেকে জরুরী এক কি জানি কোন কাজে
ধারে নিলেন এই জালাটা ভরতি সোনার টাকা ?
গরীব আমি, তাই সে-কথা রইল আজো ঢাকা !"
—রাগে রাজা কাঁপতে থাকেন, "মিথ্যাবাদী, চাষা,
এ-সব কথা গু-জ-ব নেহাৎ—" বললে চাষী, "খাসা !



দয়া করে রাজামশাই সোনার আনারসে
প্রদান করুন দাসের হাতে অপার কৃপার বশে।"
শুনে রাজা চমকে উঠে বলেন, "আরে সেকি ?
ধারের কথাই সত্যি বেজায়, কে বলে তা মেকি ?
চাষী তখন বললে হেসে, "তা বেশ, মহারাজ
ধারের টাকা শোধ করে দিন,—ঘরে ফিরি আজ।"
মহা বিপদ্ ! অনেক ভেবে সোনার আনারস
চাষীর হাতে দিলেন রাজা,—রটল চাষীর যশ !



পড়ার খেলা

শ্রীদক্ষিণারঞ্জন বসু

এবার কী হবে? সব ছেড়েছুড়ে না দিয়ে আর উপায় কী এখন?

ছোট্ট ছেলে কমল মাথা নেড়ে নেড়ে আপন মনেই বলে চলে।

কতো লোককে আর গুলী করে মারবে ওরা? ওদের গোলাগুলী সব ফুরিয়ে যাবে না!—একা একা এক মনে খেলতে খেলতে নিজেই নিজেকে প্রশ্ন করে কমল। উত্তর তো তার সব আগে থেকেই ঠিক করা আছে।

কমলের খেলার মালমসলা সব বিচিত্র!

একটা সাবানের বাক্সের ঢাকনি। ছোটবড়ো কতোগুলো শিশি বোতল। গোটা কয়েক কৌটা। একখানা চামিচ। আর ঝাঁটার কাঠির অনেকগুলো টুকরো। এ ছাড়াও আরো কতো কী যে জড়ো করা হয়েছে তা হিসেব করে বলা কঠিন।

সেই কখন থেকে খেলা হচ্ছে, এবার একটু লেখাপড়া নিয়ে বসো—ঘরের কাজকর্ম শেষ করে মা এসে বলেন কমলকে।

বারে, আজ রবিবারও বুঝি একটু বেশি করে খেলব না!—কমল খুব সহজভাবেই উত্তর দেয়।

বেশতো, এতোক্ষণ ধরে তো খেলা হলো। এবার খানিকক্ষণ পড়ে নাও, তারপর আবার খেলবে।

এটাতো মা পড়ারই খেলা হচ্ছে!

সে আবার কী কথা!

ও তা তুমি জান না বুঝি! দাদা বলেছেন, ভারতবর্ষ স্বাধীন হয়েছে, গোয়া এখনো পরাধীন। গোয়াকে স্বাধীন করবার জন্যে এখন যুদ্ধ চলছে। গোয়া যে আমাদের দেশেরই একটা অংশ!

তা তুমি ওসব দিয়ে কী করছ?—মা জিজ্ঞেস করেন।

বারে, তুমি কিছুই জাননা। এই দেখছ না গোয়া!—সাবানের বাক্সের ঢাকনিটাকে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে মাকে বোঝাতে চায় কমল। দোতলার প্রকাণ্ড বারান্দাটা হলো পৃথিবী। তারই একটা বড়ো অংশকে সে ভারতবর্ষ বলে ধরে নিয়েছে। সেই ভারতবর্ষের মধ্যে ঐ সকলের বাক্সের ঢাকনিটুকু আর কতোটুকু জায়গা!

সেই ঢাকনিটার মধ্যে কতগুলো শিশি বোতল দাঁড়িয়ে। ছোট ছোট শিশিগুলো পুলিশ, বোতলগুলো সৈন্য। তার মধ্যেও আবার সেনাপতি, প্রধান সেনাপতির পার্থক্য। বড়ো চামিচটাকে দাঁড় করিয়ে রেখে বলা হচ্ছে যে, ওটা গভর্ণর।

কমলের মা অবাক্ হয়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখেন তাঁর ছেলের কাণ্ডকারখানা।

এই দেখো মা, হাজার হাজার নিরস্ত্র সত্যাগ্রহী কেমন করে এবার গোয়ায় ঢুকছে।—কতগুলো ঝাঁটার কাঠির টুকরোকে ছোট ছোট মাটির ডেলার মধ্যে বসিয়ে সেগুলোকে কমল এগিয়ে দিচ্ছে গোয়ার দিকে অর্থাৎ সাবানের বাক্সের ঢাকনির দিকে। ঐ কাঠির টুকরোগুলোই নাকি সত্যাগ্রহী।

গুরুম্, গুরুম্, গুরুম্!

সত্যাগ্রহীদের লক্ষ্য করে প্রচণ্ড ভাবে গুলী চালায় পর্তুগীজ পুলিশ। অনেক সত্যাগ্রহী গুলীর আঘাতে সঙ্গে সঙ্গেই প্রাণ হারায়। অনেকে আহত হয়েও বেঁচে থাকে। আবার বহু সত্যাগ্রহীকে সীমান্ত পার হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই পর্তুগীজ পুলিশ গ্রেপ্তার করে নিয়ে যায় এবং বেপরোয়া ভাবে মারধর করার পর গোয়া থেকে বার করে দেয়। এসব দৃশ্য কমল ঐ সব কাঠি আর শিশি বোতলের সাহায্যে তার মাকে বুঝিয়ে দেয়। মাতো হেসেই আকুল।

ওগো দেখে যাও তোমার ছেলের কাণ্ড!—বাড়ির কর্তাকে ডেকে সব দেখাতে চান কমলের মা।

কেদারেশ্বরবাবু তখন রবিবারের অবকাশ বিনোদন করছিলেন একখানা উপন্যাসে মনোনিবেশ করে। গৃহিণীর ডাকে চমক ভাঙে তাঁর।

কোথায়, কী হচ্ছে দেখি।—কর্তা ছুটে আসেন এই বল্লে।

বা রে, বারাইতো সেদিন আমায় বলেছিলেন যে পর্তুগীজরা দস্যুর জাত। ভারতবর্ষের সমুদ্রে, চীনের সমুদ্রে জলদস্যুতা করে এরা কুখ্যাত হয়েছে। এভাবেই এরা সাড়ে চারশ বছর আগে আমাদের দেশের গোয়া, দমন, দিউ নামক তিনটি ছোট ছোট জায়গা অধিকার করে নিয়েছে। ইংরেজ জাত

সারা ভারতবর্ষ ছেড়ে চলে গেলেও পর্তুগীজরা কিছুতেই গোয়া ছেড়ে যেতে চাইছে না, একেবারে নাছোড়বান্দা। কিন্তু তাদেরকেও যেতেই হবে।—কমল জোরের সঙ্গে বলে। বাবাকে দেখে তার যেন আরো জোর বাড়ে।

পর্তুগীজদের তাড়ানো হচ্ছে বুঝি!—ছেলেকে জিজ্ঞেস করেন কেদারেশ্বরবাবু।

তাড়াতে হবে না? ওরা যে ভীষণ নিষ্ঠুর! তা ছাড়া আমাদের দেশে ওরা চিরকাল থাকবে বুঝি!—কমল বলে।

ওদের নিষ্ঠুরতার কথা কী জানো, বলতো।

সেই যে তুমি বলেছিলে, কে একজন গামা না কি ভীষণ অত্যাচার করেছিলেন এদেশের লোকদের ওপর!

ও তুমি ভাস্‌কো-দা-গামার কথা বলছো। ইনিই প্রথম পর্তুগীজ যিনি ভারতে আসেন ব্যবসা বাণিজ্য করার উদ্দেশ্যে। কিন্তু সুযোগ বুঝে এদেশে পর্তুগীজ রাজ্যের ভিত্তি প্রতিষ্ঠাও করে ফেলেন।

ইনিই তো কয়েক শ' মুসলমান তীর্থযাত্রীকে সাগরের জলে ডুবিয়ে মেরেছিলেন ইঁদুরের মতো করে, না বাবা!

হ্যাঁ, ঠিক বলেছ। ঠিক মনে আছে তো তোমার।

থাকবে না! সেই যে তুমি বলছিলে, জাহাজের ফাঁক দিয়ে এই শত শত লোকের মৃত্যু দেখে এই গামা নাকি লাফিয়ে লাফিয়ে উঠেছিলেন আনন্দে!

তাই তো। এর পরেও আর যারা যারা এদের রাজ্যশাসনের ভার নিয়ে এসেছেন এদেশে প্রায় সকলেই চরম নিষ্ঠুরতার পরিচয় দিয়েছেন। গভর্ণর আলমিদা কতো লোককে যে কচুকাটা করেছিলেন তার হিসেব নিকেশ নেই। বন্দীদের চোখ উপড়ে ফেলতে তাঁর খুব আনন্দ হতো।

কী ভীষণ লোকরে বাবা!—কমল শিউরে ওঠে তার বাবার মুখে গল্প শুনে।

আলমিদার পরে যিনি পর্তুগীজ গভর্ণর হয়ে আসেন এদেশে মানুষের ওপর অত্যাচার করতে তাঁর আরো পাকা হাত। তাঁর নাম আলবুকার্ক। তিনিই গোয়ায় পর্তুগীজ রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা। তার আগে কুন্নুরে একটি কারখানা ও কোচিনে একটি দুর্গ ছাড়া এদেশে পর্তুগীজদের আর বিশেষ কিছুই ছিল না। এই পর্তুগীজ দুর্গই ভারতবর্ষের মাটিতে প্রথম ইয়োরোপীয় দুর্গ।

আলবুকার্ক কী করে গোয়া অধিকার করলেন তাতো বল্লে না।—কমল জিজ্ঞেস করে তার বাবাকে।

গোয়া ছিল বিজাপুরের সুলতানের। সুলতান প্রায়ই গোয়ায় থাকতেন। দাক্ষিণাত্যের মুসলমানেরা গোয়া বন্দর থেকেই মক্কায় তীর্থযাত্রী হতো। তাই সেখান থেকে প্রচুর রাজস্ব পেতেন সুলতান। হঠাৎ একবার সুলতানের অনুপস্থিতির সুযোগ নিয়ে আলবুকার্ক গোয়া বন্দরের সমস্ত

পোত ধ্বংস করে দিয়ে শহরে ঢুকে পড়েন। তাঁর অত্যাচারে অতিষ্ঠ গোয়াবাসীরা সুলতান আদিল শা'র সাহায্য নিয়ে আলবুকার্ককে হটিয়ে দেয় বটে, কিন্তু কয়েক মাস পরেই আরো শক্তিশালী হয়ে তিনি গোয়া পুনরায় দখল করে নেন। সে সময় তিনদিন ধরে শহরে যে রক্তস্রোত বয়ে যায় তার বর্ণনা দেওয়া চলে না। নারী-পুরুষ ও শিশুদের নির্বিচারে হত্যা করে আর শহর জ্বালিয়ে পুড়িয়ে দিয়ে আলবুকার্ক এতোটা উল্লসিত হয়ে উঠেছিলেন যে, পুর্তুগালে তিনি রাজার কাছে তাঁর অত্যাচারের এক মস্ত বড়ো ফিরিস্তি পাঠিয়ে বাহবা পেতে চেয়েছিলেন। সেই বিবরণে তিনি জানিয়েছিলেন যে, গোয়া অধিকারের ব্যাপারে তিনি ছ'হাজার লোককে হত্যা করেছেন। তিনি আরো লিখেছিলেন, 'যাদের জীবন্ত ধরা গেছে, তাদের আমি ঝলসে মারার হুকুম দিয়েছি।'

এমনি করে মানুষ মারতে ওদের মনে একটুও ব্যথা লাগলো না, এ কিন্তু ভারি আশ্চর্য!—বাপের মুখে পর্তুগীজ বর্বরতার কাহিনী শুনে ছেলে বলে।

আশ্চর্য হবার কিছু নেই, কমল। চার পাঁচশ বছর আগেকার কথা ছেড়ে দাও, আজও পর্তুগীজদের সভ্য জগতের মানুষ বলে মনে করার কোন কারণ নেই। গোয়া সত্যাগ্রহীদের ওপর তারা যে অত্যাচার করেছে তাতে সারা পৃথিবী স্তম্ভিত হয়েছে। কিন্তু পর্তুগীজদের বিরুদ্ধে যে এতো নিন্দাবাদ হচ্ছে তার জন্যে একটুও লজ্জা নেই তাদের।

এতো বড়ো দেশ ভারতবর্ষ। সেখানে ইয়োরোপ থেকে এসে কী করে যে বিদেশীরা এক-একটা অংশ দখল করে নিতে পারলো তাও কিন্তু খুব আশ্চর্যের বিষয়।—কমল বলে তার বাবাকে।

আশ্চর্যের আর কী! শুধু দেশ বড়ো হলেই তো হয় না, দেশের মধ্যে তখনকার দিনে একতা ছিল না। এক এক অংশে এক একজন শাসক। তাঁদের মধ্যে ছিল রেষারেষি। কাজেই বিদেশীদের তেমন ভাবে বাধা দেওয়া সম্ভব হয় নি।—কেদারবাবু উত্তর দেন।

কিন্তু আজ তো আর সেদিন নেই। আজ যদি সারা ভারতবর্ষ থেকে হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ লোক চারদিক থেকে গোয়ায় ঢুকে পড়ে তাহলে তাদের ঠেকাবে কী করে পর্তুগীজরা?—এই বলে কমল তার গোয়া উদ্ধারের ব্যবস্থার দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করে কেদারেশ্বরবাবুর।

সেই সাবানের বাক্সের ঢাকনির অর্থাৎ পরিকল্পিত গোয়ার চতুর্দিক্ থেকে অগণিত মানুষ এসে ঢুকছে গোয়ার অভ্যন্তরে। পর্তুগীজদের গোলাগুলীতে অসংখ্য লোক হতাহত হয়েছে। কিন্তু গোলাগুলী তাদের সব শেষ! পালাবারও পথ আর খুঁজে পায় না পর্তুগীজরা। বাধ্য হয়ে তারা আত্মসমর্পণ করবে।

পরাধীনতার কলংকমুক্ত গোয়া আবার মিশে যায় স্বাধীন ভারতের সঙ্গে!

শপথ



শ্রীসুমথনাথ ঘোষ

আমি যখন মাইনর স্কুলে পড়ি সেকেণ্ড ক্লাশে তখন কলকাতা থেকে একটি নতুন ছেলে এসে ভর্ত্তি হ'লো আমাদের সঙ্গে। তার নামটা ছিল একটু বিচিত্র রকমের বিশ্বজিৎকুমার সিংহ রায়। আমাদের ওই গ্রামের স্কুলে এতখানি দীর্ঘ নাম এর আগে আমরা কখনো শুনিনি। তাছাড়া আমরা জানতুম উপাধিটা কারুর হয় সিংহ, কারুর বা রায়—ওই দু'টো একসঙ্গে যুক্ত হয়ে একই নামকে এইভাবে ভারাক্রান্ত করতে পারে, তা ইতিপূর্ব্বে আমাদের কারুরই জানা ছিল না। ফলে একডাকে তাকে চেনবার যেমন সুবিধে হয়েছিল তেমনি অসুবিধাও ছিল একসঙ্গে অতখানি উচ্চারণ করার। তাই ওই নামটাকে ভেঙ্গেচুরে যার যেমন খুশি একটা সংক্ষিপ্ত সংস্করণ করে নিয়েছিল। কেউ ডাকতো, কুমার সিংহ, কেউ রায় সিংহ, কেউ বিশ্ব সিংহ, কেউ আবার ঋষ্য সিংহ বলেও ক্ষেপাতো।

একেবারে খাস সহরের ছেলে কিনা, তার চালচলন ধরণধারণ সবই ছিল যেন কেমন কেমন! কলকাতার উপকণ্ঠে থাকলেও, আমাদের স্কুলের ওই আড়াইশো ছেলের কারুর সঙ্গেই মিল খেতো না। কাপড় আমরাও সকলে পরতুম আবার সেও পরে আসতো। কিন্তু তার পরনের মধ্যে কেমন একটা বৈশিষ্ট্য থাকতো। মালকোচা এঁটে, পিছনের দিকে কোঁচাটা এমনভাবে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে পরতো যেন মনে হতো একটা শ্বেতময়ূর পেখম মেলে চলেছে, আবার সার্ট পরারই বা কি কায়দা! চওড়া কলার দু'টো ঘাড়ের ওপর দাঁড় করিয়ে দিয়ে বুকের বোতামটা এমনভাবে খুলে রাখতো যে চলার সময় পাখীর ডানার মত কলারের প্রান্ত দুটি নেচে নেচে উঠতো। মাথার চুল

কোন্ নাপিতকে দিয়ে ছাঁটাতো জানি না, আমরা শত চেষ্টা করলেও কেউ ঠিক তার মত 'ব্যাকব্রাশ' করতে পারতুম না। মোটকথা একসঙ্গে স্কুলের সবছেলে দলবদ্ধ হয়ে থাকলেও সকলের দৃষ্টি তার ওপর আগে গিয়ে পড়তো।

পণ্ডিতমশায় একদিন নাম ডাকতে গিয়ে স্থতোবাঁধা মোটা চশমাটা নাকের ডগায় টেনে এনে বললেন, বিশ্বজিৎ নামের অর্থ জানিস ত? নামের মর্য্যাদা রক্ষা করতে পারবি ত? শেষে আবার 'কানাছেলের নাম পদ্মলোচন' হ'য়ে না দাঁড়ায়। তুই যেন রাগ করিসনি আমার কথা শুনে। তোদের এই ক্লাশেই অনেক বন্ধু আছে। বলে হঠাৎ কোণের বেঞ্চির দিকে আঙ্গুল দেখিয়ে বললেন, ওই যে দিব্যেন্দুস্থন্দর পাল বসে আছেন—আহা মরি মরি কি দিব্য ইন্দুর মত চেহারা!

হো হো করে একসঙ্গে অনেকগুলো ছেলে হেসে উঠলো। সত্যি, ক্লাশের সব ছেলের মধ্যে সে ছিল দেখতে কুৎসিত—যেমন কালো, তেমনি রোগা, তেমনি মুখের চেহারা।

অর্ডার! অর্ডার! বলে টেবিলটা চাপড়ে পণ্ডিতমশায় আবার আমাদের ক্লাশের একটি কুঁচচক্ষু ছেলেকে দেখিয়ে বললেন, উনি হচ্ছেন কমলাক্ষ অর্থাৎ পদ্মের মত যার চোখ! আহা!

আবার চাপা হাসির গর্জ্জন উঠতে সকলকে শান্ত করিয়ে তিনি শুরু করলেন, তাই বলি ভাল ক'রে লেখাপড়া কর। বাপমায়ের চোখে প্রত্যেক ছেলেই স্থন্দর—প্রত্যেকেই চান যে রূপেগুণে তাঁর ছেলে অদ্বিতীয় হবে। কিন্তু চেহারার ওপর ত মানুষের হাত নেই, যাকে যেমন ঈশ্বর স্থষ্টি করেছেন। তাই বলছি যে ভাল করে মন দিয়ে লেখাপড়া শিখলে রূপে না পারো গুণে সকলের চেয়ে স্থন্দর হতে পারবে।

কিন্তু মুস্কিল হলো বিশ্বজিৎকে নিয়ে। নামের বহর বা বেশভূষার চটক যাই থাক লেখাপড়ায় তার একেবারেই মাথা ছিল না। প্রতিদিনই লাষ্টবেঞ্চে নেমে যেতো। তাছাড়া কি খেলাধূলায়, কি স্কুলের হাতেলেখা মাসিক পত্রিকায় কোন কিছুতেই তার কোন আগ্রহই ছিল না অর্থাৎ যোগ্যতা ছিল না। প্রথম প্রথম অত্যন্ত বিমর্ষ হয়ে থাকতো সে ক্লাশে। শিক্ষকমশাইরা বা সমপাঠীরা কেউই যে তাকে খুব প্রীতির চোখে দেখে না, এটা বোধহয় বুঝতে পেরেছিল। তাই সবসময়ই সে মনে মনে চিন্তা করতো কি ক'রে সকলেয় ওপরে টেক্কা দেওয়া যায়।

সেদিন যেন ঈশ্বর তার দিকে মুখ তুলে চাইলেন। থার্ডমাষ্টার পতিতবাবু আমাদের অঙ্ক কষাতেন। তিনি ছিলেন স্কুলের গেম্ সেক্রেটারী। সেদিন ক্লাশে ঢুকে কারুর সঙ্গে কোন কথা না বলে জ্যামিতির একটা কঠিন উপপাদ্য লিখতে দিয়ে চুপচাপ চেয়ারে বসে রইলেন। আমরা যখন হিমসিম খাচ্ছি খাতাপেন্সিল নিয়ে তখন সহসা একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে তিনি বলে উঠলেন, কাল মোহনবাগান যে আই. এফ. এ'র শীল্ড ফাইন্যালে হেরে গিয়েছে, সে দুঃসংবাদ নিশ্চয়ই তোমরা শুনেছো।

হাঁ স্যার। বলে সব প্রথম লাফিয়ে উঠলো বিশ্বজিৎ। তারপর ব্যথিতস্বরে বললে, তিনদিন স্যার ক্যালকাটার সঙ্গে ড্র রেখেছিল, কাল যদি এত বৃষ্টি না হতো তাহ'লে মজা দেখিয়ে দিতো, বাছাধনদের আর জিততে হতো না। মোহনবাগান এবার ঠিক শীল্ড নিতো।

ঠিক বলেছিস! পতিতবাবুর মনের কথাটা যেন বিশ্বজিৎ-এর মুখ দিয়ে বেরিয়ে এলো। তাই সোৎসাহে তার মুখের দিকে তাকাতেই, বিশ্বজিৎ সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠলো, কোন্ সালে মোহনবাগান প্রথম আই-এফ-এ শীল্ড বিজয়ী হয়েছিল তারপর কতবার ফাইনালে উঠে হেরে গিয়েছে, কতবার সেমি-ফাইনালে উঠেছিল এবং কোন রেফারী কি ভাবে জোচ্চুরী করে তাদের হারিয়ে দিয়েছে ইত্যাদি —ইত্যাদি।



তুই এত সব খবর জানলি কি করে রে!

বারকতক ঢোক গিলে ফট্ করে সে বলে দিলে, স্যার পলটু গাঙ্গুলী আমার মামাতো ভাই।

কি বললি? যেন এমন কথা তিনি জীবনে শোনেননি। পলটু গাঙ্গুলী মোহন-বাগানের সেণ্টার-ফরোয়ার্ড্ তোর মামাতো ভাই—বলিস্ কিরে!

একটুও ইতস্তত না করে তেমনি দৃপ্তভঙ্গীতে বিশ্বজিৎ আবার বললে, হাঁ স্যার।

তাই ত বলি, যে সব খবর এ স্কুলের কোন ছেলে শোনেনি তুই তা জানলি কি করে? তারপর গদগদ কণ্ঠে প্রশ্ন করলেন, তুই তাহ'লে তাকে দেখেছিস কি বল?

শুধু কি তাকে স্যার! গোষ্ঠ পাল, কুমার, বলাই চাটুজ্জ্যে কাকে নয়! রোজ সকালে এসে তাঁরা পলটুদার ঘরে যখন আড্ডা দেন তখন আমি রাস্তার দোকান থেকে তাঁদের কত পান সিগারেট এনে দিয়েছি—কতদিন—

এর কয়েকদিন পরেই দেখি বিশ্বজিৎ আমাদের স্কুলের ফুটবল টিমের ক্যাপ্টেন হয়ে গেছে। যে নিজে খেলতে পারে না তাকে ক্যাপ্টেন করা হলো কেন পতিতবাবুকে জিজ্ঞেস করাতে তিনি

আমাদের উত্তর দিলেন, খেলার সম্বন্ধে ওর যা জ্ঞান আছে এ স্কুলের কারুর তা নেই। ও ক্যাপ্টেন হওয়াতে তোদের টিমের গৌরব বাড়লো। ও যে পলটু গাঙ্গুলীর ভাই—এ কি যে সে কথা।

এইভাবে সম্মানের প্রথম ধাপেই সে শুধু উন্নীত হলো না অল্পদিনের মধ্যে কেমন করে তার সর্ব্বোচ্চ শিখরে উঠলো তাই বলছি।

সেবার উত্তরবঙ্গ ভেসে গেল বন্যায়। দুর্গতদের সাহায্য করার জন্যে নানারকমের অনুষ্ঠান হতে লাগল কলকাতায়। আমাদের সেকেণ্ড মাষ্টার মহাশয় একদিন কয়েকখানা টিকিট এনে বললেন, তোদের সব একখানা করে কিনতে হবে—চার আনা ক'রে পয়সা বাড়ী থেকে আনবি। তাছাড়া এই টিকিট নিয়ে কলকাতার ওভারটুন্ হলে গেলে দিলীপ রায়ের গান শুনতে পাবি। জানিস ত দিলীপ রায়ের গান শোনা একটা মস্ত ভাগ্যের কথা। তিনি বাঙ্গালী জাতির শুধু গৌরব নন—ভারতবর্ষের অন্যতম শ্রেষ্ঠ গায়ক!

আমি শুনেছি স্যার, তাঁর গান। বিশ্বজিৎ অমনি বলে উঠলো!

কোথায় শুনেছিস?

বাড়ীতে স্যার—উনি আমার মামা হন যে!

তোর মামা হন? বলে কিছুক্ষণ অবিশ্বাসের দৃষ্টিতে তার মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে তিনি বললেন, কি গান শুনেছিস বল দেখি?

বিশ্বজিৎ সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিলে—'মুঠো মুঠো রাঙ্গাজবা কে দিল তোর পায়' আর 'ধনধান্যে পুষ্পেভরা' স্যার।

এবার সে সম্মানের দ্বিতীয় শ্রেণীতে কেবল প্রোমোশন পেলে না, শিক্ষকমশাইদের কাছ থেকে বেশ খাতিরও পেতে লাগল। যে ক্লাশে পড়াশুনা পারে না, খেলাধুলোও ভাল জানে না তাকে এতটা সম্মান পেতে দেখে আমাদের অনেকেরই মনে ঈর্ষার আগুন জ্বলে উঠলো।

শুধু কি তাই প্রাইজের দিন উদ্বোধন সঙ্গীত গাইবার জন্যে হেডমাষ্টার মশাই নিজে এসে তাকে অনুরোধ করলেন। বললেন, নরাণাং মাতুলক্রমঃ তুমি নিশ্চয়ই অন্য সকলের চেয়ে ভালো গান গাইতে পারবে আমার বিশ্বাস—এত বড় মামার ভাগ্নে যখন তুমি আমাদের স্কুলের গৌরব!

আত্মগর্ব্বে স্ফীত হয়ে বিশ্বজিৎ বললে, স্যার, আমার মা গানবাজনা একেবারেই পছন্দ করেন না, তাঁর বিশ্বাস ওতে লেখাপড়ার ক্ষতি হয়—তাই গান গাইতে অনুরোধ করবেন না। তার চেয়ে বরং একটা আবৃত্তি করবো আমি।

তুমি আবৃত্তিও করতে পারো নাকি?

বিশ্বজিৎ এবার হেডমাষ্টার মশাইয়ের বিস্ময়ের ওপর চরম আঘাত দিলে। বললে, হাঁ স্যার। শিশির ভাদুড়ী আমার পিশেমশাই হন। তাঁর কাছে আমি শিখেছি।

হেডমাষ্টার মশাইয়ের কণ্ঠে কিছুক্ষণের জন্য যেন আর বাক্যস্ফূর্ত্তি হলো না। তবু সত্যাসত্য

যাচাই করার জন্যে বললেন, তিনি ত শুনেছি থিয়েটার নিয়েই সব সময় ব্যস্ত থাকেন তাহ'লে কখন তাঁর কাছে তুমি শিখলে বাপু ?

কলকাতার ছেলে বিশ্বজিৎ। জেরা ক'রে তাকে হারানো শক্ত। চট্ করে বলে উঠলো, একদিন আমাদের বাড়ীতে, স্যার, নেমতন্ন খেতে এসেছিলেন—খাওয়ার পর দুপুরে যখন বৈঠকখানায় তাকিয়া হেলান দিয়ে গড়গড়ায় টান দিচ্ছিলেন, আমি তখন তাঁর মাথা থেকে অনেকগুলো পাকা চুল তুলে দিয়েছিলুম—তাই তিনি খুশি হ'য়ে আমায় পুরস্কার স্বরূপ ওই কবিতাটা আবৃত্তি করতে শিখিয়ে দিলেন।

কবিতাটার নাম কি ? হেডমাষ্টার মশাই প্রশ্ন করতে বিশ্বজিৎ বললে, রবীন্দ্রনাথের 'রাতে ও প্রভাতে'—কালি মধুযামিনীতে ইত্যাদি।

আর যায় কোথায় ! হেডমাষ্টার মশায়ের সমস্ত মুখচোখ যেন আনন্দে উদ্ভাসিত হয়ে উঠলো। তিনি বললেন, সত্যি তুমি আমাদের স্কুলের গৌরব !

এরপর থেকে বিশ্বজিৎএর পদমর্য্যাদা সারা স্কুলে যেন বেড়ে গেল। শিক্ষক মশাইরা সবাই তার সঙ্গে বেশ সম্ভ্রমের সঙ্গে কথাবার্ত্তা বলতেন। কিন্তু সব চেয়ে গায়ের জ্বালা হতো আমার ! লেখাপড়া যে একেবারে পারে না তাকে মাথায় নিয়ে এত নাচানাচি করাটা আমি একেবারেই বরদাস্ত করতে পারলুম না। কারণ আমি ছিলুম স্কুলে লেখাপড়ায় ও স্বভাব-চরিত্রে সব চেয়ে ভাল ছেলে।

একবার বিশ্বজিৎ পর পর তিন দিন ক্লাশে এলো না। হেডমাষ্টার মশাই আমায় পাঠালেন ওর বাড়ী থেকে খবর আনতে। সে থাকতো আমাদের গাঁয়ের একেবারে শেষ প্রান্তে। যদিও শহরের উপকণ্ঠে ছিল আমাদের এই গাঁ। তবু বনজঙ্গল, বাঁশঝাড়, খানা ডোবা, শিয়াল ও মশার উৎপাত এত ছিল যে শহর থেকে মাত্র পাঁচ ছ মাইলের দূরত্ব বলে মনেই হতো না। মনে হতো যেন এমন এক অজ-পল্লীতে এসে পড়েছি যেখান থেকে শহর একটা কল্পনার স্থান! আলোর নীচেই যেমন অন্ধকার থাকে তেমনি শহরের অত কাছে থেকেও আমরা যেন অন্ধকারে বাস করতুম।

যাহোক প্রধান শিক্ষকের আদেশ শিরোধার্য্য করে সেদিন-ই ওর খোঁজ নিতে গেলুম। কিন্তু বাড়ীর কাছে যেতে হঠাৎ আমার পা থেমে গেল। আমি নিস্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলুম। ওর ঘরে তখন গ্রামোফোনে রেকর্ড বাজছে—'কালি মধু যামিনীতে জ্যোৎস্না নিশিতে' ইত্যাদি। বুঝলুম শিশির ভাদুড়ীর কাছে বিশ্বজিৎ-এর আবৃত্তি শেখার কাহিনী কত বড় মিথ্যা !

সেই রেকর্ডখানা শেষ হতেই একখানা গান বেজে উঠলো—'মুঠো মুঠো রাঙা জবা কে দিল তোর পায়।' আবার সে গানের পর বাজলো—'ধনধান্যপুষ্পে ভরা'।

এতক্ষণ আমি ঘরের বাহিরে দাঁড়িয়ে ছিলুম চুপ ক'রে। এখন আর থাকতে পারলুম না। একেবারে তার ঘরের ভেতরে গিয়ে হাজির হলুম। আমাকে দেখামাত্র তার সমস্ত মুখটা যেন

ফ্যাকাশে হয়ে গেল। অসুস্থ হয়ে সে বিছানায় শুয়েছিল। আর তার ছোট বোন মাথার কাছে বসে বসে গ্রামোফোনটা বাজাচ্ছিল। সঙ্গে সঙ্গে বোনকে ধমক দিয়ে উঠলো বিশ্বজিৎ—এই বন্ধ কর শিগ্‌গির, ভাল লাগছে না!



ছোটবোন তার জবাবে কিছু না বলে কলটা বন্ধ করে উঠে চলে গেল।

আমাকে বিছানার ওপর বসিয়ে অপরাধীর মত আমার মুখের দিকে নিঃশব্দে শুধু তাকিয়ে রইলো বিশ্বজিৎ। যেন কি বলবে খুঁজে পাচ্ছে না কথা।

পাশেই একটা ছোট্ট টেবিলের ওপর তার পড়বার বইখাতা স্তূপ হয়েছিল। আমিও ঠিক কি বলবো বুঝতে পারছিলুম না। টেবিলের দিকে মুখটা ঘোরাতেই দেখি সামনে একটা ছোট্ট বই। বইটার নাম ফুটবলের ইতিহাস।

বইটা হাতে করে তুলে নিতেই ছোঁ মেরে আমার কাছ থেকে সেটা বিশ্বজিৎ ছিনিয়ে নিলে। তারপর আমার হাত দুটো নিজের হাতের মধ্যে টেনে নিয়ে বললে, বল, এ সব কথা কাউকে বলবিনি! উত্তেজনায় তার কণ্ঠস্বর কাঁপছিল। গায়ের জ্বরও যেন সঙ্গে সঙ্গে বেড়ে গিয়েছিল।

আমি শুধু বললুম, শিক্ষকমশাইদের সঙ্গে এত বড় মিথ্যাচরণ করতে তোর এতটুকু ভয় হলো না। ছিঃ! শিক্ষক না গুরু।

তুই ছাড়া, আর কোন দ্বিতীয় প্রাণী এ খবর জানে না! তুই আমায় শুধু ক্ষমা কর ভাই! শুধু দিব্যি কর আমার গা ছুঁয়ে, একথা আর কারুর কাছে বলবি নি।

আমাকে চুপ করে থাকতে দেখে সে আবার বললে, ক্ষমা করতে পারবি নি। আমি তোর পায়ে পড়ছি। বল, একথা কোন দ্বিতীয় ব্যক্তি জানবে না—দিব্যি কর।

আমি নিশ্চল মূর্ত্তির মত বসেছিলুম। হঠাৎ দু' ফোঁটা গরম জল হাতের ওপর পড়তে চমকে উঠে তার মুখের দিকে তাকালুম। এতক্ষণ ঘৃণায় মুখটা ঘুরিয়ে নিয়েছিলুম তার দিক্ থেকে! ভেউ ভেউ ক'রে কচি ছেলের মত এবার সে কেঁদে উঠলো। তারপর আমার হাতটা ছেড়ে দিয়ে বললে, না, তুই স্যারদের বলে দিস্—আমার এ মিথ্যার শাস্তি আমি মাথা পেতে নেবো!

আমি আজ পর্য্যন্ত সেকথা কাউকে বলিনি—শিক্ষকদের ত দূরের কথা। আজ এইখানে প্রথম বললুম।

—নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী

সাত-সকালে

ওমা, ওমা, মাগো,
সাত-সকালে যখন তুমি জাগো,
নীল আকাশের তলে
দেখতে পাও না মিটমিটিয়ে জ্বলে
ছোট্ট একটা তারা?

মিণ্টু পিসি ছাড়া
কেউ জানে না, তারা-ই ওটা নয়।
সারা আকাশময়
সঙ্গী খোঁজে ছোট্ট একটা ছেলে
মাটির প্রদীপ জেলে।

প্রদীপও নয় ঠিক,
হয় তো চোখের আলোর ঝিকিমিক।
হয় তো বা তাও ভুল,
হয় তো কোনো নাম-না-জানা ফুল।
ওমা, ওমা, মাগো।

যখন তুমি জাগো,
দেখতে পাও না নীল আকাশের তলে
মিটমিটিয়ে জ্বলে
ছোট্ট একটা প্রদীপ, তন্দ্রাহারা?
তোমরা বল, তারা।



চীন দেশের ছেলেমেয়ে

শ্রীমোহিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

বিরাট দেশ—মহাচীন। বর্ত্তমান ভারতের আয়তন ১১,৭৭,০০০ বর্গমাইল, চীনের আয়তন ৪৪,৮০,০০০ বর্গমাইল—অর্থাৎ ভারতের প্রায় চারগুণ। ভারতের লোক সংখ্যা প্রায় ৩৭ কোটি, চীনের ৬০ কোটি। ভারতের প্রতিবেশী চীন।

চীনের সভ্যতা ও সংস্কৃতিও ভারতের মতই খুব প্রাচীন। বহু যুগ ধরিয়া এই দুইটি বিরাট দেশের মধ্যে জ্ঞান-বিজ্ঞানের আদান-প্রদান ছিল, ব্যবসা-বাণিজ্যের সম্পর্কও ছিল। দুই হাজার বৎসর পূর্ব্বে চীনদেশীয় পণ্ডিতগণ এদেশে জ্ঞানার্জ্জনের জন্য আসিতেন, তাহার প্রমাণ আছে। সেইরূপ বহু ভারতীয় সুপণ্ডিত চীনদেশে ধর্ম্মকথা শুনাইতে যাইতেন, ইতিহাস হইতে তাহা আমরা জানিতে পারি। এইভাবে এককালে বৌদ্ধ ধর্ম্ম চীনদেশে খুব বিস্তার লাভ করিয়াছিল। এখনও চীনে অসংখ্য বিরাট বৌদ্ধ মন্দির আছে।

প্রায় আড়াই হাজার বৎসর পূর্ব্বে তাতার জাতি মধ্যে মধ্যে চীন আক্রমণ করিত, ধনসম্পত্তি লুণ্ঠন করিয়া পলাইয়া যাইত। ইহাদের হাত হইতে দেশকে রক্ষা করিবার জন্য খৃষ্টপূর্ব্ব তৃতীয় শতাব্দীতে, অর্থাৎ প্রায় ২২০০ বৎসর পূর্ব্বে তখনকার চীন সম্রাট্ উত্তর চীনে এক প্রকাণ্ড প্রাচীর নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। ইহাই "চীনের প্রাচীর" বলিয়া বিখ্যাত—পৃথিবীর সপ্তাশ্চর্য্যের মধ্যে অন্যতম। প্রাচীরটি প্রায় ১৫০০ মাইল লম্বা, উত্তর চীনের পর্ব্বতগুলির উপর নির্ম্মিত। উচ্চতায় ২৫।৩০ ফিট, অর্থাৎ তিনতলা বাড়ির মত উঁচু। চওড়ায় ২০।২৫ ফিট, অর্থাৎ দশ-বারজন অশ্বারোহী ইহার উপর দিয়া অক্লেশে পাশাপাশি ঘোড়া ছুটাইয়া যাইতে পারেন। মিস্ত্রীরা ইহা ইট দিয়া এমন

সুকৌশলে নির্ম্মাণ করিয়াছিল যে ইঞ্জিনিয়ারদের নিকট ইহা বিস্ময়ের বস্তু হইয়া আছে। মধ্যে মধ্যে ফাটল ধরিলেও আজও সেই প্রাচীন প্রাচীর সগৌরবে দণ্ডায়মান আছে।

চিরদিন সমান যায় না। ভারত ও চীন এই উভয় দেশেরই গৌরব ক্রমে ম্লান হইয়া পড়িল। আমরা যেমন কয়েক শত বৎসর বিদেশীদের পদানত হইয়া ছিলাম, চীন দেশও কয়েক শত বৎসর বিদেশীদের প্রভাবে দুর্ব্বল হইয়া পড়ে। পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রভাবে আমরা আত্মবিস্মৃত হইয়াছিলাম, চীনারাও সেইরূপ পাশ্চাত্য জাতিগুলির চক্রান্তে হীনচরিত্র হইয়া পড়িয়াছিল। পাশ্চাত্য জাতিরা সুকৌশলে তাহাদের 'আফিং-খোর' করিয়া দুর্ব্বল জাতিতে পরিণত করিয়াছিল। এই দুই দেশের ক্ষেত্রেই এই সময়টিকে অন্ধকার-যুগ বলা চলে।



শিশুদের মধ্যে লেখক (চশমাপরা)

গত প্রায় পঞ্চাশ বৎসর ধরিয়া আমরা বিদেশী শাসকের হাত হইতে মুক্তিলাভের জন্য চেষ্টা করিতেছিলাম। চীনেও একদল দেশসেবক চীনকে বিদেশী প্রভাব হইতে মুক্ত করিতে চেষ্টা করিতেছিলেন। আমরা ১৯৪৭ সালের পনেরোই আগষ্ট স্বাধীনতা অর্জ্জন করি, চীনে ১৯৪৯ সালের পয়লা অক্টোবর বিদেশী প্রভাব মুক্ত জাতীয় সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়। তাহার পর হইতে এই দুই দেশের মধ্যে আদান প্রদান আবার বৃদ্ধি পাইয়াছে, আমরা দুই প্রতিবেশী পরস্পরের নিকট হইতে আবার শিখিবার চেষ্টা করিতেছি।

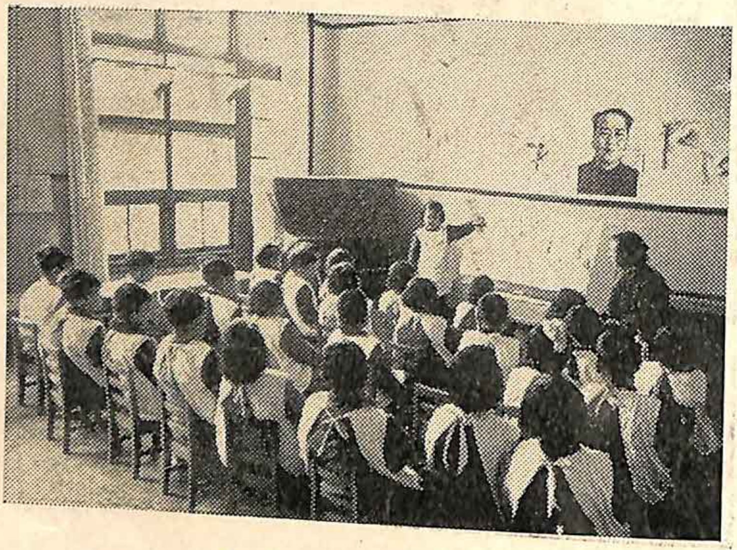
ভারতের সহিত চীনের নূতন যে যোগাযোগ স্থাপিত হইয়াছে, সেই সূত্রে সম্প্রতি স্বাধীন চীনকে দেখিয়া আসিলাম। সেখানকার ছেলেমেয়েদের কথা আজ বলিব।

পূর্ব্বে চীনদেশে ছেলে ও মেয়ের মধ্যে খুব পার্থক্য করা হইত। ছেলেদের প্রতিই পিতামাতার স্নেহ বেশি দেখা যাইত। পা ছোট হইলে নাকি মেয়েদের খুব সুন্দর দেখায়; সেজন্য চীনদেশে মেয়েদের শিশুকালেই লোহার জুতা পরাইয়া রাখা হইত, তাহাতে পা আর বড় হইতে পারিত না।

ইহাতে তাহাদের কত কষ্ট হইত। কুসংস্কারবশতঃ ছেলেদের মাথায় জন্মকালের চুল এক গোছা রাখিতে হইত, সেজন্য চীনা পুরুষদের মাথায় বেশ বড় এক গোছা টিকি থাকিত। প্রায় চল্লিশ বৎসর পূর্ব্বে এই সকল কুসংস্কারের বিরুদ্ধে ঘোরতর আন্দোলন হয়। এখন আর ছেলেদের টিকিও নাই, মেয়েদের ছোট পা-ও নাই! ছেলে ও মেয়ের মধ্যে পার্থক্য এখন একেবারেই লোপ পাইয়াছে। এখন ছেলেমেয়েরা একসঙ্গে লেখাপড়া করে, একসঙ্গে খেলাধূলা করে এবং বড় হইলে একসঙ্গে কাজকর্ম্ম করে। দু'জনেরই অধিকার সমান—কেহই ছোট বা বড় নহে।

চীনের ছেলেমেয়েরা খুব সরল, পরিশ্রমী এবং পিতামাতা ও গুরুজনদের খুব বাধ্য। তাহারা যেমন মন দিয়া লেখাপড়া করে, খেলাধূলার সময় সেইরূপ মন দিয়া খেলাধূলা করে।

আমাদের দেশে স্বাধীনতা সংগ্রামে নেতৃত্ব করিয়াছিলেন মহাত্মা গান্ধী। চীনদেশে মুক্তিসংগ্রামে নেতা ছিলেন মাও সে-তুঙ। বর্ত্তমানে তিনিই চীনের রাষ্ট্রনায়ক। মুক্তিসাধনের পর তিনি সকলকে বলেন —"আমাদের প্রথমে দরকার স্বাস্থ্য; স্বাস্থ্য ভাল হলে লেখাপড়া ভাল করে শিখতে পারবে, আর ভাল লেখাপড়া শিখলে ভবিষ্যতে ভাল করে কাজ করতে পারবে।" চীনের ছেলেমেয়েরা তাঁহাকে খুব ভালবাসে, তাঁহার কথা অক্ষরে অক্ষরে পালন করে।



শিশু-বিদ্যালয়ে গণিতের ক্লাস

চীনের স্বাস্থ্যবিদ্‌গণ বলিলেন, স্বাস্থ্য ভাল করিতে হইলে প্রত্যহ সকালে বিকালে ব্যায়াম করা উচিত। ছেলেমেয়েরা সকলেই রোজ দুইবার ব্যায়াম করে। তাহা ছাড়া বৈকালে নিয়মিতভাবে খেলাধূলা করে। ছোটরা ফুটবল খেলে খুব কম, সাধারণতঃ ভলিবল, বাস্কেটবল তাহাদের খুব প্রিয় খেলা। সাঁতার, নৌবাহন, বরফের উপর স্কেটিং, ব্যাডমিণ্টন, টেনিস, পোলো, অশ্বারোহণ, কুস্তি প্রভৃতি ঋতু অনুসারে নিয়মিত চর্চ্চা করে। দৌড়, উঁচু লাফ, লম্বা লাফ, নাচ প্রভৃতি ব্যায়ামের অঙ্গ। বড় ছেলেমেয়েরা ব্যায়ামাগারে (জিমনাশিয়ামে) নিয়মিতভাবে নানাপ্রকার ব্যায়াম কসরৎ করে। ঘুড়ি উড়ান ঠিক ব্যায়ামের মধ্যে গণ্য না হইলেও বসন্ত ঋতুর সমাগমের সঙ্গে সঙ্গেই

ছেলেমেয়েদের মাতাইয়া তুলে। ঘুড়িগুলি বিচিত্র ধরণের—কোনটি ড্রাগনের আকারের, কোনটি সিংহের, কোনটি ফড়িং, এইরূপ নানা আকারের ঘুড়ি। অনেকে বলেন, ঘুড়ি উড়ানো আর ফুটবল খেলা চীনদেশ হইতে আমাদের দেশে প্রচলিত হইয়াছে।

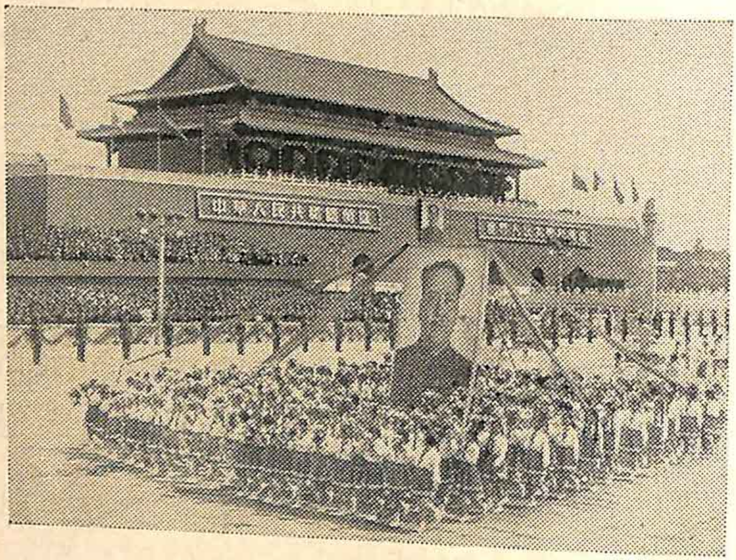
চীনদেশে পূর্ব্বে এদেশের মতই কলেরা, আমাশয়, বসন্ত প্রভৃতি রোগের প্রাদুর্ভাব ছিল খুব বেশি। বহু অধিবাসী এই সকল ব্যাধিতে আক্রান্ত হইয়া অকালে ইহলোক পরিত্যাগ করিত। চীনের চিকিৎসকগণ বলিলেন, “সাধারণতঃ জল ও বায়ুর সহিত রোগের জীবাণু মানুষের শরীরে প্রবেশ করিয়া নানারূপ ব্যাধির সৃষ্টি করে—সুতরাং জল ও বায়ু সম্বন্ধে আমরা যদি সতর্ক হই, তাহা হইলে আমরা অনেক ব্যাধির হাত হইতে মুক্তি পাইতে পারি।” তাঁহারা পরামর্শ দিলেন, জল না ফুটাইয়া পান করা উচিত নহে এবং শহর বা কলকারখানা অঞ্চলে যেখানে ধূলাবালি বেশি বা যেখানে বহুলোকের ভিড়ের জন্য বায়ু দূষিত, সেখানে ফিতা দিয়া নাকে এক টুকরা কাপড় বা রুমাল বাঁধিয়া চলাফেরা করা উচিত। আজ চীনদেশের আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা এই উপদেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করিতেছে। ছেলেমেয়েরা স্কুলেও ফুটান গরম জল পান করে এবং নাকে পুরু একখণ্ড কাপড় বাঁধিয়া স্কুলে যায়। ফলে পাঁচ বৎসরের মধ্যেই চীনদেশ হইতে কলেরা বসন্ত প্রভৃতি ব্যাধি সম্পূর্ণ নির্ব্বাসিত হইয়াছে। ছেলেমেয়েরা খুবই পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। কি বাড়িতে, কি বিদ্যালয়গৃহে কখনও কোথাও ময়লা পড়িয়া থাকিতে দেয় না। পথঘাটও পরিষ্কার—একটুকরা কাগজ ফেলিতে হইলেও তাহারা ডাষ্টবিনে ফেলে। এইরূপ পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার জন্য চীনে মশা বা মাছিও আজ আর নাই।

পৃথিবীর অনেক দেশে ১লা জুন তারিখে প্রতিবৎসর শিশু উৎসব প্রতিপালিত হয়। চীন দেশেও এই দিনটিতে শিশুদের উৎসব হয়। এইদিন বালকবালিকারা সকলেই বিচিত্র সাজ-পোষাকে সজ্জিত হইয়া রাজপথে শোভাযাত্রা করে; তাহাদের হাতে থাকে ফুলের গুচ্ছ, নানারঙের পতাকা।

চীনের ছেলেমেয়েদের মধ্যে শৃঙ্খলাবোধ খুব বেশি। বিদ্যালয়গুলি খুব বড়, এক হাজার দেড় হাজার ছেলেমেয়ে পড়ে। কিন্তু কি ছুটির সময়, কি সমবেত ব্যায়াম ও খেলাধূলার সময় কোনরূপ বিশৃঙ্খলা দেখা যায় না।

স্কুলে তাহারা একমনে বিদ্যাভ্যাস করে। সকলেই লেখাপড়ায় বেশ ভাল—পরীক্ষায় কেহ ফেল করে না। শিক্ষক শিক্ষিকাকে তাহারা খুব শ্রদ্ধা করে। সকালে সাড়ে সাতটার সময় জলযোগ করিয়া তাহারা বিদ্যালয়ে যায়। সেখানে সাড়ে বারোটা পর্য্যন্ত লেখাপড়া করার পর দুই ঘণ্টা মধ্যাহ্নভোজনের ছুটি, বিদ্যালয়েই আহারাদি করে। অনেকে সকালে বিদ্যালয়ে আসিবার সময়েই দুপুরের খাবার সঙ্গে করিয়া আনে, বিদ্যালয়ের রন্ধনশালায় সেই খাবার গরম করিয়া রাখা হয়। বৈকালে আড়াইটা হইতে আবার বিদ্যালয়ের শিক্ষা সুরু—এইসময় তাহারা নানারূপ হাতের কাজ করে, ছবি আঁকে, মূর্ত্তি গড়ে, নাচ-গান-বাজনা বাজানো শেখে, সকলেই কোন-না-কোন কাজে ব্যস্ত। সাড়ে চারটা হইতে ব্যায়াম, খেলাধূলা—সাড়ে পাঁচটায় ছুটি।

চীনদেশে স্বার্থপর হওয়াটা খুব দোষের। ছেলেমেয়েরা সর্ব্বদাই পরস্পরের সহিত মিলিয়া মিশিয়া কাজ করিতে চেষ্টা করে। সহযোগিতা বর্ত্তমান চীনের জাতীয় জীবনের মূল ভিত্তি। সেজন্য কোনও ছেলেমেয়ে লেখাপড়ায় কাঁচা হইলে তাহার সহপাঠীরা তাহাকে উৎসাহ দিয়া এবং পড়াশুনায় সাহায্য করিয়া দলের উপযোগী করিয়া লয়। কোনও শ্রেণীতে দুষ্ট-প্রকৃতির ছেলেমেয়ে থাকিলে বা সেই শ্রেণীর কেহ পরীক্ষায় ফেল করিলে শ্রেণীটিরই বদনাম হয়—সেই শ্রেণীর পক্ষে তাহা লজ্জার কথা!



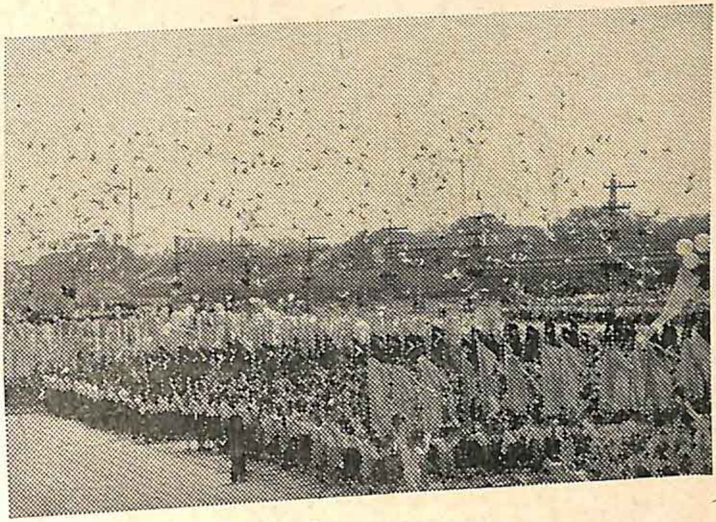
শিশু-উৎসব

চীনা ভাষায় লেখাগুলি ছবির মত দেখায়। এই ভাষায় চল্লিশ হাজারেরও বেশি শব্দ আছে, এক একটি ছোট্ট ছবি দিয়া এক একটি শব্দ প্রকাশ করা হয়। তবে এত বেশি শব্দ আয়ত্ত করা খুবই দুরূহ ব্যাপার—সাধারণতঃ তিন হাজার প্রয়োজনীয় শব্দ লিখিতে শিখিলেই মোটামুটি সকল কাজ চলিয়া যায়। চীনা ভাষায় আমাদের অ আ ক খ প্রভৃতি বর্ণমালা নাই। তাহাদের লেখা আরম্ভ হয় শেষ পৃষ্ঠায়, শেষ হয় আমাদের প্রথম পৃষ্ঠায়। লেখাগুলি আবার ডান দিক্ হইতে বাঁ দিকে সোজা লাইনে হয়, আর উপর হইতে নীচে খাড়া লাইনে হয়।

আমাদের দেশে যেমন বয়-স্কাউট ও গার্ল-গাইড প্রতিষ্ঠান আছে, চীনদেশে সেইরূপ "পাইওনিয়র" (অর্থাৎ অগ্রদূত) প্রতিষ্ঠান। ছেলেমেয়ে সকলেই এই প্রতিষ্ঠানের সভ্য হইতে পারে। বস্তুতঃ সেদেশে পাইওনিয়র না হওয়া ছেলেমেয়েদের পক্ষে লজ্জার কথা। অথচ ইচ্ছা করিলেই পাইওনিয়র হওয়া যায় না, পাইওনিয়র হইবার জন্য আবেদন করিতে হয়। তখন কর্ত্তৃপক্ষ অনুসন্ধান করিয়া দেখেন আবেদনকারী পাইওনিয়র হওয়ার যোগ্য কিনা! এই যোগ্যতা নির্ভর করে অনেকগুলি গুণের উপর, যেমন—(১) ছেলে বা মেয়ে নিয়মিতভাবে লেখাপড়া করে কি না। (২) ছেলে বা মেয়ে পিতামাতা, শিক্ষক এবং অন্যান্য গুরুজনকে মান্য করে কি না। (৩) ছেলে বা মেয়ের মধ্যে সহযোগিতামূলক গুণ আছে কি না—যদি সে স্বার্থপরায়ণ হয় তাহা হইলে সে পাইওনিয়ার হইতে পারে না। (৪) ছেলে বা

মেয়ে দয়ালু কি না, পরোপকারী কি না, সেবাপরায়ণ কি না। (৫) ছেলে বা মেয়ে নিয়মিত সময়ে নিয়মিত কাজ করে কি না, কর্ম্মঠ কি না, সবরকম কর্ম্মই সমান শ্রদ্ধার সহিত দেখে কি না।

পাইওনিয়র দেশকে ভালবাসে; দেশের মর্য্যাদা রক্ষার জন্য প্রাণ পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন দিতে প্রস্তুত থাকে, দেশের পুনর্গঠন এবং উন্নতির জন্য আত্মনিয়োগ করে!



নববর্ষের উৎসব

ছুটির দিন চীনদেশের ছেলেমেয়েরা কেহই ঘরের মধ্যে আবদ্ধ থাকিতে চায় না। তাহারা দলবদ্ধভাবে সকালেই মধ্যাহ্নভোজনের খাবার সঙ্গে লইয়া বাহির হয়, সারাদিন কোন পার্কে বা চিড়িয়াখানায় বা মিউজিয়মে বা নদীতীরে ও নৌভ্রমণে অতিবাহিত করে। সহরের ছেলেমেয়েরা অনেক সময় গ্রামে গিয়া এবং গ্রামের ছেলেমেয়েরা সহরে আসিয়া নানাবিধ দ্রষ্টব্য স্থান দেখিয়া বেড়ায়।

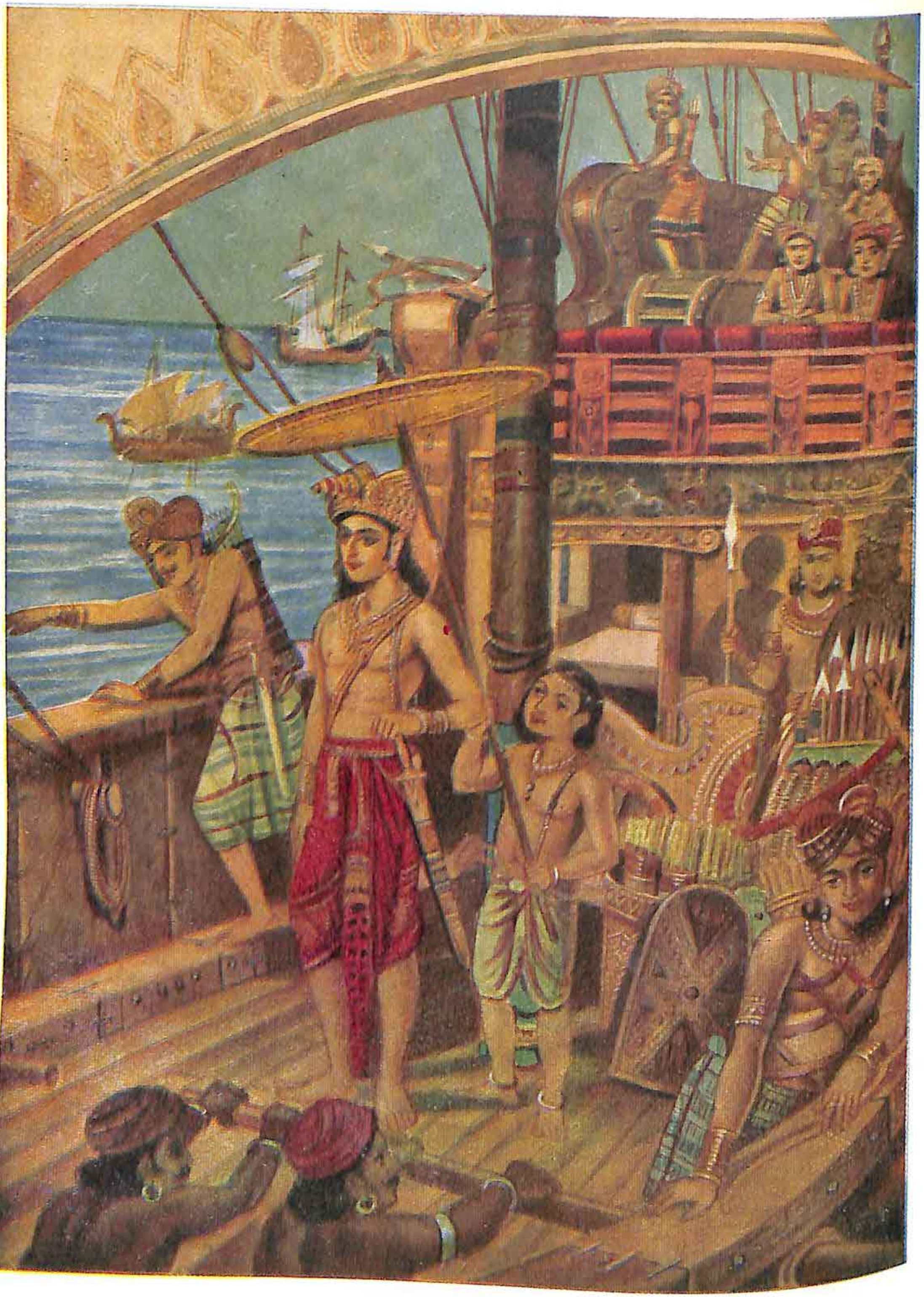
চীনাদের প্রধান খাদ্য আমাদেরই মত ভাত। কিন্তু তাহারা দুধ খায় না। পৃথিবীর মধ্যে এই একটিমাত্র দেশ আছে যেখানে এমন কি শিশুদেরও খাদ্য হিসাবে দুধ ব্যবহৃত হয় না। গরু ও দেশে নাই বলিলেই চলে। জন্মের পর হইতে কয়েকমাস মাতৃদুগ্ধ পান করার পরই দুধ বন্ধ হইয়া যায়। অথচ কি শিশুদের, কি ছেলেমেয়েদের আর কি বয়স্ক লোকের চেহারা কি সুন্দর! সকলেই স্বাস্থ্যবান্। ভাতের সহিত তাহারা গম জোয়ার প্রভৃতি শস্যদ্বারা প্রস্তুত খাদ্যও খায়। মাছ তাহারা রোজই খায়। মাংসের মধ্যে শূকরের মাংসই সস্তা এবং তাহাদের প্রিয় খাদ্য। তা ছাড়া তাহারা ডিম, মুরগীর মাংস প্রভৃতিও খায়। শাক সবজী প্রচুর খায়। পদ্মের ডাঁটা বা পাখীর বাসা দিয়া প্রস্তুত ঝোল তাহাদের উপাদেয় খাদ্য। তাহারা চা পান করে খুব বেশি, কিন্তু চা প্রস্তুত হয় মাত্র ফুটন্ত জলে কিছু সবুজ চায়ের পাতা দিয়া—ছাঁকিতে হয় না, তাহাতে চিনি বা দুধও দিতে হয় না। সেই চা এমন সুগন্ধযুক্ত যে সকলেই তাহা আনন্দে পান করে।



পূজা সার্থক হবে

শ্রীনীলরতন দাশ

জমিদার বাড়ী দুর্গাপূজায় হতেছে বেজায় ধুম,
পাড়ায় তরুণ কিশোরগণের চক্ষে নাহিকো ঘুম।
রঙবেরঙের ফ্রক্-জামা প'রে
খেল্না পুতুল বাঁশি হাতে করে
খোকাখুকু সবে মহাআনন্দে করিতেছে কত খেলা,
পূজা প্রাঙ্গণে বসিয়াছে যেন প্রজাপতিদের মেলা !
বাহিরে হোথায় রেলিংএর ধারে নীরবে দাঁড়ায়ে কা'রা ?
ওরা যে দুঃস্থ ছেলেমেয়ে, হায়, অভাগা বাস্তুহারা !
জীর্ণ বসন ওদের পরণে,
শুষ্ক মলিন মুখ অনশনে ;
ওদের জীবনে ডুবেছে সূর্য্য, নিভেছে রঙীন আলো,—
সম্মুখে শুধু অমারজনীর জমাট আঁধার কালো।
ভাবিয়া তোমরা দেখেছ কি কভু, হে কচি কিশোরদল !
এক দিকে কেন উল্লাস হাসি, আর দিকে আঁখিজল ?
এক ধারে বয় জোছ্‌নার ধারা,
আর ধারে কেন আঁধারের কারা ?
আলো আঁধারের ব্যবধান ভাই তোমরা ঘুচাবে যবে,—
সকলের মুখে হাসিটি ফুটিলে পূজা সার্থক হবে !



বিজয়সিংহের লঙ্কা যাত্রা



দিদি

ভাস্কর

অদৃষ্টের ভেলায় ভাসিতে ভাসিতে অমিয়া এবং তার ভাই হরিশ আসিয়া পৌঁছিয়াছে বেহালার একটি দরিদ্র পল্লীতে।

অমিয়ার বয়স ষোল, হরিশের দশ। কোথা হইতে কেমন করিয়া আসিল, তাহার সুদীর্ঘ বিবরণ জানিয়া লাভ নাই। বর্ত্তমানে তাহাদের আপন বলিয়া কেহ নাই। অতি কষ্টে বহু অনুনয় বিনয় করিয়া এক ভদ্রলোকের বাড়ীর সংলগ্ন একটি টিনের চালায় তাহারা স্থান পাইয়াছে। মাসিক কিছু ভাড়াও দিতে হইবে। বাড়ীর মালিক একজন বিধবা প্রৌঢ়া। অমিয়া তাঁহার কাছে অকপটে তাহাদের দুর্দশার কথা জানাইয়াছে, কেমন করিয়া আত্মীয়স্বজন-হারা হইয়া নিঃসম্বল অবস্থায় একটি ছোট ভাইয়ের সঙ্গে শিয়ালদহ পৌঁছিয়াছে, এবং কেমন করিয়া এক ভদ্রলোক তাহাদিগকে এই পাড়ায় লইয়া আসিয়াছে। প্রৌঢ়া নীলিমা দেবী সহানুভূতির সঙ্গে সব শুনিয়াছেন এবং তাহাদিগকে আশ্বাস দিয়াছেন। তবে তাঁহার নিজের অবস্থাও এমন কিছু সচ্ছল নয়, সুতরাং কোনরূপ আর্থিক সাহায্য করিতে পারিবেন না! অমিয়া বলিয়াছে, আপনি আমাদের আশ্রয় দিয়েছেন, সেই যথেষ্ট। আমাদের খরচের ব্যবস্থা যেমন করে হোক, আমরা করে নেব। কলকাতায় শুনেছি কত দুষ্ট লোক আছে, আপনি একটু আমাদের খোঁজ-খবর রাখবেন।

নীলিমা দেবী বলিলেন, কোন ভয় নেই বাছা। আমার বাড়ীতে যতদিন থাকবে, তোমার কোন চিন্তা নেই।

অমিয়ার কাছে যৎসামান্য যাহা ছিল, তাহা দিয়াই তাহারা নিজেদের নূতন সংসার গুছাইয়া

লইল। টিনের চালার পাশেই একটি রোয়াকের মত ছিল, তাহাই পরিষ্কার করিয়া এবং চাটাই দিয়া ঘিরিয়া লইয়া ছোট একটি রান্নাঘর করিয়া লইল।

অমিয়া নীলিমাকে মাসিমা বলিয়া ডাকে। মাসিমার সঙ্গে সঙ্গে পাড়ায় এবাড়ী ওবাড়ী যায়। পুরাতন ছেঁড়া কাপড় লইয়া আসিয়া তাহা দিয়া কাঁথা সেলাই করে। প্রতি কাঁথায় দুই টাকা আড়াই টাকা পায়। আবার হয়তো চেনা বাড়ী হইতে কলাইয়ের ডাল ও চালকুমড়া লইয়া আসে। যত্ন করিয়া বড়ি তৈয়ার করে। তাহাতেও কিছু কিছু আয় হয়। খানকয়েক বই সঙ্গে ছিল, তাছাড়া আরও কিছু বই যোগাড় করিয়া, বইগুলি বসিয়া বসিয়া পড়ে। কখনো ছোট ভাই হরিশকেও ধরিয়া বসাইয়া একটু একটু পড়ায়।

হরিশের কিন্তু পড়াশুনায় মন নাই। অমিয়া বুঝিল, তাহাকে কোন ইস্কুলে পাঠাইতে না পারিলে তাহার আর পড়াশুনা কিছুই হইবে না। অথচ ইস্কুলের ব্যয় বহন করা তাহার পক্ষে সম্ভব নয়। এদিকে অমিয়ার সামান্য যাহা আয়, তাহাতে দুবেলা দুমুঠা পেট ভরিয়া খাওয়াও চলে না। কিছুদিন পরে পাড়ার একটি খবরের কাগজওয়ালাকে ধরিয়া হরিশের একটি কাগজ বিক্রি করিবার কাজ ঠিক করিয়া লইল। আরো কিছুদিন পরে পাড়ার এক ভদ্রলোকের মোটর গাড়ী ধুইবার কাজ সংগ্রহ করিয়া লইল। এই দুইটি কাজে তাহার সকাল বেলাটা কাটিয়া যাইত তারপর একটু বই লইয়া বসিত বটে, কিন্তু পড়াশুনা বিশেষ হইত না। একটু পরেই রান্নাঘরে গিয়া দিদির কাছে খাবার জন্য আবদার ধরিত। দিদিও যথাসাধ্য শীঘ্র রান্না সারিয়া তাহাকে ভাত বাড়িয়া দিয়া পাশে বসিয়া খাওয়াইতেন।

অমিয়া বলে, হরি, একটু লেখাপড়া শেখ। পুরুষ মানুষ, লেখাপড়া না শিখে কি করবি?

হরিশ বলে, লেখাপড়া আমার দ্বারা হবে না।

এটা ভারি অন্যায়। তোর দাদা, কাকা, মামা, সবাই লেখাপড়া জানেন।

এই কথাগুলি বলিয়াই অমিয়া গম্ভীর হইয়া গেল। বোধহয় তাহার আত্মীয়স্বজনের কথা মনে পড়িয়া গেল। চোখের জল মুছিয়া বলিল, পাড়ার সব দুষ্টু ছেলেদের সঙ্গে মিশে তোর মতিগতি খারাপ হয়ে যাচ্ছে।

যা হচ্ছে, বেশ হচ্ছে, বলিয়া হরিশ তাড়াতাড়ি খাওয়া শেষ করিয়া উঠিয়া গেল।

—দুই—

এমনি করিয়া সুখে দুঃখে দুই ভাইবোনের জীবন কাটিতেছিল। যে ভদ্রলোকটি উহাদিগকে শিয়ালদহ হইতে লইয়া আসিয়াছিলেন, তিনি কিছুদিন ধরিয়া উহাদের সম্বন্ধে একটু বেশী খোঁজ খবর লইতে আরম্ভ করিলেন। কিন্তু নীলিমা দেবী তাঁহাকে একদিন এমন কড়া কড়া কথা শুনাইয়া দিলেন, যে তাহার পর হইতে আর বেশি ঘনিষ্ঠতা দেখাইতে সাহস করিতেন না।

কিন্তু মুস্কিল হইল হরিশকে লইয়া। একদিন বাড়ী আসিয়া বলিল, দিদি আমি একটা মোটর-কারখানায় কাজ নিয়েছি। কাল থেকে ন'টার সময়ে ভাত চাই।

দিদি বলিলেন, ও কাজটা কি ভাল হ'ল? কত করে বলছি, একটু পড়াশুনো কর। অন্তত ম্যাট্রিকটা পাশ কর। তাহলেও কোন একটা ভাল কাজ পাওয়া যেতে পারে।

কোন উপদেশেই ফল হইল না।

হরিশের আয় পূর্বাপেক্ষা বাড়িয়াছে, কিন্তু তাহাতে সংসারের সচ্ছলতা বাড়িল না। হরিশ চা খাইতে শিখিয়াছে। দু'বেলা বড় বড় বাটিতে চা না হইলে তাহার চলে না। সঙ্গে খাবারও চাই। কিছুদিন পরে দেখা গেল, হরিশ বিড়ি খাইতে শিখিয়াছে। অমিয়া কাছে ডাকিয়া কত আদর করিয়া কত বুঝায়, কত তিরস্কার করে, সে কত খারাপ হইয়া যাইতেছে, তাহা বুঝাইতে চায়, কিন্তু হরিশের কতকগুলি বন্ধু এমন জুটিয়াছে যে সে তাহাদের পরামর্শ ব্যতীত কাহারও কোন কথায় কর্ণপাত করে না।

অমিয়া যতই প্রাণপণে চেষ্টা করে, ভাইটিকে সংশোধন করিতে, যতই সে স্বপ্ন দেখে, তাহার ভাই বড় হইলে তাহাদের দুঃখ ঘুচিবে, তাহাদের অভিশপ্ত জীবনে শান্তি আসিবে, ততই যেন হরিশ দূরে সরিয়া যায়। যে পরিবারে, যে সমাজে সে জন্মিয়াছে, যে সংস্কার তাহার অস্থিমজ্জাগত, সব যেন তাহার কাছে একান্ত মূল্যহীন, একান্ত নিরর্থক। অমিয়া দিবারাত্রি কত বুঝায়, কিছুতেই ফল হয় না। এক একদিন যেন হরিশ বুঝিতে পারে, সে কত মন্দ হইয়া যাইতেছে, সে কত নীচে চলিয়া যাইতেছে, তাহার বন্ধুরা মোটেই ভাল নয়। এক একবার যেন সে চেষ্টাও করে, তাহাদের মোহ হইতে বিমুক্ত হইতে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত কিছুই হয় না। এক এক সময়ে সে নিজেই দিদির কাছে বলে, আচ্ছা, এখন থেকে আমি ভাল হ'তে চেষ্টা করব। কিন্তু তার চেষ্টা ওই কথা পর্যন্তই। তার পারিবারিক সংস্কার যেন দুষ্ট রাহুতে সম্পূর্ণ গ্রাস করিয়া ফেলিয়াছে।

—তিন—

একদিন দুপুরে অমিয়া পাড়ার এক বাড়ীতে গিয়াছিল জামার অর্ডার আনিতে। অমিয়া এখন ছোট ছোট জামা, ব্লাউজ প্রভৃতি কাটিতে ও সেলাই করিতে শিখিয়াছে। ইহাতে তাহার আয়ও বেশ কিছু বাড়িয়াছে। প্রায় বার বৎসর ধরিয়া সে একান্ত মনে যাহা চাহিয়াছে, সাংসারিক খরচপত্রের জন্য কাহারও মুখাপেক্ষী সে থাকিবে না, আজ সে তাহা পাইয়াছে। তাহার সামান্য টিনের ঘরখানির শ্রী ফিরিয়াছে। এমন কি, মাসিমার মারফৎ দুই একটি বিবাহের প্রস্তাবও যে না আসিতেছে, তাহা নয়। এমন শান্ত, শিষ্ট, আত্মসম্মানী, সংযত মেয়ে নাকি এ অঞ্চলে নাই।

কিন্তু হরিশের জন্য অমিয়ার মনে শান্তি নাই। সংসারে যা কিছু আপন ছিল, সবই তো

গিয়াছে। শুধু আছে আদরের এইটুকু ভাই। সেই ভাইটি চোখের সামনে এমন করিয়া লক্ষ্মীছাড়া হইয়া যাইতেছে, ইহা কি কম দুঃখের কথা!

একদিন অমিয়া হরিশকে খুব তিরস্কার করিল। হরিশও যা-তা উত্তর দিল। অবশেষে অমিয়া দুঃখে ও ক্রোধে আত্মহারা হইয়া বলিয়া বসিল, তোর মত ভাই থাকার চেয়ে না থাকাই ভাল। তাই না কি?



এই কথা বলিয়া হরিশ বাড়ী হইতে বাহির হইয়া গেল।

বৈকালে হরিশ বাড়ী আসে চা ও খাবার খাইতে। কিন্তু আজ সে ফিরিল না। রাত্রি আসিল, হরিশ ফিরিল না। ভাত লইয়া দুপুররাত পর্যন্ত অমিয়া বসিয়া রহিল, তবু হরিশ ফিরিল না। অমিয়া উপবাসী রহিল।

পরদিন পাড়ার সর্বত্র খোঁজ করিয়াও কোন সন্ধান মিলিল না। অমিয়া পাগলের মত চারিদিকে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল। কোন সংবাদ কেহ দিতে পারিল না। অমিয়া জীবন্মৃত হইয়া দিনাতিপাত করিতে লাগিল। কেবলই মনে হইতে লাগিল, কেন আমি অত বকাবকি করিলাম? আর একটু বড় হইলে নিজেই সব বুঝিত, ভাল হইয়া যাইত। যতই ভাবে, ততই তাহার চোখ ফাটিয়া জল বাহির হয়।

—চার—

এমনি করিয়া কয়েক মাস কাটিল। অমিয়া যেখানে যাহাকে পায়, তাহাকেই জিজ্ঞাসা করে হরিশের কথা। থানায় খবর দেওয়া হইয়াছে, তাহারাও কোন সংবাদ দিতে পারে নাই।

একদিন অমিয়া রান্না চড়াইয়া মুখ গুঁজিয়া হরিশের কথা ভাবিতেছে, এমন সময় নীলিমা দেবী

একখানি খবরের কাগজ আনিয়া তাহার একটি জায়গা অমিয়াকে পড়িতে বলিলেন। অমিয়া সাগ্রহে পড়িল—এলাহাবাদে একটি বাঙালী ছেলে একটি মোটরগাড়ীর আলো চুরি করিয়া তিন মাস কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছে। তাহার কোন আত্মীয়-স্বজন নাই। শুধু বেহালায় নাকি এক দিদি থাকেন। সংবাদ পড়িয়াই অমিয়া আধসিদ্ধ ভাতের হাঁড়িটা ঠন্ করিয়া মাটিতে নামাইয়া রাখিয়া ঘর-দ্বার বন্ধ করিয়া সোজা লালবাজারে গিয়া উপস্থিত হইল এবং সেখানে অনুরোধ জানাইল, তাহার ভাইটি কোথায় কোন্ জেলে আছে এবং কোন্ তারিখে কোন্ সময়ে ছাড়া পাইবে, তাহা যেন খোঁজ করিয়া তাহাকে জানান হয়। পুলিশ-অফিসারটি বলিলেন, সত্বরই খোঁজ লইয়া তাহাকে জানান হইবে। প্রকৃতপক্ষে কয়েকদিন পরেই অমিয়া সমস্ত সংবাদ জানিতে পারিল।

আজ হরিশের জেল হইতে বাহির হইবার কথা। এলাহাবাদের রেলওয়ে ষ্টেশনে নামিয়াই একখা।ন রিক্শা ভাড়া করিয়া অমিয়া জেলের দিকে যাত্রা করিল। সঙ্গে একটি পুঁটুলি।

ওদিকে হরিশ সকালে প্রাতঃকৃত্য সারিয়া জেলের পোষাক ছাড়িয়া নিজের মলিন ও ছিন্ন জামা কাপড় পরিয়া জেলের গেটের কাছে আসিয়াছে। আটটা বাজিতেই, তাহাকে ছাড়িয়া দেওয়া হইল। গেটের বাহিরে আসিতেই সম্মুখে অমিয়াকে দেখিয়া যেমন আনন্দিত তেমনি বিস্মিত হইল এবং বলিল, তুমি এখানে ?

এই কথা বলিয়াই ভূমিষ্ঠ হইয়া দিদিকে প্রণাম করিল।

অমিয়া তাহাকে কোলের কাছে টানিয়া আনিয়া আদর করিতে লাগিল। তাহার চোখ দিয়া টপ্ টপ্ করিয়া জল পড়িতেছিল। হরিশকে রাস্তার একপাশে আনিয়া ঘাসের উপর বসিয়া আঁচল দিয়া স্থানটা একটু পরিষ্কার করিয়া লইল। তারপর হরিশকে পাশে বসাইয়া পুঁটুলি খুলিয়া, তাহার ভিতর হইতে একটি কৌটা বাহির করিয়া তাহা হইতে অনেকগুলি ক্ষীরপুলি বাহির করিয়া হরিশকে খাইতে দিল। হরিশ ক্ষীরপুলি খুব ভালবাসে।

হরিশ বলিল, তুমি এই খাবার করে আমাকে খাওয়ানর জন্য এতদূর এসেছ ? আমার মত ভাইয়ের জন্য ?

খাবার খাওয়া শেষ হইলে অমিয়া পুঁটুলির ভিতর হইতে একটি বোতল বাহির করিল। তাহাতে জল ছিল। মুখ খুলিয়া হরিশকে জল খাইতে বলিল। হরিশ বলিল, জলও বয়ে এনেছ কলকাতা থেকে ?

হ্যাঁ রে, হ্যাঁ। এখন, এই নে, ও কাপড় জামা ছাড়। এই কথা বলিয়া অমিয়া পুঁটুলির ভিতর হইতে একটি সার্ট ও একখানি পরিষ্কার ধুতি বাহির করিয়া দিল। বলিল, এই সার্ট আমি নিজে সেলাই করেছি।

কাপড় জামা ছাড়িয়া হরিশ পুনরায় দিদির পায়ের ধূলা লইল। অশ্রুবিজড়িত স্বরে বলিল; দিদি, আমি আর তোমার কথার অবাধ্য হ'ব না। আমাকে যেন ভূতে পেয়েছিল। এখন

থেকে আমি বাড়ী ছেড়ে আর কোথাও যাব না। এবার কলকাতায় ফিরেই আমি ইস্কুলে ভর্তি হ'ব।

জেলের গেট হইতে অমিয়া ও হরিশ সোজা ষ্টেশনে আসিয়া উপস্থিত হইল। হরিশ বলিল, তুমি কিছু খেলে না? সবই তো আমায় দিয়ে দিলে।

কই, তুমি আমাকে খেতে বললে না তো?

সত্যি এত আহ্লাদ হয়েছিল আর এত খিদে পেয়েছিল, যে আমার কিছু মনে ছিল না।

আচ্ছা, আচ্ছা, ষ্টেশনের খাবারের দোকান থেকে কিছু কিনে খেলেই হবে 'খন।

এই কথা বলিতে বলিতেই ট্রেন প্ল্যাটফর্মে আসিয়া ঢুকিল।

——



গোবিন্দ, তৃতীয় গোবিন্দ নামে পরিচিত। ধ্রুব, অকর্মণ্য, অলস, ও বিলাসী জ্যেষ্ঠ পুত্রকে রাজা না করিয়া সিংহাসনে অভিষিক্ত করিয়া গেলেন গোবিন্দকে—এই হিংসায় স্তম্ভ হইলেন বিদ্রোহী। পিতার প্রতি দুর্ব্যবহার করিয়া রাজ্য ত্যাগ করিয়া চলিলেন রাজ্যান্তরে। বিদ্রোহ করিলেন এবং সৈন্য সংগ্রহ করিয়া আক্রমণ করিলেন রাজধানী ময়ূরখণ্ডী।

তৃতীয় গোবিন্দ সিংহাসনে আরোহণ করিবার অল্পদিন পরেই ভাইয়ের সহিত যুদ্ধ করিতে হইল। সে সময়ে দক্ষিণভারতের নানাস্থানে ছিল তাঁহাদের রাজধানী। প্রথমে ছিল নাসিক, তারপর স্থানান্তরিত হইয়াছিল মান্যখেট বা ময়ূরাক্ষী এখন তাহাদের সেই রাজধানীর নাম হইয়াছে মান্যখেট বা ময়ূরখণ্ডী। অতীতের কোন গরিমা, কোন ঐশ্বর্য্য আর সেখানে নাই!

স্তম্ভ সহজ লোক ছিলেন না। রাজা হইবার জন্য তিনি দক্ষিণাপথের অনেক রাজার সঙ্গে মিলিত হইলেন। কয়েকজন রাজা হইলেন তাঁহার সহায়। চালুক্য, পল্লব, মালব ও গুর্জরের নরপতিরাও যোগ দিলেন স্তম্ভের সঙ্গে—নিজ নিজ স্বার্থসাধনের জন্য।

গোবিন্দ ছিলেন রণকৌশলী এবং বীর যোদ্ধা। তিনি অল্প সময়ের মধ্যেই রাজ্যের সৈন্যদলকে নূতন করিয়া গড়িয়াছিলেন। সেনাপতি ও সৈন্যাধ্যক্ষ নিযুক্ত করিয়াছিলেন প্রকৃত যোদ্ধা ও সাহসীদের নিয়া। জানিতেন—সিংহাসন অধিকার করিবার জন্য স্তম্ভ বৃথা দর্প করেন নাই—নিশ্চয়ই রাজ্য আক্রমণ করিবেন। তাহাই হইল।

নাসিকের কাছাকাছি এক বিশাল প্রান্তরে সমুদয় রাজা ও সৈন্য মিলিত হইয়া চলিল রাজধানী ময়ূরাক্ষী আক্রমণ করিতে।—দুই পক্ষে আরম্ভ হইল ভীষণ যুদ্ধ। ভাইয়ে ভাইয়ে রাজ্যের জন্য সংগ্রাম, ভারতের ইতিহাসে তোমরা অনেক পড়িয়াছ। এই যুদ্ধে গোবিন্দের বীরত্বের কাছে স্তম্ভের মিত্রশক্তি কোনরূপেই বিজয়ী হইতে পারিল না। যে রণ-কুঞ্জরের উপর হইতে স্তম্ভ সৈন্যপরিচালনা

এইভাবে হইল পরস্পরে মতভেদ ও মনান্তর। কেহ যুদ্ধক্ষেত্র হইতে পলায়ন করিলেন, কেহ নিজ রাজ্যে ফিরিয়া গেলেন! কেহ প্রাণ দিয়া যুদ্ধ করিলেন না। স্তম্ভ নিরুপায় হইয়া একাই তাঁহার সৈন্যদের লইয়া যুদ্ধ করিতেছিলেন। অবশেষে—হস্তিযূথবেষ্টিত হইয়া হইলেন গোবিন্দের কাছে বন্দী। সব আশা সব দম্ভ বৃথা হইল।

রাজা বলিলেন—সসম্মানে নিয়ে যাও বন্দীকে রাজধানীতে। বন্দী করে রেখো—রাজ-অতিথিশালার কক্ষে। সাবধান! চারিদিকে রাখবে সতর্ক প্রহরী ও সৈন্য। আমি শত্রুসৈন্য নির্ম্মূল করে ফিরবো রাজধানীতে—তারপর করবো বিচার এই বিদ্রোহী, বিপ্লবী রাজ্যধ্বংসকারী স্তম্ভের। যাও তোমরা। যাও সেনাপতি।—

রাজার আদেশ মানিয়া লইলেন সেনাপতি। স্তম্ভ বন্দীভাবে সশস্ত্রসৈন্য-পরিবেষ্টিত হইয়া রাজধানীতে নীত হইলেন।

এদিকে সম্রাট তৃতীয় গোবিন্দ জ্যেষ্ঠভ্রাতা স্তম্ভ রাণাবলোকের সাহায্যকারী রাজাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে আরম্ভ করিলেন। সিংহাসনে সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়া বিদ্রোহী ভ্রাতার সহায়ক পল্লব, চালুক, রাজাদের রাজ্য করিলেন অধিকার।

গোবিন্দের বিজয়বার্ত্তা হইল দিকে দিকে প্রচারিত! সকল রাজারাই তাঁহাকে মানিয়া লইলেন রাজচক্রবর্ত্তী সম্রাট বলিয়া।

—তিন—

রাজধানী ময়ূরখণ্ডী আজ লোকজনের কলকোলাহলে পরিপূর্ণ। বিশাল রাজসভায় মন্ত্রী ও পারিষদবর্গ, সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিরা উপবিষ্ট। গোবিন্দ বসিয়াছেন সিংহাসনে। চামর ব্যজন করিতেছে চামরধারিণীরা। প্রহরীরা রাজার পাশে—সতর্কভাবে পাহারা দিতেছে। সভাগৃহের চারিদিকে সৈন্যদল। নিমন্ত্রিত সামন্ত রাজারাও আসিয়াছেন বিচার দেখিতে। অপূর্ব্ব—আশ্চর্য্য এই বিচার। পূর্ব্বে কখনও এমন হয় নাই। নকীব ফুকারিল চারিদিকে। রাজার বিজয়বার্ত্তা প্রশস্তি পাঠ করিলেন—চারণ কবি ও বিজ্ঞ পণ্ডিতমণ্ডলী।

সৈন্যাধ্যক্ষ রাজার আদেশে বন্দী জ্যেষ্ঠভ্রাতা স্তম্ভকে সভাস্থলে আনিতে বলিলেন। আদেশ প্রতিপালিত হইল—হস্তপদ শৃঙ্খলে আবদ্ধ বন্দীকে আনা হইল সভাগৃহে। শিকলে বাজিয়া উঠিল ঝন্ ঝন্ শব্দ।

বিচার—বিচার। সেখানে ন্যায় ছাড়া অন্যায় হইতে পারে না।

রাজভ্রাতা স্তম্ভকে ঘিরিয়া রহিল উন্মুক্ত তরবারিহস্তে সৈনিকগণ। নিস্তব্ধ সভাগৃহ। কাহারো মুখে একটি কথা নাই—সকলে উৎসুকভাবে অপেক্ষা করিতেছেন। ব্রাহ্মণ সুবিজ্ঞ বিচারকমণ্ডলী—বিধি বিধান খুলিয়া বসিয়া আছেন। রাজার আদেশ, বিচারে যাহাতে কেহ ত্রুটি ধরিতে না পারেন।

রাজা প্রশ্ন করিলেন বন্দী জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে—

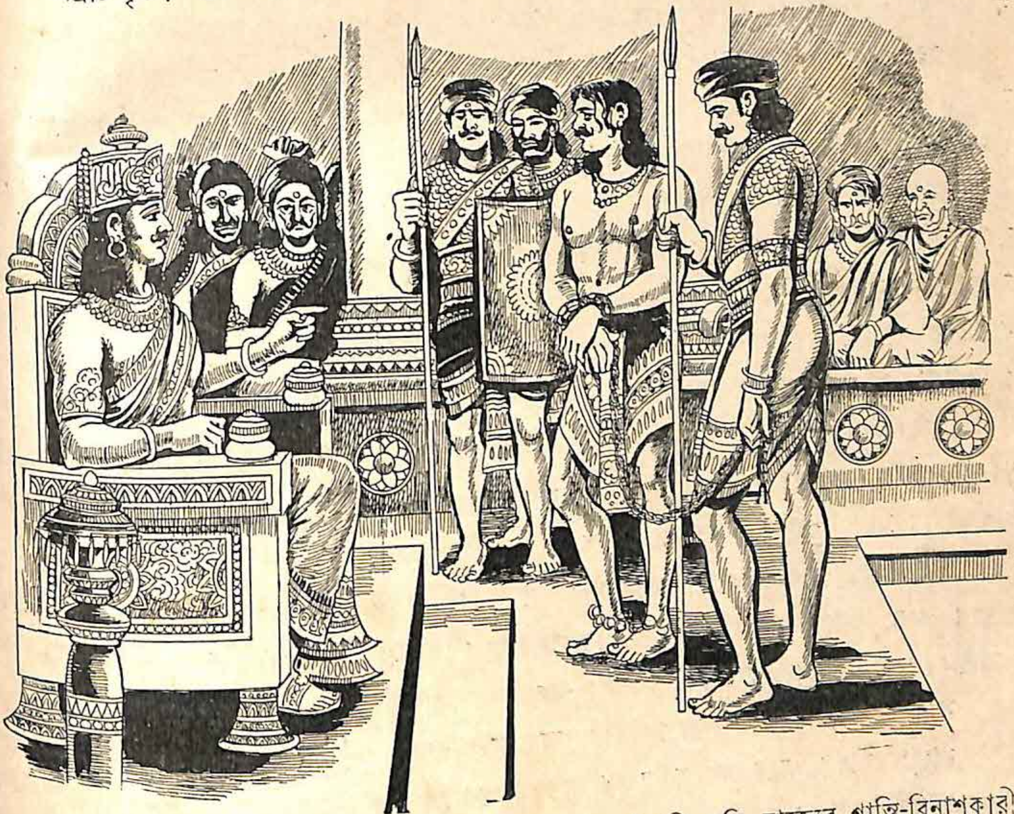
বন্দী, তুমি রাজদ্রোহী। এই রাজ্যের প্রজা আর রাজপুত্র হয়েও তুমি জন্মভূমির প্রতি করেছ বিশ্বাসঘাতকতা। স্বীকার কর তোমার এই বিদ্রোহের কথা? স্বীকার কর তুমি রাজদ্রোহী?

উত্তর করিল বন্দী স্তম্ভ—হাঁ, স্বীকার করি বিদ্রোহ করেছি।

কেন?

পিতার অন্যায় বিচারের জন্য। প্রতিশোধ লইতে—

সম্রাট মৃত। সে কথা আমি শুনবো না। আমি সম্রাট, আমি রাষ্ট্রকুট রাজ্যের অধিপতি!



তুমি বিদ্রোহ করেছ আমার বিরুদ্ধে। রাজবিদ্রোহী তুমি, বিপ্লবী তুমি, রাজ্যের শান্তি-বিনাশকারী, নরঘাতক দস্যু এই নরাধমের বিরুদ্ধে কি দণ্ডবিধান হতে পারে বলুন আপনারা?

কেহ বলিলেন—প্রাণদণ্ড।

কেহ বলিলেন—যাবজ্জীবন!

বিচারকমণ্ডলী বলিলেন—জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা একথা মনে করবেন মহারাজ!

ন্যায়ের বিরুদ্ধে আমি যেতে পারি না। রাজা হলেও আমার সে অধিকার নাই। সে ভ্রাতাই হউক, পিতাই হউক—বিচার! বিচার!

স্তম্ভ করুণকণ্ঠে বলিলেন,—ভাই, আমাকে মার্জ্জনা কর। ক্ষমা করো আমার এ অপরাধের জন্য। স্বীকার করি আমি অপরাধী। তুমি সম্রাট আর আমি রাজদ্রোহী—তবু আমি তোমার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা। এক মাতৃগর্ভে জন্মগ্রহণ করেছি, এক মাতৃস্তন্য পান করেছি, এক সঙ্গে মানুষ হয়েছি ভাই! আমাকে ক্ষমা কর—ক্ষমা করো। অনুতপ্ত স্তম্ভ আর কথা বলিতে পারিলেন না। লজ্জায়, অপমানে কাঁদিতে লাগিলেন।

সভাস্থ সকলের কণ্ঠে ধ্বনিত হইল—ক্ষমা ক্ষমা! বড় ভাই তো। ক্ষমা ক্ষমা! ক্ষমা! ক্ষমা করুন সম্রাট!

রাজা তৃতীয় গোবিন্দ ধীরে ধীরে সিংহাসন হইতে নামিয়া আসিলেন এবং বন্দীর কাছে আসিয়া প্রহরীদের ইঙ্গিত করা মাত্র বন্ধন শৃঙ্খল উন্মোচিত হইল। ফিরিয়া আসিয়া বসিলেন সিংহাসনে, স্তম্ভের হাত ধরিয়া নিয়া আসিলেন। বসাইলেন তাঁহাকে সিংহাসনের পাশে।

আমি রাজা। রাজদ্রোহীর অপরাধের শাস্তি প্রাণদণ্ড—নতুবা নির্ব্বাসন। আমি—আমি—চক্ষু সজল হইল তাঁহার। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার পদধূলি লইয়া তাঁহাকে আলিঙ্গন করিয়া বলিলেন—আমি আপনাকে নির্ব্বাসিত করলাম এ রাজ্য থেকে। আপনাকে আমার বিজিত গন্ধরাজ্য গদাওয়াড়ি প্রদেশের শাসনকর্তা করলাম। হায়রে মানুষের মন, শত অপরাধেরও কালিমা ঘুচিয়া যায়, বংশ-পরম্পরাগত রক্তের প্রবাহের অপূর্ব্ব বন্ধনে!

মুগ্ধ বিস্মিত হইল সকলে—স্তম্ভ আলিঙ্গন করিলেন ভ্রাতাকে! করুণকণ্ঠে বলিলেন—'ভাই তুমি মহৎ, তুমি উদার—তুমি ন্যায়বান্, তুমি বিচারক, প্রজাবৎসল, ভ্রাতৃবৎসল তুমি! তুমিই সম্রাট্ হবার যোগ্য—আমি নই। আজ হতে আমি তোমার দাদা, স্নেহপরায়ণ দাদা। দেহে একবিন্দু রক্ত থাকতে কোন অন্যায় আমি করবো না! করযোড়ে উর্দ্ধপানে চাহিয়া বলিলেন,—পিতা, ক্ষমা করো। ক্ষমা করো। তুমি যথার্থ বিচার করেছিলে, আমি অধম বুঝতে না পেরে শত অন্যায় করেছি! ক্ষমা করো! ক্ষমা করো পিতা।—ক্ষমা করো স্বর্গ থেকে!

সভাস্থ সকলে এই মিলন দৃশ্য দেখিয়া অনুভব করিল রাজা গোবিন্দের মহত্ত্ব।

সাধু! সাধু! রবে রাজদরবার গৃহ প্রতিধ্বনিত হইল।

পরবর্তীকালে দুই ভাইয়ের মধ্যে আন্তরিকতা না থাকিলেও বিচ্ছেদের কোন কারণ ঘটে নাই।

দাক্ষিণাপথের এই বিজয়ী সম্রাট গোবিন্দ তাঁহার রাজত্বকালে বহু যুদ্ধ বিগ্রহ করিয়াছেন। তিনি চাহিতেছিলেন সারা ভারতবর্ষ জয় করিতে। সে বিষয়ে তিনি সার্থকও হইয়াছিলেন।

কনৌজের রাজা নাগভটকে পরাজিত করিয়া তিনি তাঁহার রূপলাবণ্যবতী কন্যাকে বিবাহ

করেন—কন্যার নাম ছিল কলাবতী। সেকালে কলাবতী খুব বিদুষী ছিলেন। স্বামীর দিগ্বিজয়ে তিনি সর্ব্বদা উৎসাহ দিতেন।

যাহা হউক, দক্ষিণ ভারতের পল্লব, চালুক্য, বেঙ্গি, গুর্জ্জর সকল রাজাদের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া তিনি অসাধারণ শৌর্য্য ও বীর্য্যের পরিচয় দিয়াছিলেন। উত্তর দক্ষিণ পূর্ব্ব পশ্চিম সর্ব্বত্র এই বিজয়ী রাজার বীরত্বের পরিচয় পাই।

—চার—

রাণী কলাবতী ছিলেন ধার্ম্মিকা এবং তীর্থ ভ্রমণে ছিল তার নিতান্ত আগ্রহ। একবার রাজাকে বলিলেন—চল তীর্থপর্য্যটনে যাই।

বেশ, কোথায় যাইবে বল।

সাম্রাজ্ঞী বলিলেন—চল, কেদার-বদরী দর্শন করে আসি। রণে শ্রান্ত রাজা বলিলেন, বেশ তাই চল। হিমালয়ের অপরূপ রূপমাধুর্য্যে গভীর রূপে নিশ্চয় চিত্ত প্রশান্ত ও উদার হইবে। এক শুভ দিনে যাত্রা করিলেন রাজা ও রাণী হিমালয়ের বুকে—কেদারবদরীর পথে।

অগ্রসর হইলেন তাঁহারা হরিদ্বারের পথে। পুণ্যসলিলা গঙ্গানদী বেগে নীচে নামিয়া আসিয়াছেন। চারিদিকে দেবমন্দির দেখা যায়। হিমালয়ের উচ্চ শৃঙ্গে নিবিড় অরণ্যানী। রাজা ও রাণী অবগাহন করিলেন পুণ্যসলিলে—দানে ধ্যানে মধুর ব্যবহারে তীর্থযাত্রী দল, পথিক, নগরবাসী সকলে ধন্য ধন্য করিতে লাগিল সম্রাটের মহৎ ও উদার ব্যবহারে। চারিদিকে লোকের মুখে প্রশংসা আর ধরে না। দীন দুঃখী ভিখারী মুক্তকণ্ঠে রাজা ও রাণীর সুখ্যাতি করিতেছিল।

হৃষীকেশ, লছমনঝোলা উত্তীর্ণ হইয়া সৈন্যেরা কেহ চলিল পদব্রজে, অশ্বারোহী সৈন্যদের অশ্বখুরধ্বনি প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল গিরিশিখরে শিখরে।—পর্ব্বতের গায়ে শিবিরের গায়ে শিবির, রাত্রিতে জ্বলিয়া উঠে নগরের শোভা। কেদারবদরী যাত্রীরা বিস্মিতনয়নে চাহিয়া দেখে এই রাজদম্পতির সমারোহ তীর্থযাত্রা। দেখে পথে দিনের পর দিন চলিয়াছে যাত্রীদল। সকলে তাঁহাদিগকে অভ্যর্থনা করে—পাহাড়িয়ারা—মহাসুখী—দানে-ধ্যানে তাহারা পুলকিত। রাণী করযোড়ে চলেন পর্ব্বতের পথে। অপূর্ব্ব দৃশ্য— কোথাও ঝরণা ঝরে ঝর্ ঝর। গঙ্গা—অলকানন্দা পাহাড়ের গায়ে লুকোচুরি করিতেছেন। মন্দিরে মন্দিরে শঙ্খধ্বনি, বেদগান ঝঙ্কারিয়া উঠে মঠে মঠে।

একদিন বাধা পাইল যাত্রীদল এক পাহাড়িয়া রাজা বা সর্দ্দারের নিকট। পাহাড়িয়া রাজা সে ! নাম তার মায়াসর্ব্ব। সে সম্রাটকে সংবাদ পাঠাইল,—খবরদার রাজা, আমার রাজ্যে যদি প্রবেশ কর, তবে সব লোককে মেরে ফেলবো !

সম্রাট তাঁহাকে বলিয়া পাঠাইলেন—আমরা তীর্থযাত্রী, তোমার দেশ জয় করিতে আসিনি। আমরা কোন অত্যাচার করবো না তোমাদের উপর—নিব না রাজ্য কেড়ে।

শুনিল না পাহাড়িয়া রাজা। একদিন রাত্রিতে আক্রমণ করিল রাজশিবির। অজানা পার্ব্বত্য পথ। তীরের পর তীর আসিয়া পড়িতে লাগিল ঝাঁকে ঝাঁকে। রাজসৈন্য কেহ কেহ প্রাণ দিল এই বিষাক্ত তীরের আঘাতে। বীর সম্রাট গোবিন্দ গর্জিয়া উঠিলেন। রাজার আদেশে সৈন্যদল পাহাড়ে পাহাড়ে ছুটিল তরোয়াল-হস্তে। বর্শা ছুটিল তীরবেগে। ধানুকী সৈন্যেরা তীর ছুঁড়িতে লাগিল, চারিদিকের পাহাড় লক্ষ্য করিয়া—কতক্ষণ যুঝিতে পারে দিগ্বিজয়ী রাজার সঙ্গে একজন পাহাড়ি সর্দ্দার। মায়াসর্ব্ব রাজা পরাজিত ও বন্দী হইল। রাজার শিবিরে তাঁহাকে আনা হইল।

গাড়োয়ালি সর্দ্দার সে। বলিষ্ঠ দেহ। মুখে চোখে বীরত্বের দীপ্তি, সহজ সরলভাবে সে আসিয়া দাঁড়াইল রাজার সম্মুখে।

সম্রাট গোবিন্দ বলিলেন—আমি এসেছি তীর্থদর্শনে। আমার সঙ্গে লড়াই করলে কেন?

আমার দেশের জন্য। আমরা পাহাড়িয়া নিরীহ স্বাধীন মানুষ। তুই যদি তীর্থযাত্রী, তবে এত লোক কেন? সৈন্য কেন?

রাজা হাসিয়া বলিলেন—তোমার সঙ্গে লড়াই করতে হবে ভেবেছিলাম কিনা। তাই—

মায়াসর্ব্ব হাসিল। সরল পাহাড়িয়া মানুষ। সহজেই শান্ত হইল। সর্দ্দার বলিল—আমাদের রাজ্য জয় করলি না ত!

না রে-না।

যে দেশের স্বাধীনতার জন্য লড়াই করে, তাকে আমি ক্ষমা করি। তুমি স্বাধীন ভাবে রাজ্য কর। তুমি আমার বন্ধু।—কোল দিলেন তাঁকে।

তারপর মহাভাব হইল দুজনায়। তীর্থপরিক্রমায় সর্দ্দার তাঁহাদের সহায় হইল—তার দলবল নিয়ে। গোবিন্দ রাজার এক প্রশস্তিতে এই পাহাড়িয়া রাজার যুদ্ধের কথা, নানা বিশেষণে কবিত্বপূর্ণ ভাষায় লিখিত আছে।

রাষ্ট্রকূট নৃপতি তৃতীয় গোবিন্দ শুধু যে দিগ্বিজয়ী বীর ছিলেন—তাহা নহে। রাজ্যের উন্নতির জন্য আরোগ্যশালা, রাজপথ, দীঘি-সরোবর, দেবালয়, বাণিজ্যকেন্দ্র প্রসারের জন্য এবং বিভিন্ন দেশের বণিকদের সাদরে আহ্বান করিতেন তাঁহার রাজ্যে। পথিকদের জন্য পান্থশালা, অতিথিশালা, পথে পথে সরাইখানা এসব স্থাপন করিয়াছিলেন। শিক্ষার জন্য স্থাপন করিয়াছিলেন চতুষ্পাঠি ও বিবিধ বিদ্যাপীঠ। জৈন ধর্ম্মগ্রন্থ, হিন্দুশাস্ত্র সব বিষয়ের আলোচনা হইত রাজধানীতে, আসিতেন দেশবিদেশের বিখ্যাত পণ্ডিতমণ্ডলী। আরব, মিশর, তুর্কী ও ইতালীর সহিত ব্যবসা-বাণিজ্য হইত।

এই বীর রাজার পুত্র অমোঘবর্ষ পৃথিবীর একজন শ্রেষ্ঠ নরপতিরূপে ভারতবর্ষের শুধু নয় পৃথিবীর সম্রাটদের মধ্যে বরণীয় হইয়াছিলেন।



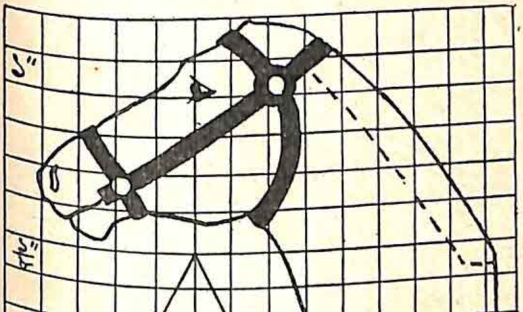
দোলনা ঘোড়া

শ্রীননীগোপাল চক্রবর্তী

দোলনা ঘোড়ায় বসে স্বচ্ছন্দে ছোট ছেলেরা দোল খেতে পারে। এটা তৈরী করা কঠিন নয়—তবে একেবারে নতুন যারা কাঠের কাজে হাত দিচ্ছে তাদের পক্ষে কিন্তু খুব ভেবে চিন্তে কাজ করতে হবে। যাঁরা কাঠের কাজ জানেন এমন কারও পরামর্শ নেওয়াও মন্দ নয়।

এই দোলনা ঘোড়ার মোটামুটি দুটো অংশ (১) ঘোড়া, (২) দোলনা।

ঘোড়া ঃ কাঠের ঘোড়ার কেবল সামনের দিক্‌টাই প্রয়োজন ; এজন্য ঘোড়ার মাথা আর ঘাড়টা থাকলেই চলবে। এই সঙ্গে আরও থাকবে মুখের লাগাম এবং বসবার জায়গা। ঘোড়ার মাথা আর ঘাড় —¾ ইঞ্চি পুরু একখানি ভালো তক্তা নাও। ঘোড়ার মাথা আর ঘাড়টা কত বড় হবে সেটা ঠিক করে নিয়ে সেই অনুসারে ঐ তক্তাখানিতে ১ ইঞ্চি বর্গ পেন্সিলের দাগ দিয়ে নাও এবং



(ক)



← ঘোড়ার কান

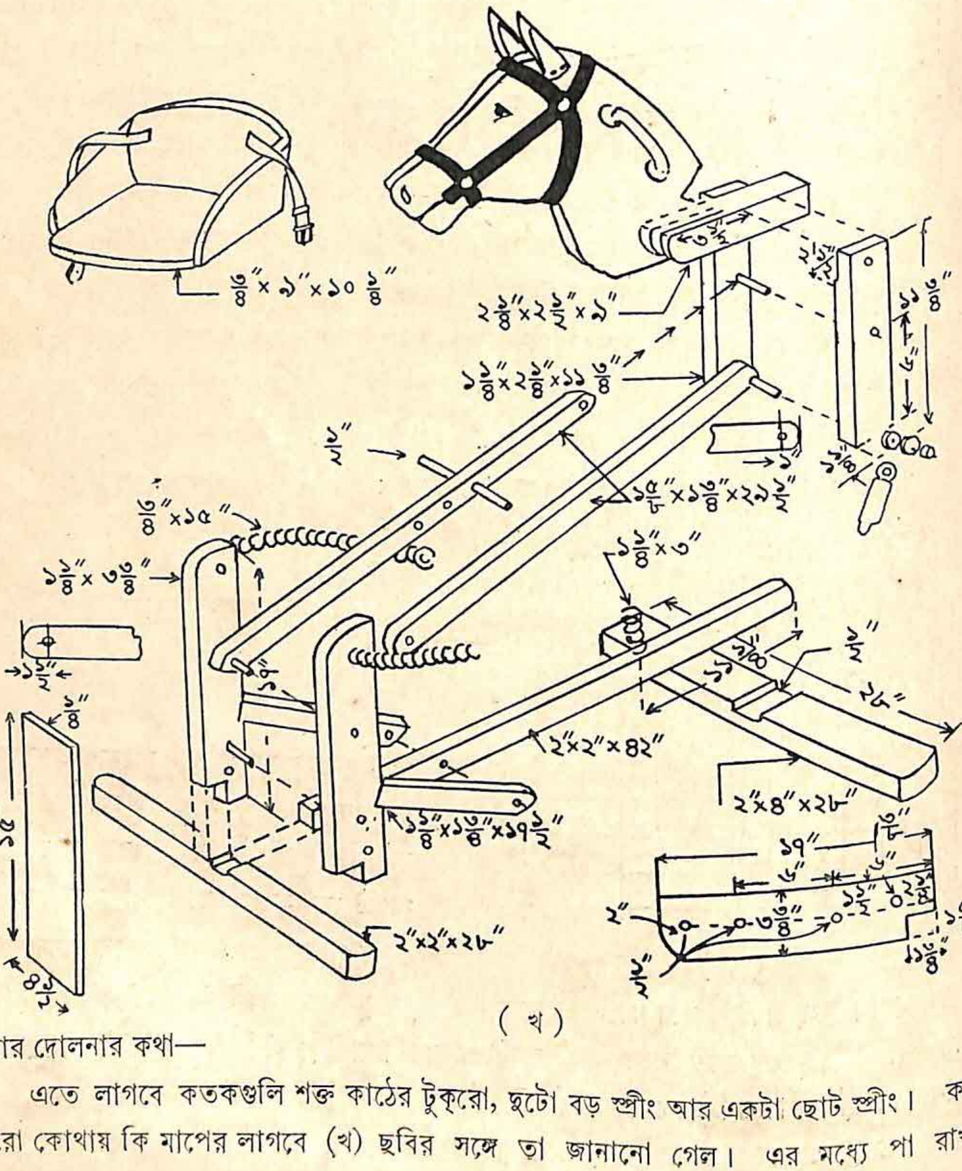
(ক) ছবি অনুযায়ী ঐ দাগের উপর দিয়ে ঘোড়ার মাথা ও ঘাড় আঁকো। তারপর বাটালী দিয়ে ওটা কেটে বের করে নাও। মাথাটাকে হলদে, সাদা বা সবুজ রং করা যেতে পারে। চোখ আর নাকে অবশ্য কালো রং দিতে হবে। লাগামটাও হবে কালো রংয়ের। ঘাড়ের চুলগুলো কালি দিয়ে এঁকেও দেওয়া যায়, আবার আরও সুদৃশ্য করতে হলে পাটের আঁশে কালী মাখিয়ে আঁঠা দিয়েও এঁটে নেওয়া চলে।

ঘোড়ার কান দুটি রবারের টিউব থেকে কেটে নিলেই চলবে।

ধরবার জন্য ঘোড়ার ঘাড়টির দু'পাশে দুটো হাতল চাই। এটা—দরজায় যে হাতল থাকে তা'

দিলেও চলবে। অবশ্য এই হাতল কত বড় হবে সেটা নির্ভর করে যে চড়বে তার হাতের মাপের উপর।

বসবার আসন— ¾ ইঞ্চি পুরু ১০¼ ইঞ্চি লম্বা ও ৯ ইঞ্চি চওড়া একখানি তক্তার সঙ্গে শক্ত করে ব্যাক বা ঠেঁশ দেওয়ার জায়গা করে নিতে হবে। এর পিঠের দিকের ঠেশের সঙ্গে একটা ফিতে বা বেল্ট বেঁধে নিলে (ছবি দেখ) প'ড়ে যাওয়ার ভয় কম থাকে।



(খ)

এইবার দোলনার কথা—

এতে লাগবে কতকগুলি শক্ত কাঠের টুক্‌রো, দুটো বড় স্প্রীং আর একটা ছোট স্প্রীং। কাঠের টুকরো কোথায় কি মাপের লাগবে (খ) ছবির সঙ্গে তা জানানো গেল। এর মধ্যে পা রাখবার

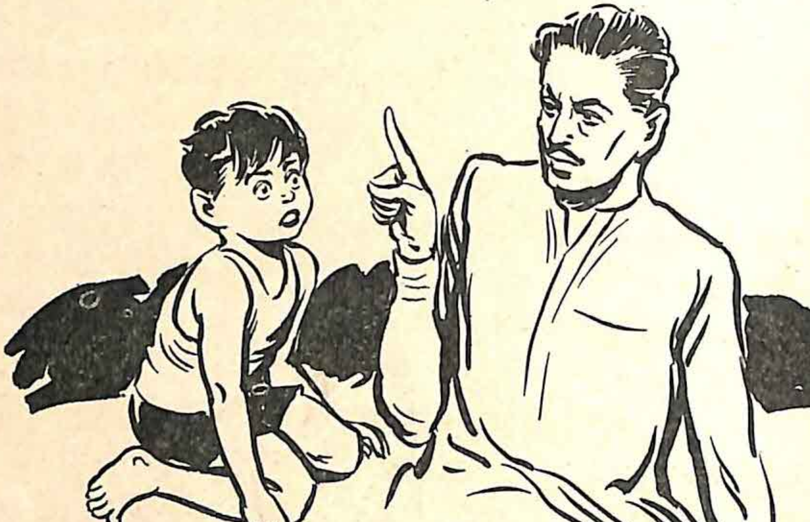
যে 'খিল'টা তার জন্য লম্বা কাঠখানিতে তিনটে ছিদ্র করা হ'য়েছে; তার কারণ, ঘোড়ায় যারা চড়বে তাদের পায়ের মাপ (হাঁটু থেকে পায়ের পাতা) সকলের সমান নয়। যার পায়ে যেটা যুৎসই হবে সেই ছিদ্রের মধ্যেই ঐ খিল বা খুঁটোটা দিয়ে নিলে আরোহীর পক্ষে তার পায়ে জোর দেওয়া সুবিধে হবে।

দোলনার সব চাইতে বেশী নজর রাখবার জিনিষ হচ্ছে—ওর স্প্রীং। আরোহীর ভার ধরে রাখবার ক্ষমতা থাকা চাই 'ঐ স্প্রীং দুটির'। এজন্য ১০নং ⅜ ইঃ পাকানো (Cold-Coiled) পনর ইঞ্চি লম্বা মজবুত স্প্রীং ব্যবহার করা যেতে পারে। স্প্রীংদুটি খুব শক্ত না হলে ঘোড়া নীচের দিকে নামলে আর উপরের দিকে লাফিয়ে উঠবে না। আরোহীটি যখন ঘোড়ায় চড়বে তখন তার ভারে দোলনাটি নেমে আসবে, কিন্তু তার পরেই যখন সে নিজের ভারটা হাল্কা করে দু'হাত দিয়ে হাতল দুটি টেনে ধরে আসন থেকে একটু উঠবে, তখন ঘোড়াটিও ঐ টানের অনুপাতে উপরের দিকে উঠবে। প্রথম দিকে হাতল দুটিতে সামান্য টান দিলেই ঘোড়াটি দুলতে আরম্ভ করবে এবং একবার দুলতে আরম্ভ করলে সহজেই ওটা উঠা-নামা করবে।

তলার কাঠটিতে যে ছোট স্প্রীং (কমপ্রেশন স্প্রীং) লাগানো হবে ওটা যে কেবল ঘোড়াটি নীচের দিকে নামবার সময়কার আঘাত থেকেই বাঁচাবে তা নয়—ওটা দোলনাটিতে একটা সহজ গতিও এনে দেবে। (ছবি গ)

এই খেলনাটি তৈরী করবার সময় লক্ষ্য রাখতে হবে—যেন কাঠগুলি বেশ শক্ত হয় (সেগুন কাঠ হলেই ভালো) এবং তার ধারগুলি মেরে শিরিষ কাগজ দিয়ে ঘষে নেওয়াও দরকার।





গঙ্গবুড়ি

গোপাল ভৌমিক

গঙ্গবুড়ির নাম শুনেছ,
কেউ দেখেছো তোমরা ?
খোকাবাবু নাম শুনলেই
মুখটি করে গোম্‌রা ।

ভয়ে ভয়ে লুকোয় এসে
আমার বুকের কাছে,
বুঝিয়ে তাকে পারি নাকো—
মাথার কি ঠিক আছে ?

দুষ্টুমি সব ভুলে গিয়ে
লক্ষ্মী শিশুর মত
খোকন সোনা ঘুমিয়ে পড়ে
স্বপ্ন দেখে কত !

ক'রেই হেরেছেন। নইলে পাহাড়ী কামেশ্বরের জংলী বাহিনী কখনও গৌড়ের এত বড় সুশিক্ষিত ফৌজের কাছে দাঁড়াতে পারে? এখন ত প্রকাশ্যেই দুজনের মিতালী হয়েছে। ইস্‌মাইল লোকদেখানোভাবে কামতাপুরে দখল নিতে গেছেন। আসলে উনি জংলী সেনাদের শিখিয়ে পড়িয়ে নেবেন। তারপর দু' দল হঠাৎ গৌড়ে হানা দেবেন এবং আপনাকে মেরে ইস্‌মাইল গৌড়ের মস্‌নদে বসবেন এই ওঁর ইচ্ছা। ঠিক হয়েছে কামেশ্বরকে উনি আরও খানিকটা জমি ছেড়ে দেবেন, তার বদলে কামেশ্বর ওঁর হয়ে লড়বে।"

চিঠি পেয়ে রুকুন্‌উদ্দীন চোখে অন্ধকার দেখলেন। এতদিনের বিশ্বস্ত কর্মচারী তাঁর—কিন্তু সে কথা তাঁর মনেই এল না। একে ইস্‌মাইল তায় কামেশ্বর। 'একা রামে রক্ষা নাই সুগ্রীব দোসর!' মৃত্যু ত প্রায় শিয়রে এসে দাঁড়িয়েছে!

তিনি কিছুমাত্র অগ্র-পশ্চাৎ না ভেবেই ভয়ে দিশাহারা হয়ে একদল লোক পাঠালেন। নিজের বিশ্বাসী দেহরক্ষী সেনা। তাঁদের হাতে গেল ইস্‌মাইলের মৃত্যুদণ্ডাদেশ! বলে দিলেন—গোপনে গিয়ে ওরা কাজ সারে যেন—একবার ইস্‌মাইল গেলে সেনারা সহজেই বশে আসবে।

ওরা যখন গিয়ে পৌঁছল ইস্‌মাইল তখন বিশ্বস্ত বন্ধুদের ভেতরই রয়েছেন। গোপনে কাজ সারবার আগেই তারা ধরা পড়ে গেল—সুলতানের সই করা পরোয়ানাও বেরিয়ে পড়ল।

সবাই বললে—এমন মনিবের ওপর আর কোন কর্তব্য নেই। ওরা যা ভেবেছে তাই করা যাক।

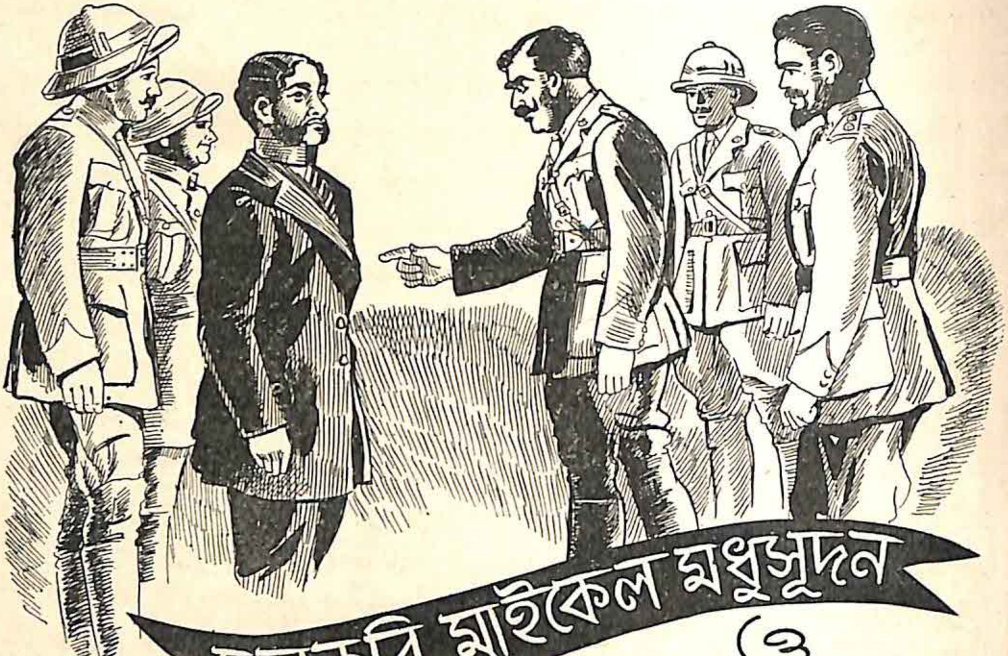
কেউ কেউ বললে, 'অন্ততঃ এ কটাকে ত এখানেই সাবাড় করা যাক্।'

ইস্‌মাইল বললেন, 'ছি! ওরা যা ভেবেছে তাই যদি করি ত ওদের সন্দেহটাই ত ঠিক হয়ে যাবে। লোকেও জানবে যে এই মতলবই আমার বরাবর ছিল।...তাছাড়া, তিনি আমার মনিব, আমার রাজা—তিনিই মালিক। তাঁর ইচ্ছার বিরুদ্ধে আমি যেতে পারি না। তাঁর ইচ্ছাই পূর্ণ হোক্।'

তিনি ডেকে পাঠালেন, তাঁরই সঙ্গে যে সরকারী জল্লাদ আছে—তাকে। তার হাতে নিজে তলোয়ার তুলে দিয়ে স্বেচ্ছায় হাসিমুখে গলা পেতে দিলেন। বল্লেন, 'সুলতানের আদেশ পালন করতে—তুমি আমি দুজনেই বাধ্য। আর দেরী করোনা। খুদা তোমাদের মঙ্গল করুন!'

এ হ'ল ১৪৭৪ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসের ঘটনা। যে রাজ্য হারাবার ভয়ে রুকুন্‌উদ্দীন এমন অন্যায় কাজ করলেন—এর মাত্র কয়েক মাস পরেই সেই রাজ্য ছেড়ে তাঁকে পরলোকে যাত্রা করতে হ'ল। ঐ বছরেরই মাঝামাঝি তাঁর জীবনাবসান হ'ল।

কে জানে পরলোকে দেখা হওয়া সম্ভব কি না এবং এই দুজনায় দেখা হয়েছিল কি না। তা যদি হয়ে থাকে এবং পৃথিবীর লজ্জা নামক বস্তু যদি সেখানেও থাকে ত রুকুন্‌উদ্দীন কি করেছিলেন—তাই ভাবছি!



মহাকবি মাইকেল মধুসূদন ও নানাসাহেব

বিমলচন্দ্র ঘোষ

—এক—

আজ থেকে প্রায় একশো বছর আগের কথা। ফ্রান্সের রাজধানী প্যারিসের রাজপথ দিয়ে একজন কৃষ্ণকায় ভারতীয় পথিক অত্যন্ত ভয়ে ভয়ে সন্তর্পণে পথ হাঁটছেন। শীতের রাত্রি। পেঁজাতুলোর মত চারিদিকে ঝির ঝির করে তুষার পড়ছে। পথিক বিষণ্ণমনে শীতের সেই হাড়কাঁপানো বাতাসের মধ্যে দিয়ে সীন নদীর ধারে এসে উপস্থিত হলেন। তারপর শীতের বাতাসকে উদ্দেশ ক'রে মহাকবি সেক্সপীয়রের ভাষায় অস্ফুটস্বরে আবৃত্তি করলেন ঃ

"Blow, blow thou winter wind
Thou art not so unkind
As man's ingratitude—!"

অর্থাৎ ঃ—

"বয়ে যাও তুমি শীত সমীরণ
জানি তুমি নও ততো নির্মম
মানুষের ক্রূর কৃতঘ্নতার চেয়ে—!"

দীর্ঘশ্বাস ফেলে পথিক সীন নদীর নৈশ অন্ধকারাচ্ছন্ন মন্থর জলরাশির দিকে তাকিয়ে রইলেন। তাঁর মনের মধ্যে তখন দুশ্চিন্তার ঝড় বইছিল। তাঁর পরণে ছিন্নমলিন ইউরোপীয় পরিচ্ছদ, গালের দু'পাশে

ফরাসী অভিজাতদের মত গালপাট্টা, মাথায় ঘনকুঞ্চিত কেশদামে চেরা সিঁথি, আয়ত বিশাল চক্ষুর্দ্বয়ে
প্রতিভাদীপ্ত বিষাদের ছায়া, বয়স প্রায় চল্লিশের কাছাকাছি। বিদেশে এসে পথিক ভয়াবহ আর্থিক
বিপজ্জালে জড়িত হয়ে পড়েছেন। স্বদেশে যে সব বন্ধুদের ওপর নির্ভর ক'রে তিনি এই সুদূর
ইউরোপে আসতে সাহসী হয়েছিলেন, তাঁরা শেষ পর্যন্ত তাঁর সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছেন। বার
বার চিঠি দিয়েও তিনি তাঁদের কাছ থেকে একটা উত্তর পর্যন্ত পাননি। এদিকে প্যারিসে বাড়ীভাড়া
দিতে পারেননি ব'লে বাড়ীওয়ালা আদালতে তাঁর নামে নালিশ ক'রে বাকী ভাড়া আদায়ের জন্য
গ্রেপ্তারী পরোয়ানা বের করেছে। স্বদেশ থেকে মাসিক নির্ধারিত টাকা না আসাতে পথিক এই
বিপন্ন অবস্থার মধ্যে ভয়ে ভয়ে দিন কাটাচ্ছেন। পাছে আদালতের লোকেরা পুলিশের সাহায্যে তাঁকে
গ্রেপ্তার করে। সেই ভয়ে দিনের আলোয় তিনি বেরুতে পারেন না। রাত্রির অন্ধকারে আত্মগোপন
ক'রে সাবধানে পথ চলেন।

তুষারঝটিকা বিক্ষুব্ধ সীন নদীর ধারে পথিক যখন বিমর্ষচিত্তে তাঁর বর্তমান সংকটজনক অবস্থার
কথা চিন্তা করছেন তখন তিনি লক্ষ্য করেন নি যে তাঁর সেই নির্জন অবস্থিতির কিছু দূরেই দু'জন পুলিশ
কর্মচারী তাঁর গতিবিধি তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে লক্ষ্য করছিল। এই দু'জন পুলিশ কর্মচারীর মধ্যে একজন ব্রিটিশ
পররাষ্ট্রদপ্তর কর্তৃক নিযুক্ত গুপ্তচর এবং অপরজন ফরাসী পুলিশের গুপ্তচর বিভাগের ইন্সপেক্টর।

এই দুজন পুলিশ কর্মচারী তখন ভারতীয় পথিকটির ওপর কড়া নজর রেখে পরস্পর নিম্নস্বরে
আলাপ করছিল। ফরাসী ইন্সপেক্টর ব্রিটিশ গুপ্তচরটিকে জিজ্ঞাসা করলেন ঃ

"ঐ ব্যক্তিই যে সিপাহী বিদ্রোহের নেতা নানা ধুন্দুপন্থ—এ কথা তুমি থানায় প্রমাণ করতে
পারবে তো ?"

ব্রিটিশ গুপ্তচরটি দৃঢ়তার সঙ্গে উত্তর দেয় ঃ

"নিশ্চয়ই! লণ্ডনের গুপ্তচর-বিভাগ গত ছ'মাস আগে থেকেই ঐ ব্যক্তির ওপর নজর রাখার
জন্য আমার ওপর ভার দিয়েছিল। আমি নিজের চোখে দেখেছি ঐ ব্যক্তি ভারতীয়দের সঙ্গে বিশেষ
ক'রে—যে সব ছাত্র ইংলণ্ডে ব্যারিষ্টারী পড়তে এসেছে তাদের সঙ্গে গোপনে দেখাসাক্ষাৎ করতো, আর
ভারতীয় ভাষায় রাজনৈতিক আলোচনা করতো।"

ফরাসী পুলিশ কর্মচারীটি দ্বিধান্বিত হ'য়ে বলে ঃ

"কিন্তু—তা'তে কোনো প্রমাণ হয় না যে এই ব্যক্তিই নানা ধুন্দুপন্থ!"

ব্রিটিশ গুপ্তচরটি উত্তেজিত হয়ে বলে ওঠে ঃ

"তার জন্য তোমার মাথা ঘামাতে হবে না। আগে তো ওকে গ্রেপ্তার ক'রে থানায় নিয়ে চল,
তারপর প্রমাণ করে দেব আমার কথা সত্যি কি মিথ্যে!"

এই কথার পর পুলিশ কর্মচারী দুজন সেই ভারতীয় ব্যক্তিটির কাছে গিয়ে দু'পাশ থেকে তাঁকে
ঘিরে দাঁড়িয়ে বলে ঃ

"মঁসিয়ে, আপনাকে একবার আমাদের সঙ্গে থানায় যেতে হবে।"

অতিকষ্টে মানসিক উত্তেজনা দমন করে পথিক জিজ্ঞাসা করেন ঃ

"আমার অপরাধ ?"

উত্তরে ফরাসী পুলিশ কর্মচারিটি বলে ঃ

"সে কথা থানায় গেলেই জানতে পারবেন। এখানে আমরা আপনার কোনো কথার উত্তর দিতে পারবো না।"

নিরুপায় পথিক তাদের সঙ্গে থানার দিকে অগ্রসর হন।

—দুই—

১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে ভারতবর্ষে "সিপাহী বিদ্রোহের" পর, বিদ্রোহের অধিনায়ক নানা ধুন্দুপন্থ অর্থাৎ নানা সাহেব ইংরাজ সরকারের হাতে ধরা পড়ার ভয়ে সম্পূর্ণ রহস্যজনক ভাবে আত্মগোপন করেন। ইংরাজ সরকারের গুপ্তচর-বিভাগ সুদীর্ঘ ছয় সাত বছর চারিদিকে অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে অনুসন্ধান ক'রেও নানা সাহেবকে ধরতে পারে নি। আমাদের এই কাহিনীর নায়ক পূর্ববর্ণিত ভারতীয় পথিককে যে সময়ে প্যারিসের সীন নদীর ধার থেকে নানা ধুন্দুপন্থ সন্দেহে ফরাসী পুলিশ গ্রেপ্তার করে থানায় নিয়ে যায়, তার ছয় মাস আগে ইংলণ্ডে ব্রিটিশ সরকারের পররাষ্ট্র বিভাগ ভারতীয় সরকারের কাছ থেকে সংবাদ পান যে নানা সাহেব নাকি ছদ্মবেশে ইউরোপে পালিয়ে এসেছেন। নানা সাহেব ভারতীয় ভাষা ছাড়া ইউরোপের কোনো ভাষা জানতেন না—এ কথাও ব্রিটিশ সরকার জানতেন। ফরাসী পুলিশের বড়কর্তাও নানা সাহেব সম্বন্ধে সমস্ত খবর ব্রিটিশ সরকারের মারফৎ জেনেছিলেন।

ফরাসী পুলিশ ইন্সপেক্টর ও ইংরাজ ডিটেক্‌টিভের সঙ্গে পথিক যখন প্যারিস্ পুলিশের প্রধান ঘাঁটিতে এলেন তখন ফরাসী পুলিশের বড়কর্তা সব কথা শুনে গম্ভীরকণ্ঠে পথিককে জিজ্ঞাসা করলেন ঃ

"তোমারই নাম নানা ধুন্দুপন্থ ?"

পথিক বিশুদ্ধ ফরাসী ভাষায় উত্তর দিলেন,—"না মঁসিয়ে, আমার নাম মাইকেল মধুসূদন দত্ত !"

একজন কৃষ্ণাঙ্গ ভারতীয়কে বিশুদ্ধ ফরাসী ভাষায় কথা বলতে শুনে বড়কর্তা প্রথমটা বিস্ময়ে স্তম্ভিত হয়ে পড়লেন। তিনি শুনেছিলেন নানা ধুন্দুপন্থ ইউরোপীয় কোনো ভাষাই জানেন না। তবুও তিনি বিস্ময় দমন করে ধমক দিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন ঃ

"মিথ্যে কথা বলার চেষ্টা কোরোনা। ব্রিটিশ সরকারের নিযুক্ত আমাদের এই ডিটেকটিভ বন্ধুটি তোমাকে নানা ধুন্দুপন্থ ব'লে সনাক্ত করেছেন। সত্যকথা বলো !"

দৃঢ়তার সঙ্গে শ্রীমধুসূদন জবাব দিলেন ঃ

“মিথ্যা কথা আমি বলি না।”

শ্রীমধুসূদনের কথা বলার বলিষ্ঠ ভঙ্গী দেখে আগের চেয়ে অপেক্ষাকৃত নরম গলায় বড়কর্তা প্রশ্ন করেন ঃ

“তুমি কি বলতে চাও—তুমি সিপাহীবিদ্রোহের সেই কুখ্যাত নেতা নানা ধুন্দুপন্থ নও?”

শ্রীমধুসূদন সগর্বে ও দৃপ্তকণ্ঠে উত্তর দেন ঃ

“না মঁসিয়ে, আমার পরম দুর্ভাগ্য—আমি ভারতীয় মুক্তি আন্দোলনের সেই মহান নেতা নানা সাহেব হবার সৌভাগ্য লাভ করিনি। আমি একজন হতভাগ্য বাঙালী কবি এই বন্ধু-বান্ধবশূন্য বিদেশে সপরিবারে এসে কঠিন দারিদ্র্যের সঙ্গে সংগ্রাম কচ্ছি।” ফরাসী পুলিশের বড়কর্তা চিন্তিতভাবে জিজ্ঞাসা করেন ঃ

“কিন্তু তাই যদি সত্য হয় তবে আমাদের গুপ্তচরবিভাগ লক্ষ্য করেছে যে তুমি দিনের আলোয় পথে বেরোও না, রাত্রির অন্ধকারে অত্যন্ত সন্দেহজনক ভাবে চলাফেরা করো,—এর কারণ কি?”

শ্রীমধুসূদন অত্যন্ত সংকোচের সঙ্গে দ্বিধাজড়িত কণ্ঠে বলেন ঃ

“সে বড় লজ্জার কথা মঁসিয়ে। কয়'মাস বাড়ী ভাড়া দিতে পারিনি ব'লে বাড়ীওয়ালা আদালতে নালিশ করে আমার নামে গ্রেপ্তারী পরোয়ানা (Body Warrant) বের করেছে। দিনের বেলায় তাই বেরুতে পারি না।”

পুলিশের বড়কর্তা বলেন ঃ

“তোমার কথা না হয় সত্য বলেই মানলুম, কিন্তু তুমি যে বাঙালী কবি মাইকেল মধুসূদন দত্ত তার প্রমাণ কি?”

বেশ কয়েক মুহূর্ত চিন্তা ক'রে শ্রীমধুসূদন উত্তর দিলেন ঃ

“এখানে আমার কোনো পরিচিত বন্ধুবান্ধব নেই, মঁসিয়ে! একমাত্র ইতালীর মহামান্য রাজা ইমানুয়েল আমাকে চেনেন!”

বড়কর্তা মধুসূদনের কথায় সবিস্ময়ে চমকে উঠে জিজ্ঞাসা করেন ঃ

“আপনি কি বলতে চাইছেন মঁসিয়ে?—ইতালীর মহামান্য অধিপতি আপনাকে চেনেন? তাঁর মত মহান্ ব্যক্তির সঙ্গে আপনার কি ক'রে পরিচয় হ'ল জানতে পারি কি?”

শ্রীমধুসূদন তৎক্ষণাৎ উত্তর দিলেন ঃ

“নিশ্চয় জানতে পারেন! ইতালীদেশের মহাকবি দান্তের নাম আপনি আশা করি জানেন। এই মহাকবির ত্রিশত বার্ষিক জন্মদিনে মুল ল্যাটিন ভাষায় একটি 'সনেট রচনা' করে আমি সেই বিশ্ববরেণ্য মহাকবির উদ্দেশে শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করি। আমার কবিতাটি একখানি ইতালীয় পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। আমার কবিতাটি পাঠ করে ইতালীর রাজা ইমানুয়েল মুগ্ধ হয়ে আমাকে একখানি মানপত্র দেন। সে উপলক্ষ্যেই তাঁর সঙ্গে আমার পরিচয় হয়।”

তখনো শ্রীমধুস্থদনের কথায় প্যারিস-পুলিশের বড়কর্তা সম্পূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন করতে পারেন নি। তিনি জিজ্ঞাসা করেন ঃ

"সে মানপত্র আপনি আমাদের দেখাতে পারেন ?"

শ্রীমধুস্থদন বলেন ঃ

"নিশ্চয়ই দেখাতে পারি, তবে এখন আমার কাছে নেই, আমার প্যারিসের বাসায় আছে। আমি একখানি চিঠি আমার পত্নী হেনরিয়েটাকে লিখে দিচ্ছি, আপনি অনুগ্রহ ক'রে যদি একজন কনস্টেবল পাঠিয়ে দেন—তাহ'লে এখনি সে মানপত্র দেখতে পাবেন।"

বড়কর্তার নির্দেশে একজন কনস্টেবল মানপত্রটি নিয়ে আসে। প্রত্যক্ষ প্রমাণ পেয়ে ফরাসী পুলিশের বড়কর্তা মাইকেলের কাছে বিনীতভাবে ক্ষমা প্রার্থনা ক'রে তাঁকে সসম্মানে মুক্তি দেন। পরাজয়ের অপমানে ও লজ্জায় ব্রিটিশ গুপ্তচরটির মুখ কালী হয়ে যায়। মানপত্রে রাজা ইমানুয়েল শ্রীমধুস্থদনকে বলেছিলেন—

"প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের দুই বিপরীতধর্মী সংস্কৃতির ক্ষেত্রে তুমি মিলনের সেতু-স্বরূপ, তোমাকে নমস্কার ?"



১ ২ ৩

১। "মুখখানা তোর শুক্‌নো কেন কাঠবেরালি ?
কেউ কি মার, কেউ কি দিল গালাগালি ?"
—"না না ওসব নয়কো ব্যাপার মোরগ ভাই,
ঢাকের বাহার হল না মন হলো যে খারাপ তাই।"

২। এর জন্যে এত কিসের ভাবনা ভাই
বাজনা সাজা দিচ্ছি গোটা পুচ্ছটাই।"

৩। "জয়জয়কার হোক্ না তোমার মোরগ ভাই,
পাড়ায় পাড়ায় তোমার এবার ঢাক পেটাই।"

নারিকেলের ছোবড়া



নীহাররঞ্জন গুপ্ত

এক আধ বৎসর নয়, দীর্ঘ কুড়ি বৎসর পরে বিষ্টু সান্যাল দেশে ফিরে এলেন।

সন্ধ্যা হয়ে এসেচে, খেলার শেষে মাঠের মধ্যে তখনও দশ বারো জনে মিলে বসে জটলা পাকাচ্ছি, এমন সময় হুম্ হুম্ পালকী বাহকদের মিলিত কণ্ঠস্বরের সুরেলা ঐক্যতান শুনে সকলে ফিরে তাকালাম। সন্ধ্যার আবছা অন্ধকারে চার কাহার বাহিত একটা পাল্কী গ্রামের দিকে চলেছে।

মাঠের পাশ দিয়েই যে বড় সড়কটা প্রায় দুই ক্রোশ দূরবর্তী রেলওয়ে ষ্টেশন থেকে বরাবর গ্রামে চলে এসেছে, সেই সড়ক ধরেই পালকীটা আসছিল।

সকলেরই কৌতূহল হলো তাই একটু এগিয়ে গেলাম। আমাদের গ্রামে আসতে হলে স্থলপথে ও নদীপথে দু'রকমেই আসা যায়। স্থলপথে ট্রেনে আসতে হলে দুই ক্রোশ পথ ষ্টেশন থেকে উজিয়ে আসতে হয় বলে সকলেই জলপথে যাতায়াত করেন। কারণ গাঁয়েই ষ্টীমার ঘাট। দীর্ঘপথ হেঁটে গ্রামে পৌঁছাতে হয়। পালকীতে করে আসতে হলে ৮।১০ টাকা খরচ পড়ে বলে সাধারণতঃ কেউই বড় একটা ট্রেনের রাস্তায় আসে না। ক্বচিৎ কালেভদ্রে মাত্র এক আধজন পালকীতে আসে। অবিশ্যি জমিদার বাড়ির লোকেরই হচ্ছে সেই কচিৎ দু একজন। সকলে দল বেঁধে এগিয়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গেই পালকীর ভিতরের আরোহীর কণ্ঠস্বর শোনা গেল ঃ ওরে দাঁড়া, থাম।

সকলে পালকীর সামনে আরো একটু এগিয়ে যেতে আরোহী প্রশ্ন করলেন, শীতল সান্যালের বাড়িটা কোথায় বলতে পারো ?

দলের মধ্যে ছিল সর্বব্যাপারে আগ-বাড়ানী রবীন। সেই বললে, শীতল সান্যাল ত মরে কবে ভূত হয়ে গিয়েছে।

তিনি মারা গেছেন ?

হাঁ, কবে—

তবে তার বাড়িতে এখন কে থাকে জানো ?

সে বাড়িতে আর কে থাকবে ! তিন কুলে ত বুড়োর শুনেচি থাকবার মধ্যে ছিল এক নাতি ! তা সেও ত এক যুগ, তার কোন পাত্তাই কেউ জানে না।

ও, তা তার বাড়িটা আছে ত !

সে আর থাকা কি ! এখন পোড়ো বাড়ি। তার একটা ঘরে বছর দুই হলো যজ্ঞি বুড়ি থাকে।

ভদ্রলোক অতঃপর কিছুক্ষণ কি যেন ভাবলেন। তারপর বললেন, কোন্ দিকে সে বাড়িটা বলতে পারো।

যান না, খানিকটা এগিয়ে গেলেই পঞ্চাননতলা পাবেন, আরো একটু এগিয়ে মধু বৈরাগীর ভিটে—তারই পরে ডাইনে সেই বাড়ি।

হুম্ হুম্ শব্দ করতে করতে বাহকেরা পাল্কী তুলে নিয়ে সামনের দিকে ধূসর অন্ধকারের মধ্যে মিলিয়ে গেল।

ছেলেরা পরস্পর মুখ চাওয়া-চাওয়ি করে ব্যাপারটা একপ্রকার ভুলেই গেল।

দিন দুই পরে শোনা গেল গ্রামের যুবকের দল সব বন্ধু-বান্ধবদের মধ্যে বলাবলি করছে দীর্ঘ কুড়ি বছর পরে নাকি শীতল সান্যালের নাতি নিরুদ্দিষ্ট বিষ্টু সান্যাল ফিরে এসেছে হঠাৎ গাঁয়ে।

বছর ত্রিশ বয়েসের সময় লোকটা হঠাৎ একদিন নিরুদ্দেশ হয়ে যায়। তারপর এযাবৎকাল লোকটার কোন পাত্তাই ছিল না। হঠাৎ এতকাল পরে আবার সে ফিরে এসেছে। বিষ্টু সান্যালের বয়স প্রায় পঞ্চাশের কাছাকাছি। লেখাপড়া গ্রামের স্কুলের চতুর্থ শ্রেণী পর্যন্ত। চতুর্থ শ্রেণীতে বার চারেক ডিগবাজী খেয়ে তারপর একদিন প্রহারোদ্যত হেডপণ্ডিত মশাইয়ের হাতের বেতটা কেড়ে নিয়ে, বেতটাকে ভেঙ্গে টুক্‌রো টুক্‌রো করে ফেলে দিয়ে স্কুল ঘরের জানলা টপকিয়ে সেই যে সে পয়াকার দিয়েছিল আর সে ও মুখো হয়নি। তারপর যতদিন গ্রামে ছিল গুণ্ডামী আর যত প্রকারের কুকীর্তি করে এমন স্বনামধন্য হয়ে উঠেছিল যে, গাঁয়ের সবাই বিষ্টু সান্যালের নামে কাঁপত, বিষ্টু সান্যালের মা বাপ আগেই মারা গিয়েছিল, ত্রিসংসারে ছিল তার একমাত্র বৃদ্ধ পিতামহ শীতল সান্যাল মশাই।

গাঁয়ের লোকেরা বলাবলি করত বুড়ো, হাড় কেপ্পন শীতল সান্যাল দীর্ঘকাল ধরে কমিসরিয়টে

চাকরি করে নাকি অনেক টাকা জমিয়েছিল। সে সব টাকাকড়ি সে তার ভিটেয় মাটির নীচে কোথায় নাকি পুঁতে রেখে দিয়েছিল। প্রাণান্তে সে একটি পয়সা খরচ করত না। এ নিয়ে নাতির সঙ্গে বুড়োর ঝগড়া প্রায় বেধেই থাকত। এবং শেষ পর্যন্ত নাকি ঐ টাকা পয়সার ব্যাপার নিয়েই পিতামহ ও নাতিতে ঝগড়া হয়ে বিষ্টু সান্যাল একরাত্রে গৃহ ত্যাগ করে।

বুড়ো শীতল সান্যালের অর্থ ও কঞ্জুস অপবাদ থাকলেও লোকটা ছিল যেমন আমুদে তেমনি রসিক। শেষ দশ বৎসরের জীবনে নাতি বিষ্টুচরণ নিরুদ্দিষ্ট হবার পর যে লোকটা বেঁচেছিল তার মধ্যে বিশেষ করে শেষের পাঁচ বৎসর লোকটার মাথায় গোলমাল দেখা দেয়। বয়স তখন তাঁর পঁচাত্তরের উপরে হলেও বলতে গেলে সোজা হয়েই হাঁটত। চাকরির আমলের একটা চাপকান গায়ে দিয়ে, মাথায় পাগড়ি এঁটে, হাতে একটা বেতের লাঠি নিয়ে পাড়ায় পাড়ায় ঘুরে ঘুরে বেড়াত আর পথে কারো সঙ্গে দেখা হলেই হাত পেতে বলত, দুটো পয়সা দেবে! বড্ড ক্ষিধে পেয়েছে।

কেউ হয়ত দিত, কেউ মুখ ফিরিয়ে চলে যেত।

কখন কখন দেখা যেত গাঁয়ের বাজারের দোকানে বসে দুই পয়সার মুড়ি আর বাতাসা কিনে বসে বসে চিবুচ্ছে।

সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত শীতল সান্যালকে বেশীর ভাগ সময় গ্রামের পথে পথেই ঘুরে বেড়াতে দেখা যেত সেই বিচিত্র সাজে।

তারপর হঠাৎ একদিন দেখা গেল সেই বিচিত্র সাজেই বৃদ্ধ শীতল সান্যাল তার বাড়ির দাওয়ায় মরে পড়ে আছেন।

গাঁয়ের মাতব্বর যারা তারাই শীতল সান্যালের মৃত্যুর পর তার শয়নঘরে প্রবেশ করে দেখলেন, ঘরের মধ্যে গোটা তিনেক ষ্টীলের ট্রাঙ্ক ও একটা কাঠের বড় সিন্দুক পড়ে আছে। ষ্টীলের ট্রাঙ্ক ও কাঠের সিন্দুক হাতড়ে কিছুই পাওয়া গেল না তেমন উল্লেখযোগ্য, একমাত্র কতকগুলো জামা কাপড়, চিঠিপত্র ও নগদ সিকি দুআনি আনিতে গোটা পনের কুড়ি টাকা ছাড়া।

শীতল সান্যাল সম্পর্কে যে এত কথা শোনা যেত, লোকটা টাকার আণ্ডিল, যখের মত সেই ধন সে আগলে বেড়ায়, বোঝা গেল সব মিথ্যে, ভুঁয়ো—গল্পকথা মাত্র।

পাড়ার লোকেরাই শেষ পর্যন্ত মৃতদেহের সৎকার ইত্যাদি করে।

এবং তারপর থেকে ক্রমে ক্রমে এই গত পাঁচ বৎসরে শীতল সান্যালের কথা ভুলেই গিয়েছিল সকলে।

—দুই—

পাঁচ বৎসর পরে হঠাৎ আবার শীতল সান্যালকে গ্রামের সকলের মনে পড়ল তাঁর একমাত্র নিরুদ্দিষ্ট নাতি বিষ্টু সান্যালের প্রত্যাবর্তনের ব্যাপারটাকে কেন্দ্র করে।

দীর্ঘ কুড়ি বৎসর পরে বিষ্টু সান্যালের প্রত্যাবর্তন বা আবির্ভাবটা গাঁয়ের মধ্যে যে একটা আলোড়ন তুলেছিল তারও কারণ একমাত্র বিষ্টু সান্যালের প্রত্যাবর্তনই নয় এতকাল পরে, তার কথাবার্তা, চালচলন, ভাবভঙ্গি, পোষাকপরিচ্ছদ সব কিছুর মধ্যে একটা মিষ্ট্রি বা রহস্যের রং যেন লেগেছিল।

গ্রামের প্রবীণতম ব্যক্তি হরলাল মুখুজ্যে যখন জিজ্ঞাসা করলেন, তারপর বিষ্টুচরণ, এতকাল কোথায় ছিলে ?

মৃদু হেসে বিষ্টু জবাব দেয়, এক জায়গায় ত ঠিক হয়ে ছিলাম না ঠাকুদ্দা। পেশোয়ার থেকে কাবুল, ত্রিচিনাপল্লী থেকে তাঞ্জোর, পেনাং থেকে সিংগাপুর, মালয় থেকে সাংহাই, আমেরিকা থেকে আফ্রিকা, লণ্ডন থেকে রোম, জাপান থেকে রাশিয়া সর্বত্র ঘুরে বেড়িয়েছি।

বল কি বিষ্টুচরণ! তা ওসব জায়গায় ঘুরেই বেড়াতে বুঝি।

শুধু শুধু কি আর ঘুরে বেড়িয়েছি। বিজনেসের ব্যাপারেই ঘুরতে হতো আর কি!

বিজনেস্! কিসের ব্যবসা হে!

ব্যবসা ত একটা আধটা নয় ঠাকুর্দ্দা, পার্লস—মুক্তো, রাবার, লেদার—চামড়া, জুয়েলস্, আইভরি ইউরেনিয়াম—কত কি!

বল কি! তা রোজগার-পাতি ভালই করেছো বলো!

তা আপনাদের আশীর্ব্বাদে দু তিন লাখ টাকার বিজনেস্ ত ছিলই!

দু তিন লাখ! হরলাল মুখুজ্যে হাঁ হয়ে গেলেন।

ষোল সতের বছর ধরে খেটেই মরলাম ঠাকুদ্দা। টাকা রোজগারও করলাম কিন্তু তাতে করে আমার এ দুর্ভাগা দেশের আর কতটুকু উপকার করলাম। বয়েসও হলো, আর কয়দিনই বা, তাই চলে এলাম গাঁয়ে। ভেবেছি বাকী জীবনটা এখানেই বসে যাহোক কিছু করবো।

বেশ! বেশ! দীর্ঘজীবী হও বাবা! তা কি ব্যবসা করবে ঠিক করলে?

ছোবড়ার!

ছোবড়ার! আবার হাঁ হয়ে গেলেন হরলাল মুখুজ্যে।

হাঁ! নারিকেলের ছোবড়ার। সাংহাইতে আমার এক বন্ধু একটা কাপড়ের কল বসিয়েছে। সেখানে আমরা আবিষ্কার করেচি রেশমের চাইতেও উৎকৃষ্টতর একপ্রকার সুতো তৈরী করা যেতে পারে নারিকেলের ছোবড়ার ফাইবার থেকে। সে সুতোর তৈরী কাপড় যে শুধু সিল্ককেই হার মানাবে তাই নয় যেমন হবে টেকসই তেমনি হবে দামেও সস্তা। কোকোনাট্ সিল্ক্ দিয়ে সমস্ত সিল্কের বাজার আমরা ক্যাপচার করবো।

এবারে আর শব্দও বের হয় না হরলাল মুখুজ্যের কণ্ঠ থেকে। স্রেফ্ হাঁ হয়েই থাকেন তিনি।

আমাদের গ্রামে প্রচুর নারকেল গাছ আছে জানেন ত! যত নারকেল গাছ আছে ইজারা নিয়ে—সব ছোবড়া চালান দেবো এখান থেকে সোজা সাংহাইয়ে!—

কোকোনাট্ সিল্কের আশ্চর্য রম্য কাহিনী এ মুখ হতে ও মুখ, এ কান হতে ও কান হয়ে হয়ে সমস্ত গ্রামময় রটে যেতে সাত দিনও লাগে না।

বৃদ্ধের দল সব বলাবলি শুরু করে নিজেদের মধ্যে, হাঁ—করিৎকর্মা ছেলে বটে শীতল সান্যালের নাতি আমাদের বিষ্টুচরণ! আহা বেঁচে থাক! এইত ছেলে।

শুধু কোকোনাট্ সিল্কের অত্যাশ্চর্য কাহিনীই নয়, সেই সঙ্গে আরো দুটি লোভজনক কথা রটে। একটি হচ্ছে, গ্রামের লোকদের জন্য বিষ্টুচরণ ১০৲, ২০৲ ও ৩০৲ টাকার কোম্পানীর শেয়ার অনেকগুলো নিয়ে এসেচে। যে শেয়ারে সামনের বছর থেকেই ডিভিডেণ্ড ১০০৲-১৫০৲ পর্যন্ত পাওয়া যাবে। এবং দ্বিতীয় হচ্ছে প্রতি নারিকেল গাছ পিছু এক বছরের জন্য ফল হিসাবে বিষ্টুচরণ ১০৲-১২৲ টাকা নগদ দিয়ে জমাত নেবে। বর্তমানে যেখানে যত গাছে যত নারকল আছে সব নগদ দাম দিয়ে কিনেও নেবে।

গ্রামে এমন গৃহস্থ খুব কমই আছে যার বাড়িতে দুই তিন এবং কোন কোন গৃহে পাঁচ সাতটি নারিকেল গাছ নেই।

এর পর থেকেই শুরু হলো প্রকাশ্যে বিষ্টুচরণের ব্যবসা-সম্পর্কে যতপ্রকারের বিরুদ্ধ সমালোচনা আর গোপনে গোপনে তার গৃহে যাতায়াত।

বিষ্টুচরণ আছো নাকি হে!

কে কাকা! আসুন—

একটা কাজে এসেছিলাম হে! গোপাল চাটুয্যে বলেন।

বিষ্টুচরণ মনে মনে হাসে কারণ সমালোচকদের মধ্যে বিশ্বনিন্দুক গোপাল চাটুয্যে ছিলেন শীর্ষস্থানীয়।

কি বলুন ত কাকা!

বলছিলাম ঐ যে তোমার কি সব ব্যবসা—ছোবড়া টোবড়ার—

ও কোকোনাট সিল্কের কথা বলছেন!

হাঁ—হাঁ—তা বলছিলাম কি তোমার সেই ব্যবসার কিছু শেয়ার—মানে আমি নয়, তোমার খুড়িমা বড্ড পিড়াপীড়ি করছেন।

তা বেশত। কিন্তু শেয়ার ত প্রায় সবই বিক্রি হয়ে গিয়েছে।

সব বিক্রি হয়ে গিয়েছে!

সেই রকমই প্রায়—সামান্য দু দশটা পড়ে আছে মাত্র।

বল কি বিষ্টুচরণ! এত শেয়ার কিনলে কে?

মৃদু হেসে বিষ্টু বলে, আপনি ত অনেক পরে এলেন কাকা! গোপনে গোপনে গ্রামের ষোল আনা লোকই ইতিমধ্যে এসে শেয়ার কিনে নিয়ে গিয়েছে।

সত্যি!

সত্যি না কি মিথ্যে! আসুন না ঘরে, লিষ্ট পড়ে শোনাচ্ছি আপনাকে। কিন্তু কথাটা যেন রাষ্ট্র করে দেবেন না, কেউই তাদের নাম প্রকাশ করতে চান না কিনা!

বিষ্টুচরণ ঘরে ঢুকে একটা লম্বা কাগজ বের করে একের পর এক নাম পড়ে যেতে লাগল। কেউ বাদ যায়নি প্রায় দেখা গেল।

থাক্ বাবা থাক। আর পড়তে হবে না। আমার ২০৲ টাকার দশটা শেয়ার চাই!

দশটা ত নেই কাকা।

তা বললে চলবে না বাবা। দশটা আমাকে যেমন করে হোক করে দিতেই হবে।

কিন্তু কাকা—

না বাবা, কোন কিন্তু নয়, তুমি ত আমার পর নও! শীতল ছিল আমার সাক্ষাৎ মাসতুত ভাইয়ের পিসতুত শালা!…একেবারে আপনার জন তুমি আমার—

শেষ পর্যন্ত নগদ কড়কড়ে দুইশতটি টাকা গুণে দিয়ে দশখানি ছাপান কাগজ নিয়ে গোপাল চাটুয্যে ফিরে গেলেন।

এবং তারপর শুধু গোপাল চাটুয্যেই নয় গ্রামের ষোল আনা লোকই যার যেমন সঙ্গতি গোপনে গোপনে এসে শেয়ার কিনে নিয়ে গেলেন।

এবং কুড়ি দিনের মধ্যেই দেখা গেলা বিষ্টুচরণ প্রায় হাজার শেয়ার বিক্রি করে ফেলেছে।

তারপর একদিন বিষ্টুচরণ গ্রামে যেখানে যত নারিকেল গাছ ছিল তাদের মালিকদের বললে সব নারিকেল পেড়ে ফেলতে। নগদ দাম দিয়ে—নারিকেল পিছু আট আনা, সব নারিকেল সে কিনে নেবে। এবং প্রত্যেককে সে কিছু কিছু আগামও দিয়ে দিল।

গ্রামের সব বাড়িতে বাড়িতে নারিকেল পাড়ার ধুম পড়ে গেল।

ঘরে ঘরে নারিকেল বোঝাই হয়ে উঠ্‌লো।

এবং সারাটা রাত ধরে যে যার নারিকেল দশবার করে গুণে হিসাব করতে লাগল আট আনা করে প্রতিটি নারিকেল হলে কত মোট মুনাফা হবে।

সেদিন ভোরবেলা থেকে বাড়িতে বাড়িতে ঘুরে বিষ্টুর নারিকেল কেনা হবে শুরু; আগের রাত জেগে সব প্রহর গুণতে লাগল।

তারপর ভোর হলো, দীর্ঘ প্রতীক্ষার অবসান হলো।

ক্রমে ক্রমে বেলা বাড়তে লাগল কিন্তু বিষ্টুচরণের দেখা নেই। অধৈর্য হয়ে তখন একজন

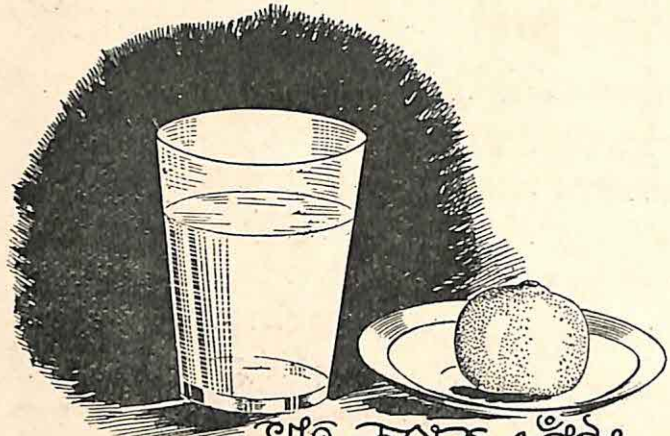
দু'জন করে বিষ্টুর ঘরের দিকে এগুতে লাগল। বিষ্টুর গৃহের সামনে এসে সকলে দেখলে, কোথায় বিষ্টুচরণ! দরজায় এক বিরাট তালা ঝুলছে।

ব্যাপার কি? প্রত্যেকে পরস্পরের মুখ চাওয়া-চাওয়ি করে। দেখতে দেখতে গ্রামের ষোল আনা লোকই সেখানে এসে ভিড় করে। এতদিন পরে দিনের আলোয় পরস্পর পরস্পরকে দেখতে পেয়ে সকলেই বোঝে তাদের প্রত্যেকের ব্যাপারটা প্রত্যেকের কাছে গোপন থাকলেও শ্রীমান্ বিষ্টুচরণ গোপনতার কিছুই গোপন করে রেখে যায়নি।



এবং জানতে কারোই আর বাকী থাকে না সকলের কাছে শেয়ার বিক্রি করে প্রত্যেকের কাঁধেই বিষ্টুচরণ নারিকেলের বোঝা চাপিয়ে দিয়ে রাতারাতি আবার নিরুদ্দেশ হয়েছে। যা হোক কিল খেয়ে কিল হজম করা ছাড়া যখন দ্বিতীয় আর কোন পথ নেই তখন সকলকেই বাড়ি ফিরে আসতে হলো এবং প্রত্যেকেরই গৃহে পা দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ঘরের মধ্যে সযত্নে স্তূপীকৃত নারিকেলগুলোর দিকে তাকিয়ে নতুন করে শোক উথলে উঠ লো।

সকলেই বুঝল বিষ্টুচরণ তাদের কোকোনাট সিল্ক্ নয়—কোকোনাটের ছোবড়াই দিয়ে গিয়েছে। এবং শীতল সান্যালের যে, সঞ্চিত ধনরাশি এতকাল তাদের কাছেই গচ্ছিত ছিল, সেটা তারা যোগ্য পাত্রের হাতেই তুলে দিয়েছে।



মাত্র কয়েক ফোঁটা লেবুর রস

নিখিল সেন

বিয়াল্লিশের আগষ্ট আন্দোলন সুরু হয়ে গেছে। ভারতের এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্তে ধ্বনিত হচ্ছে 'ভারত ছোড়'। দেশের নেতারা সব কারাগারে বন্দী। মহাত্মা গান্ধীকেও আটক রাখা হয়েছিল পুণায় আগা খাঁ প্রাসাদে। দেশজোড়া হাহাকার ঃ জাপানী বোমা, বাঙ্গলার মন্বন্তর, কালোবাজার—দেশজোড়া হতাশার সুর। জেলে গিয়েও মহাত্মা চোখ বুঁজে নিশ্চিন্ত থাকতে পারলেন না। তিনি অনশনের সংকল্প জানালেন। একদিন নয়, দুদিন নয়—পুরো একুশদিন—না-খেয়ে থাকা! এ চারটিখানি কথা নয়। কিন্তু গান্ধীজিকে ঠেকান গেল না কিছুতেই। অনশন তিনি করবেনই। ভারত সরকারকে তিনি তাই লিখে জানিয়ে দিলেন।

ভারত সরকার উত্তরে জানালেন, গান্ধীজি তাঁর ব্যক্তিগত চিকিৎসক নিয়োগ করতে চান কিনা! গান্ধীজি তখন ডাক্তার বিধান রায়, ডাক্তার গিলডার ও ডাক্তার সুশীলা নায়ারের নাম করলেন। আর সরকার পক্ষ থেকে নিযুক্ত হলেন বোম্বাই সরকারের সার্জেন-জেনারেল কাণ্ডি, কর্ণেল শ ও কর্ণেল ভাণ্ডারি।

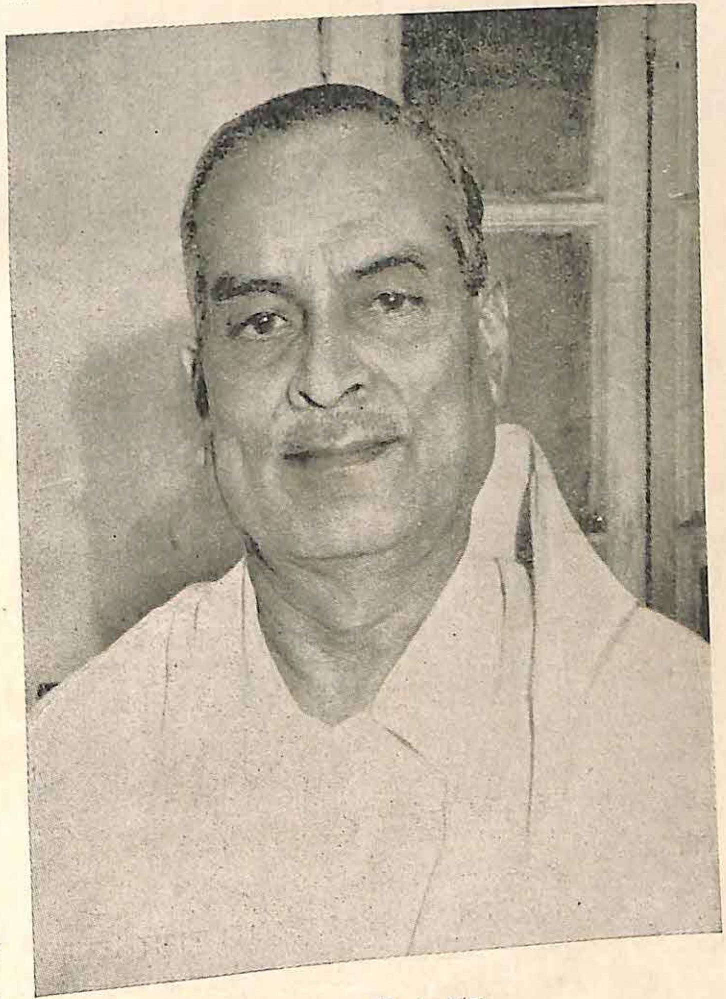
গান্ধীজি অনশন সুরু করলেন। প্রথম দিন কয়েক অবশ্য মন্দ কাটলো না। দিন যত যেতে লাগলো গান্ধীজির অবস্থা তত খারাপ হতে থাকল। তিনি অধিকতর ক্ষীণ ও দুর্ব্বল হয়ে পড়লেন। রাত্রে ঘুম একরূপ নেই। তেরো দিনের দিন খুব বাড়াবাড়ি হল, গান্ধীজি বমি করতে সুরু করলেন। অস্বস্তি তাঁর বেড়ে গেল। যা কিছু পেটে পড়ে সবটাই বেরিয়ে আসতে লাগল। সংকট মুহূর্ত ঘনিয়ে এল। কতৃপক্ষের জাদরেল সব চিকিৎসকেরা দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়ে পড়লেন। কি করবেন ঠিক করে উঠতে পারলেন না।

বেলা তখন প্রায় আড়াইটা। জেনারেল কাণ্ডি হন্তদন্ত হয়ে ডাঃ রায়ের কাছে ছুটে এলেন। বললেন ঃ

'ডাঃ রায়, গান্ধীজির অবস্থা এখন ত খুব সুবিধার দেখছি না। অনশন তাঁর ভাঙ্গা দরকার। গ্ল্কোজ তিনি যদি খেতে না চান, আমি ঠিক করেছি ইনজেকসান্ করব।'

'আমি যখন পুনায় আসি', ডাঃ বিধান রায় তাঁকে জানালেন: 'তখন গান্ধীজি আমাকে দিয়ে 'হলপ' করিয়ে নিয়েছিলেন যেন আমরা তাঁকে জোর করে গ্লুকোজ খাওয়াবার কোন চেষ্টাই না করি। কিম্বা কোন ইনজেকসানও যেন না দেই। মহাত্মাজি ইনজেকসানের পক্ষপাতী মোটেই নন্। ধাতেও তাঁর সয় না।'

ডাঃ রায় বাঁকা একটু হেসে আবার বললেন: 'অবশ্য তিনি এখন আটক বন্দী, ভারত সরকারের মর্জির উপর তাঁকে এখন নির্ভর করতে হয়। আপনারা যদি জোর করে ইনজেকসান দিতে চান, তা আর আটকাবে কে?'



ডাক্তার বিধান রায়

সরকারী মেডিকেল বোর্ডের সভ্যরা পরস্পর পরস্পরের মুখ চাওয়া-চাওয়ি করতে লাগলেন। গান্ধীজির জীবন বাঁচাতে হলে গ্লুকোজ তাঁকে দিতেই হবে। এ ছাড়া আর কিছু যে তাদের ডাক্তারী কেতাবে লেখা নেই। ইনজেকসান না করে উপায়?

ডাঃ বিধানচন্দ্র একবার তাঁদের মুখের উপর চোখ দুটি বুলিয়ে নিলেন। পরে মাথা নেড়ে বললেন: 'এই অবস্থায় গান্ধীজিকে গ্লুকোজ ইনজেকসান করলে তাঁর মানসিক প্রতিক্রিয়া দেখা দেবে। আর তাতে যদি খারাপ কিছু ঘটে তার জন্য আমি দায়ী থাকব না। বিশ্বময় তখন আমি জানিয়ে দেব, গ্লুকোজ ইনজেকসান করে আপনারা তাকে মেরেছেন।'

সরকারী চিকিৎসকমণ্ডলী ঘাবড়ে গেল। গান্ধীজির জীবন নিয়ে এমনি ধারা ছিনিমিনি খেলতে

তাঁরা সাহস পেলেন না। জেনারেল কাণ্ডি গান্ধীজির ঘরে আবার ছুটে গেলেন। শেষবারের মত তাঁকে আবার অনুরোধ জানালেন। অনেক অনুনয় বিনয় করলেন অনশন ভাঙতে। একটু গ্লুকোজ খেতে। গান্ধীজি কিন্তু আপন সংকল্পে অটল। কিছুতেই না, গ্লুকোজ তিনি খাবেন না। ইন্‌জেকসানও তিনি নেবেন না। অগত্যা করেন কি। ঘর থেকে তিনি বেরিয়ে এলেন রুমাল দিয়ে চোখ মুছতে মুছতে।

গান্ধীজির অবস্থা সম্পর্কে অপরাহ্নে এক সরকারী বুলেটিন বার হল ঃ গান্ধীজির অবস্থা অত্যন্ত আশংকাজনক। ইতিমধ্যে যদি আশ্চর্যজনক কিছু পরিবর্তন না ঘটে, তা হলে কয়েক ঘণ্টার মধ্যে তা উদ্বেগে দাঁড়াবে।

সরকারী ইস্তাহার দেখে বিধানচন্দ্র গান্ধীজির শয্যাপার্শ্বে ছুটে গেলেন। একটু কমলার রস খেতে অনুরোধ জানালেন। বললেন ঃ এতে তাঁর অনশন ভঙ্গ হবে না। তবে পেটটা ঠাণ্ডা থাকবে। ডাঃ বিধান রায় তাঁকে আরও বুঝিয়ে বললেন ; 'অনশনের সময় লেবুর রস কিংবা জল খাবেন বলে তিনি ত বলেছিলেন। তবে এখন একটু কমলা লেবুর রস খেতে তিনি আপত্তি করছেন কেন ?'

গান্ধীজি স্তিমিত চোখ মেলে বিধানচন্দ্রের দিকে একবার তাকালেন। মৃদু একটু হাসলেন। তারপর শীর্ণ হাতখানি বাড়ালেন কাচের গ্লাসটীর দিকে।

কয়েক ফোঁটা লেবুর রস কিন্তু তাজ্জব ঘটালো। কমলার রসটুকু পেটে যেতেই গান্ধীজির বমি বমি ভাব থেমে গেল। তিনি খানিকটা জলও খেলেন। সন্ধ্যার দিকে প্রস্রাব করলেন বারো ঘণ্টার পর।

ডাঃ রায় আগা খাঁ প্রাসাদ থেকে বেরিয়ে এলেন। রাত তখন প্রায় ৯টা। গম্ভীর মুখখানিতে তাঁর হাসির রেখা। এ নিয়ে তিনি আর খুব একটা বলাবলি করলেন না। এদিকে কিন্তু বাইরে মহা হৈ—চৈ পড়ে গেল। সরকারী ইস্তাহার পাঠ করে বিশ্বময় রটে গেল ঃ মহাত্মা গান্ধীর অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয়। তাঁকে আর বাঁচান গেল না। রাতটুকু আর কাটবে কিনা সন্দেহ ! দিল্লীতেও এই সংবাদ ছড়িয়ে পড়ল। প্রতিক্রিয়া দেখা দিল সর্বত্র। ভাইসরয়ের পরিষদের কয়েকজন জাতীয়তাবাদী নেতা পদত্যাগ করলেন এর প্রতিবাদে। দিল্লী আর পুনা ঘন ঘন 'টেলিফোন', 'টেলিগ্রাফ' বিনিময় হতে লাগল। কারও চোখে ঘুম নেই। গান্ধীজির অবস্থার খবর জানতে সবাই উদগ্রীব।

রাতটা কোন রকমে কাটল। সকাল ৮টা নাগাদ বিধান রায় আগা খাঁ প্রাসাদের দিকে যাচ্ছিলেন। বাইরে বেজায় ভীড়। সারা বোম্বাইয়ের পুলিশ আর সামরিক বাহিনী ভেঙ্গে এসে জড়ো হয়েছে আগা খাঁ প্রাসাদে।

বুকটা তাঁর ছ্যাক্ করে উঠল। 'মহাত্মাজীর কিছু হয়নি তো ?'—ডাঃ বিধান রায় শুধালেন নিজেকে। এত পুলিশ ফৌজের আয়োজন কেন ? গান্ধীজির মৃত্যুতে পাছে কোন বিক্ষোভ সুরু হয়ে যায় এ জন্য নয় তো ? তিনি ভীরু পা চালালেন।

গেটের সামনে তাঁকে ঘিরে ধরল অনেকে। তাদের বেশীর ভাগই হল সাংবাদিক। ইংরেজ আর আমেরিকান সংবাদপত্রের প্রতিনিধিদের সংখ্যাই বেশী। তাঁদের মধ্যে একজন ভিড় ঠেলে এগিয়ে এলো। পথ আগলে ধরলেন বিধানচন্দ্রের। তিনি বললেন: 'এই দেখুন আমার মুখ আর হাতের দশা কি হয়েছে। সারা রাত বাইরে কাটিয়েছি। মশার আর দোষ কি?'

সাংবাদিকটি পকেট থেকে নোট বুক আর পেন্সিল বার করলেন। বললেন: গান্ধীজির খবর দিন। তিনি কেমন আছেন বলুন। কাল সন্ধ্যায় আপনাদের জয়েন্ট বুলেটিনের পর, গান্ধীজির অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া 'কি ভাবে সম্পন্ন করতে হবে তার নির্দেশ দিয়ে নাকি খবর এসেছে দিল্লী থেকে। কোন্ কোন্ রাস্তা দিয়ে শব-যাত্রা যাবে তাও নাকি প্ল্যান করে পাঠান হয়েছে। দয়া করে দিন না কিছু খবর কাগজের জন্য। ডাঃ রায় তাঁকে আশ্বাস দিয়ে ঢুকে পড়লেন আগা খাঁ প্রাসাদের মধ্যে। দুরু দুরু বুকে এগিয়ে গেলেন তিনি গান্ধীজির শয্যার দিকে। না, চুপ-চাপ শুয়ে আছেন গান্ধীজি। মুখে প্রশান্ত ভাব, অনেকটা বিজয়ী বীরের মত? আগের দিন কি অসহ্য যন্ত্রণাই না তাঁকে ভোগ করতে হয়েছে। ছটফট করতে হয়েছে বিছানায়।

ডাক্তার বিধানচন্দ্রের দেওয়া মাত্র কয়েক ফোঁটা কমলালেবুর রস! তাই কিনা অসাধ্য সাধন করলে। ধোঁকা দিলে বৃটিশ সরকারকে। ভেস্তে দিলে তাদের অমন শব-যাত্রার বহরটি। বাঁচালে গান্ধীজিকে নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে।

—শ্রীবেণু গঙ্গোপাধ্যায়

চার জনা

পেট রোগা বিন্দি
ঝাড়ে বাত হিন্দি
খায় সে কাসুন্দি
কতনা।
পেট মোটা মুটকী
খায় মাছ শুঁটকী
মারে গুল, ফুটকী
যতনা।

খেবড়া সে থুবড়ী
কথার যে তুবড়ী
চলে যায় ধুবড়ী
গাড়ীতে।
মেয়ে নয় উল্কা
খায় লুচি ফুলকা
দুলে দুল দুলকা
বাড়ীতে।



বাদল দিনে

নরেন্দ্র দেব

আকাশ ছেয়েছে মেঘে
পূবে-হাওয়া বহে বেগে
অঝোরে ঝরিছে বারিধারা ;
খাল বিলে ভরা জল,
দিঘী করে টলমল,
নদী যেন ছোটে কূলহারা !

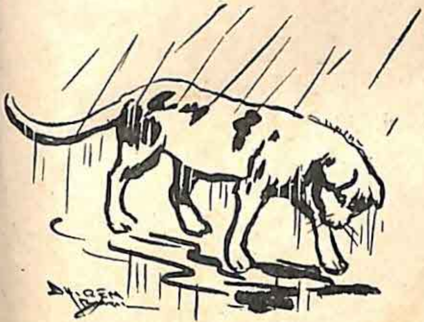
মেঠো পথে জলকাদা ;
আগাছা হয়েছে গাদা,
গ্রাম যেন ভরা জংগলে !
কি পিছল পার-ঘাটা,
এক পা যায়না হাঁটা ;
চারিদিক্ ভিজে কাদা জলে !

এই জলে বিনা ছাতা
বাঁচানো যায় না মাথা,
কাপড়-চোপড় ভিজে ঢোল !
এ ঢোল বাজে না তাই
বড় বেঁচে গেছি ভাই ;
নইলে যা হতো সোরগোল !

ভিজে যে গোবর হয়
এ কথা তো মিছে নয় ;
গোবর কী হয় জানো ভিজে ?
দেখে এস তবে নিজে
বর্ষার জলে ভিজে
বুঝবে ব্যাপার সেটা কী যে !

ঝোড়ো কাক দেখেছো কি ?
ফটো তুলে রেখেছো কি ?
ভিজে বেড়ালের মতো দশা !

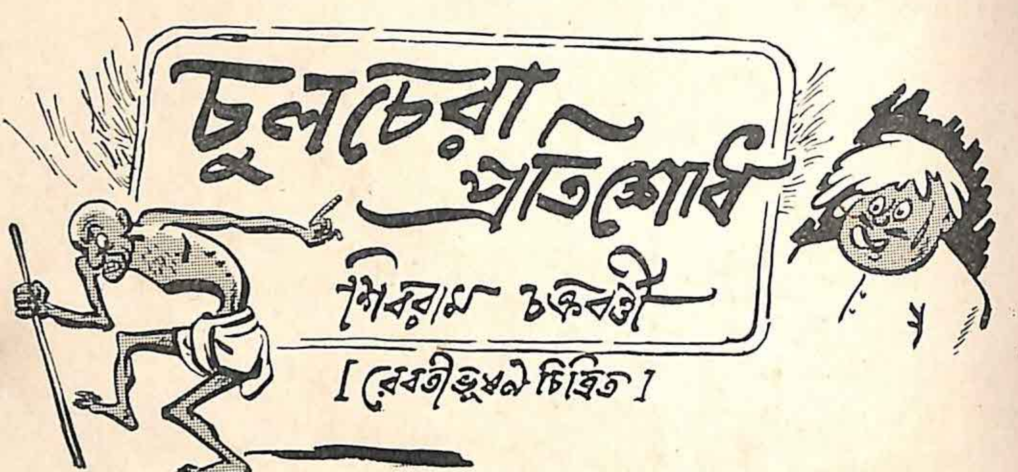




তার চেয়ে বসো এসে
দাওয়ার কোণটি ঘেঁষে,
তুলে আনো কচি দেখে শসা !

জল পড়ে গুঁড়ি গুঁড়ি ;
আনাও গরম মুড়ি,
তেল নূন মেখে নাও তাতে,
গাল ভরে ভরে খাও,
আরামে কামড় দাও
মাঝে মাঝে কাঁচা লংকাতে।





চুলচেরা বিচারের কথাই শোনা আছে, কিন্তু চুলচেরা শোধবোধের কথা কখনো শুনেছো কি ? কিন্তু শোনা নয়, আমার দেখা। নিজের চোখে দেখা। যাকে বলে 'চুলান্ত' প্রতিশোধ ! আমার ছোটবেলার কাহিনী।

কাকা আমার এমনিতে ভালো মানুষ, কিন্তু রাগলে তিনি কারো নন। চটে উঠলে নেচে কুঁদে চেঁচিয়ে মেচিয়ে একাকার ! এ কাকার সঙ্গে সে কাকার কোনোই মিল নেই।

কাকার পেয়ারের চাকর রামলোচন। কী অপরাধ ক'রেছিল কে জানে, রেগে গিয়ে তিনি হুকুম দিলেন—দাও ব্যাটার মাথা মুড়িয়ে ঘোল ঢেলে গাঁয়ের বার করে।

গাঁয়ে ছিল কাকার অখণ্ড প্রতাপ। গাঁয়ের তিনি মোড়ল। কাজেই তাঁর হুকুম পালিত হতে দেরি হোলো না একটুও।

নাপিত রামলোচনকে ধরে ন্যাড়া করে দিলো। অবিশ্যি, নাপিত ছাড়াও আরো কয়েকজনকে ধরতে হয়েছিল। রামলোচন কি সহজে ন্যাড়া হতে চায় !

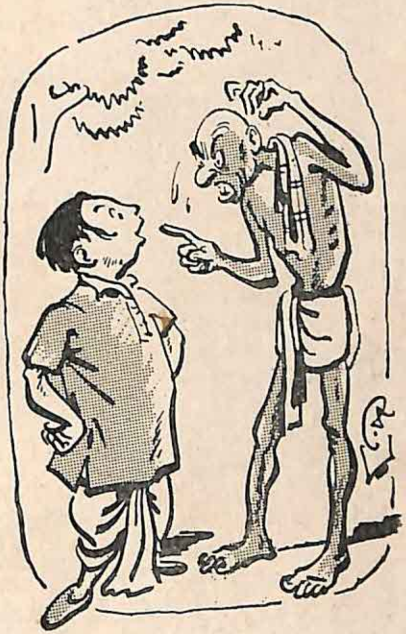
কিন্তু নাপিত যখন তাকে বললো, দ্যাখো বাপু, ক্ষুরের তলায় অমন হুটোপাটি কোরো না তো। মাথা ন্যাড়া করতে গিয়ে বেটপ্‌কা যদি চোট লেগে তোমার নাকটা খ্যাঁদা হয়ে যায় তো আমি জানিনে।

আমি দাঁড়িয়েছিলাম কাছেই। উৎসাহ দিলাম রামুকে—রামু, ন্যাড়া হতে ভয় কিসের ! আমি তো কতো ন্যাড়া হয়েছি। দশ বছর বয়স অব্দি হপ্তায় হপ্তায় ন্যাড়া হওয়াই ছিলো আমার কাজ। ওতে চুল ঘন হয়ে আরো ভালো করে গজায়। এই তো গত বছরেও আমাকে নিয়ে মেলা দেখতে গিয়ে কাকা নাপিত দেখেই না আমার মাথা মুড়িয়ে দিলেন। ওতে কী হয়েছে ! নাও, লক্ষ্মী ছেলের মতন ন্যাড়া হয়ে নাও। ছি, দুরন্তপনা করে না। অমন করলে যদি বেকায়দায় তোমার নাকটি কাটা পড়ে ? চুল গেলে চুল আবার হবে, কিন্তু নাক গেলে—? একটি তো মোটে নাক !

রামলোচন হ্যাকা নয়। বুঝলো। হ্যাড়ার ওপর আরো বেশি নাকাল হতে চাইলো না। ঠাণ্ডা মাথায় নিজেকে মুড়িয়ে নিলো।

তারপর ঘোল ঢালার পালা। দই আনতে কে বাজারে যায়, কেই বা ঘোল বানায়? ও সব কাজ রামলোচনই করত। কিন্তু এখন চাকরি যাবার পর, বিশেষ করে নিজের জন্যে অতসব ফরমাস খাটতে রাজি হবে কি? নিজের জন্য দই এনে নিজেই ঘোল বানিয়ে নিজের মাথায় ঢালতে —ব্যাপারটা কেমন যেন ঘোলাটে মনে হোলো। তাই কাকা বাধ্য হয়ে কাজটা নিখরচায় সারলেন। ঘোল অভাবে এক বালতি জল এনে ঢেলে দিলেন ওর মাথায়।

গাঁয়ের বার অবশ্যি ওকে করতে হোলো না। ভিন্ গাঁয়ের লোক সে। নিজেই সে আমাদের পাড়া ছেড়ে চলে গেল।



আমি কিছুদূর ওর সাথে সাথে গেছলাম। রামলোচন বলছিল, 'আপনাদের বাড়ি আমার অন্ন গেল তাতে আমার দুঃখু নেই, দুমুঠো চাল আমার কোথাও থেকে জুটবেই, কিন্তুক—' বলতে গিয়ে সে ভাষা খুঁজে পায় না, হাতের তেলো দিয়ে নিজের বেলমাথায় হাত বোলায়।

আমি সান্ত্বনা দিই, রামলোচন, তোমার চালও গেল চুলও গেল, সত্যিই! চালচুলো কিছুই রইলো না! কিন্তু তুমি দুঃখ কোরো না। দুই আবার হবে। মাথা থাকলেই হয়। মাথার উপরেই হয়ে থাকে।

রামলোচন বলল, বিনা দোষে মুনিব আমায় সাজা দিলেন! আপনি দেখে লিবেন খোকাবাবু, আমি এর চুলচেরা শোধ লিবো। যদি না লি তো আমার লাম রামলোচন না!

রামলোচন তারপর থেকে আর আমাদের পাড়া মাড়ায় না। তবে তার সঙ্গে আমাদের দেখা হয় মাঝে মাঝে। হাটে বাজারে দেখা হয়। সেখানে আমাদের বুধবারি হাট লাগতো। বুধবারে বুধবারে বিরাট হাট বসতো আমাদের গাঁয়, সাত গাঁয়ের লোক জড়ো হয়ে কেনা বেচা করতে আসতো। রামলোচনও আসতো।

আসতে হোতো রামলোচনকে। সাতদিনে একটি হাট, সওদা করতে সবাইকেই আসতে হয়।

কাকার সঙ্গে আমিও যেতাম বুধবারের হাটে। থলে হাতে যেতাম, থলে ঘাড়ে করে ফিরতাম। সারা বাজার মাথায় করে আসতে হোতো। রামলোচনের অভাব মোচন করছিলাম আমি।

হাটে একদিন রামলোচনের সঙ্গে দেখা। কেমন যেন বেঁকে গেছে। হাঁটছে একটু খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে।

রামলোচন, 'তোমার কী হয়েছে?' কাকাই ডেকে শুধোলেন।

'আইজ্ঞা মুনিব, শিরদাঁড়াটা যেন আমার বাঁকতে লেগেছে। বাত ধরেছে মালুম হয়। লোকে কইছে তোমার কুঁজ বাহির হইবে।'

'কুঁজ! সে কি রে! সে যে ভারী খারাপ। দেখতে ভারী বিচ্ছিরি।' আঁৎকে উঠলেন কাকা।—'দোহাই তোমার, এর ওপর আবার তুমি কুঁজ বার কোরো না রামলোচন!'

'আইজ্ঞা কর্তা, আমি কি বার করবার মালিক? ভগবানের মার কর্তা।'

'তা হোক্, তুমি একটু সোজা হয়ে হাঁটো দেখি। সোজা হলে তোমাকে ভালো দেখায়।'

'আর কর্তা, দেখাদেখির কাম নাই। দেখার লোক সংসারে আমার কে আছে!'

'ডাক্তার দেখাও।'

'পয়সা কই কর্তা! শিবঠাকুরের দরজায় গিয়া হত্যা দেবার কথা ভাবছি।' এই বলে চলে গেল রামলোচন।

তারপর একদিন শুনলাম রামলোচন আমাদের গাঁয়ের শিবমন্দিরে হত্যা দিয়ে পড়েছে। তিন দিন ধরে উপোষ করে রয়েছে। তিন দিনের দিন, শেষ রাত্তিরে, স্বয়ং শিবঠাকুর তাকে নাকি স্বপ্নে দেখা দিয়েছেন। ঠাকুরের সে প্রত্যাদেশ পেয়েছে বলে শোনা গেল।

শুনে যা কৌতূহল হোলো আমার কী বলবো! দেবতাদের কথাবার্তা আমি কখনো শুনিনি। রামলোচনের কাছে যাই যাই করছি কিন্তু যেতে হোলো না। সে নিজেই এলো আমাদের বাড়ি।

আরো যেন কুঁজো হয়ে গেছে রামু। ধনুকের মতন বেঁকে গেছে একেবারে। আরেকটু বেঁকলেই একটা নিখুঁৎ রাইট অ্যাংগল বনতে পারে। সেই জ্যামিতিক চেহারা নিয়ে খোঁড়াতে খোঁড়াতে রামলোচন এলো। একটা তামার মাদুলি হাতে করে।

এসেই আমার কাকার পায়ে পড়ে সে কী কান্না তার!

'শিবঠাকুর বলেছেন—! শিবঠাকুর বলেছেন!!'—তার ফোঁপানির ভেতর থেকে এইটুকুই শুধু শোনা গেল।

'কী বলেছেন শিবঠাকুর?' কাকাবাবু গম্ভীর গলায় শুধোলেন।

'বলেছেন আপনিই সাক্ষাৎ শিব। শিবের অবতার!' কাঁদতে কাঁদতে বললো রামলোচন: 'আপনার কাছেই আসতে বললেন শিবঠাকুর।'

'বটে বটে?' সোজা হয়ে বসলেন কাকা।

'হাঁ কর্তা! শিবঠাকুর আমায় স্বপ্ন দিলেন, বললেন যা তুই ওর কাছে—বলে আপনার নাম উশ্চারণ করলেন—আমি এই পাপমুখে কি করে আপনার নাম উশ্চারণ করি?'

'বললেন যে তারিনীর কাছে যা?' কাকাবাবু নিজেই নিজের নামোচ্চারণ করলেন।—'তাই বললেন বাবা?' বলতে গিয়ে তাঁর সারা গায় রোমাঞ্চ দেখা দিলো।

'হাঁ, ওই নামই বাবু। বললেন যে ওনার কাছে গেলেই হইবে। এখন আপনি দয়া করলেই আমার যতো আধি ব্যাধি সব সেরে যায় কর্তা।' বলে রামু কাকুর পা জড়িয়ে আবার হাঁউ মাঁউ করে উঠল।

'কী দয়া করতে হবে শুনি?'

'আর কিছু না মুনিব। শুধু আপনার একগাছি চুল। মাথার একটা চুল। তাই আমি এই তামার মাদুলিতে ভরে আমার গলায় নিয়া ধারণ করবো। আপনার চুল সর্বব্যাধি বিনাশ করে কর্তা।'

'বলেছেন শিবঠাকুর?' বলার সাথে সাথে তাঁর সারা মুখে যেন স্বর্গীয় আভা ছড়িয়ে পড়লো।

'বটে? শুনছিস তোরা? রামুর কথা শুনলি? শুনছো গো?'

বলে তিনি সগর্বে তাকালেন আমাদের দিকে, কাকীমার দিকেও। কাকীমার দিকেই বেশি করে। বিশেষ করে।



তারপর তিনি অতি সন্তর্পণে মাথার এক-পাশ থেকে একগাছি চুল ছিঁড়ে রামুকে দিলেন।

রামু সেটা মাথায় করে নিয়ে সযত্নে তার সেই তামার মাদুলিতে ভরলো। ভরে গলায় পরলো।

ওমা! অবাক্ কাণ্ড! দেখতে না দেখতে ধনুকের মতো বাঁকা রামু, ছিলার মতন সোজা হয়ে গেল। সটান্ খাড়া হয়ে দাঁড়ালো!

আনন্দে লাফাতে লাগলো রামু। কোথায় গেল তার বাত, কোথায় বা গেল কুঁজ! মন্থরার পুংলিঙ্গ থেকে সে যেন এখন হনুমানের স্ফুলিঙ্গ!

তারপর কাকাবাবু কাকীমার পায়ের ধূলো নিয়ে লাফাতে লাফাতে চলে গেল সে।

খবরটা রটে গেল দিগ্বিদিকে। তারপরই দিগ্বিদিক থেকে দলে দলে লোক আসতে সুরু হোলো। কাকাবাবুর পায়ের ধূলো আর মাথার চুল নিতে। কারু আমবাত, কারু আমাশার

ধাত ; কারু অম্বলের ব্যামো, কারু বা হিষ্টিরিয়া ; কারু মাথাধরা, কারু বা চোখে ছানি ; কারু টাক পড়ে মাথার চুলহানি, কারু বা চুলকানি। নানা লোকের নানান্ ব্যারাম। কাকাবাবু সবাইকেই তামার মাদুলিতে এক এক গাছি চুল দিয়ে বিদায় দেন।

দিতে দিতে তাঁর মাথার তেলোয় টাক পড়ার যো হোলো। কাকাবাবু বুঝলেন যে নাঃ, এভাবে দু'হাতে দান খয়রাৎ করলে দুদিনে বিলকুল ফাঁক হয়ে যাবে। তিনি চুলের কণ্টোল বসিয়ে দিলেন। কিউ তো আগেই লেগেছিল।

তিনি বললেন—'আমি কি দাতাকর্ণ হয়েছি? আমার মাথার চুল কি আমার নয়? আমার নিজের কি কয়েকটাও থাকতে নেই? আমার নিজের বাড়িতেও তো অসুখ বিসুখ লাগতে পারে, তখন?'

তখন ঠিক হোলো, মাথার আনকোরা চুল ছিঁড়ে কাউকে তিনি আর দেবেন না। চানের সময় চুলে তেল ঘষতে বা আঁচড়াবার সময় মাথায় চিরুণী দিতে যে কতিপয় চুল নিজগুণেই উঠে আসবে, গুণে গুণে কেবল সেইগুলিই সেদিন বিতরণ করা হবে। এম্নি দিনকের দিন।

আমাকেই তার ভার নিতে হোলো! কাকার চুলে তেল ঘষতে হয় আমাকেই। তখন যা আমার হাতে উঠে আসে সযত্নে তুলে রাখি। তারপরে কাকার আঁচড়াবার সময় ওৎ পেতে থাকতে হয়। তখন ঝর্‌তি পড়্‌তি যা পাই!

কিন্তু চুলের সীমা থাকলেও ব্যারামের তো সীমা নেই। বাড়িতে বাড়িতেই ব্যায়রাম। আর বাড়তে বাড়তেই চলেছে। সামলানো দায়। কাকার দৈনিক ঐ নামমাত্র চুলে সবাইকে কুলিয়ে ওঠা যায় না।

অনেককেই হতাশ হয়ে ফিরতে হয়।

এম্নি যখন অবস্থা তখন কাকা আর আমি এক বুধবারের হাটে গেছি। রামলোচনের সাথে মোলাকাৎ।

কাকাকে দেখেই রামলোচন তো দণ্ডবৎ!

'বোম্ মহাদেব!' বলে একটা হাঁক দিয়ে পা ছেড়ে উঠলো রামলোচন—তার হুঙ্কারে দেখতে না দেখতে ভীড় জমে গেল চারদিকে। আমাদের ঘিরে দাঁড়ালো সবাই।

'হুজুরের কাছে আমার একটা আর্জি আছে', বিনীত কণ্ঠে সে বললো।

'তোমার কুঁজ তো কবে সেরে গেছে, আবার তোমার কি আর্জি?' কাকাবাবু শুধোলেন।

'আইজ্ঞা হাঁ। আমি জীবন ফিরে পেয়েছি আপনার কেরপায়—আমার আর কোনো অসুখ বিসুখ ব্যাধি নাই। সামাণ্যি সর্দিও লাগে না। কিন্তু পের্‌ভু, সবার হইয়া আমার একটা নিবেদন—'

'কী নিবেদন বলো।' কাকাবাবু উদার হাস্যে অমায়িক।

'আপনিতো বুড়া হইছেন, করে মরিয়া যাইবেন কিচ্ছু নিশ্চিতা নাই।'

'তা, কে আর মারা যাবে না বলো? এই মর্ত্যে আসা তো মরতেই আসা।'

'ভগবান না করুন—কিন্তু আপনি মারা গেলে আপনার চুলের কী হইবে?'

'কী হইবে!' শুনে কাকাবাবুর এবার রাগ হোলো— 'চুলোয় যাক্ না, তোমার তাতে কি?'

'হাঁ ওই কথাই কইছিলাম। আপনার চুলও চুলোয় যাইবে। আপনার সাথে এক চুলোতেই যাইবে। তাই অধীনদের এই নিবেদন, এখনই আপনার দু চারটা চুল যদি দয়া করিয়া আমাদের আপনি দিয়া যান—'

তার কথায় সবাই একবাক্যে সায় দিল। —'হাঁ কর্তা, কিছু চুল দিয়া যান আমাদের।' সকলেই হাত জোড় করে বলল।

'কিছু চুল!' কাকাবাবু মাথায় হাত দিলেন। একটা একটা চুল আলাদা আলাদা আলতো করে হয়তো তোলা যায়। কিন্তু একসঙ্গে একাধিক চুলে টান দিলে মাথা টন টন করে।

'বেশি না, এক মুঠো দিলেই আমাদের সকলের হইয়া যাবে কর্তা!' মুঠো পাতলো সবাই।

কাকাবাবু বললেন—'এক মুঠো! ভারী আবদার যে! আমি কি দানছত্র খুলেছি? না অত হবে না, সবাইকে আমি একটা একটা করে দেবো।'

কিন্তু একটা করে তুলতেও তাঁর মায়া লাগে। সেইজন্যেই দেরি হয়। এদিকে লোকের তর সয় না।

হঠাৎ হোলো কি, পেছন থেকে একটা লোক লাফিয়ে উঠে না, কাকাবাবুর মাথার এক খাম্চা চুল তুলে নিলে। তারপর আর দেখতে হোলো না। জোড় হাতগুলি সব জড়ো হয়ে একজোট হয়ে কাকাবাবুর মাথার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল।

কাকাবাবুর চুল নিয়ে চুলোচুলি বেধে গেল সবার। সে এক পেল্লায় কাণ্ড!

কতো আর চুল ছিলো কাকার মাথায়? মুষ্টিমেয়ই বলা যায়। অতগুলো মুঠো ভরতে সবই তার ফাঁক হয়ে গেল। সবাই ফাঁকা হলে দেখা গেল কাকাবাবু হতজ্ঞান হয়ে ধরাশায়ী, আর তাঁর মাথায় একটিও চুল নেই।

একটিই ছিল। কাণের পাশে এক কোণে ছোট্ট একটা। কাকাবাবুর অজান্তে সেটিকে আমি হাতালাম। অতি সন্তর্পণে তুলে নিলাম। সামনে আমার পরীক্ষা, ফেল যাবার ভয় ছিল—যদি একচুলের জন্যে পাশ করে যাই! মাদুলি কোথায় পাবো, চুলটিকে আমার বুক পকেটে ধারণ করলাম।

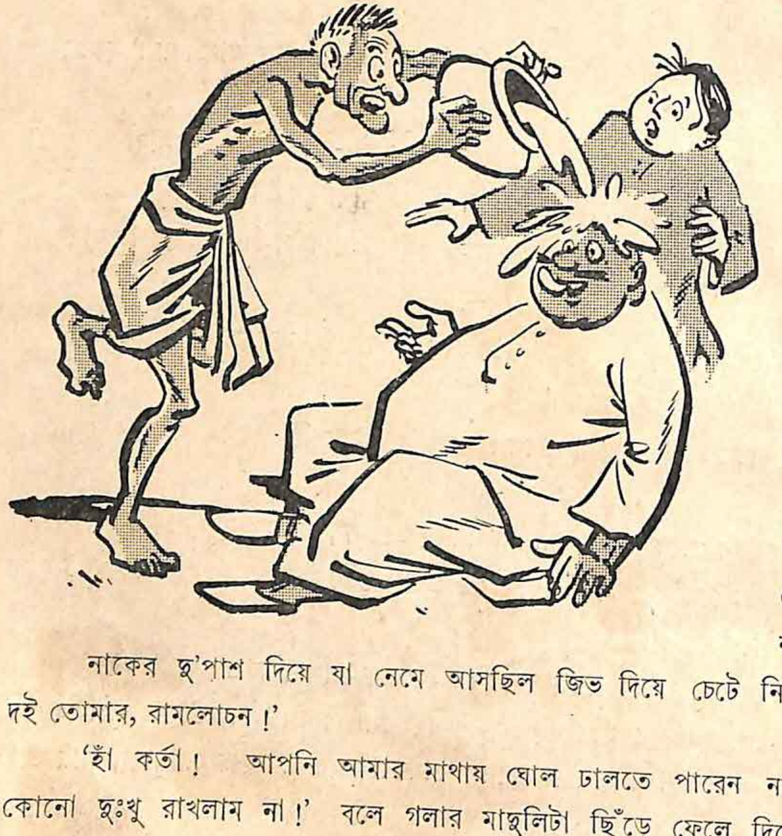
সম্বিৎ পেয়ে কাকাবাবু ককিয়ে উঠলেন—'জ্বলে গেল, মাথাটা জ্বলে গেল আমার!' তারপর

মাথায় হাত বুলিয়ে—'এঁ্যা, এ কী করেছে! ব্যাটারা একটা চুলও বাকী রাখেনি! একেবারে ন্যাড়া করে দিয়ে গেছে! ইস্, মাথাটা যা জ্বলছে, গেলাম!'

তারপর আমার দিকে তাকিয়ে—ওরে হাঁদারাম, দাঁড়িয়ে দেখছিস্ কী! মাথাটা যে জ্বলে গেল আমার! কোথাও বরফ টরফ কিছু পাস্ কিনা ছাখ্। নিয়ে আয় চট্ করে—মাথায় দিয়ে বাঁচি।'

পাড়াগাঁয়ের হাটে কি আর বরফ মেলে—চট্‌লেও না, চট্ করে তো নয়ই!

কাকার মূর্তিমান জিজ্ঞাসার সামনে আমি 'নোট্ অব্ অ্যাডমিরেশন্' হয়ে দাঁড়িয়ে থাকি।



এমন সময় রামলোচন কোথাথেকে এক হাঁড়ি দই এনে হাজির—'কর্তা, এই ঠাণ্ডা দইটা মাথায় লাগান। মাখলে আপনার মাথার জ্বলুনি কমবে, মাথা ঠাণ্ডা হইবে।' বলে অনু-মতির অপেক্ষা না রেখেই হাঁড়িটা কাকার মাথায় উজার করে।

আরাম পেয়ে কাকা বললেন—'আঃ! বাঁচলাম। তোমার দইটা তো মন্দ নয় হে।'

নাকের দু'পাশ দিয়ে যা নেমে আসছিল জিভ দিয়ে চেটে নিয়ে তিনি বললেন।—'খাসা দই তোমার, রামলোচন!'

'হাঁ কর্তা! আপনি আমার মাথায় ঘোল ঢালতে পারেন নাই ।কন্তু আমি আপনার কোনো দুঃখু রাখলাম না!' বলে গলার মাদুলিটা ছিঁড়ে ফেলে দিয়ে সে চলে গেল। ফিরেও তাকালো না।



থাক্‌বে না আর শুয়ে পিকি,
বস্‌তে নতুন শিখে

মাথা তুলে আজ সে প্রথম
দেখ্‌ছে পৃথিবীকে।

চড়ুইটি

প্রেমেন্দ্র মিত্র



চড়ুই, চড়ুই, চড়ুইটি,
ফুরুৎ ফুরুৎ ওড়ে,
কড়ি কাঠের ফোকর থেকে
বেরিয়ে সে কোন্ ভোরে !
কিচির মিচির বলে কি ?
ইচ্ছে করে শিখে নি' ;
কেমন করে পারি ?
ইংরিজি কি বাংলা থেকেও
শক্ত আরো ভারী !

চড়ুই, চড়ুই, চড়ুইটি,
উঠোন খুঁটে খায় ।
ভুলো মেনীর দেখা পেলেই
কোথায় উড়ে যায় ।
কোথায় যে যায় জানি কি ?
ইচ্ছে করে সঙ্গ নি' ;
কেমন করে যাই ?
মার যে মানা, উঠোনখানার
বাইরে যেতে নাই !



চড়ুই, চড়ুই, চড়ুইটি,
আমায় চেনে কই?
দিন রাত্তির দুজন তবু
এক বাড়িতেই রই।
বাসাতে তার করে কি?
ইচ্ছে করে দেখে নি',
কেমন করে উঠি?
বড্ড উঁচু, কাছে পিঠে
নেই মই কি খুঁটি!

চড়ুই, চড়ুই, চড়ুইটি,
ভাব করতে চাই।
দেব, বলি, আমার নতুন
হাওয়া-বন্দুকটাই!
কি যে ভাবে জানি কি?
ইচ্ছে করে বুঝে নি',
বুঝব কখন ছাই?
বন্দুকটা দেখেই করে
পালাই, পালাই!







গাল ধরে কেউ খামচি কাটে, চুল ধরে কেউ টানে,
দুই পালোয়ান কুস্তি করে হার না কেহ মানে।



পঞ্চপ্রদীপ

[একাঙ্কিকা]

মন্মথ রায়

[একটি পার্কের কোণে ছোট কুঞ্জ—তাহাতে একটি বেঞ্চি। বৈকাল। বিমল ও অমল দুই বন্ধু সেখানে আসিয়া বেঞ্চিতে বসিল]

অমল॥ নাঃ — আজকের দিনটাই মাটি।

বিমল॥ এ যেন তুমি অমল চাটুয্যে আর আমি বিমল বোস, এই দুজনেরই দায়। একটা গোটা দেশ বন্যায় ভেসে যাচ্ছে, তা আমাদের কারুর ভ্রূক্ষেপ নেই।

অমল॥ বলে কিনা উড়িষ্যায় বন্যা, তা আমাদের কি!

বিমল॥ অথচ আমরাই বলি 'আমরা ভারতবাসী, আমরা এক'। এটুকু বোঝে না যে আজ যদি বাংলায় অমনি বন্যা হয়, তখন বাইরের সাহায্য আমাদেরও হয় ত দরকার হবে।

অমল॥ হেড মাষ্টার মশায় কত আশা করে আছেন, আমরা অনেক টাকা চাঁদা তুলে দিতে পারবো তাঁর হাতে। সব স্কুলেই চাঁদা তোলা হচ্ছে। আমরাই থাকব পিছিয়ে?

বিমল॥ আর কেউ যদি এগিয়ে না আসে, আমরা পিছিয়ে পড়বো এ আর আশ্চর্য্য কি? কতজনকেই তো বলে দেখলাম, সবাই বলে আজ 'ফুটবল ম্যাচ', নয় তো বা বলে 'নতুন এই ছবিটা দেখতেই হবে'—আর 'শরীরটা ভাল নয়'—এই অজুহাত তো লেগেই আছে।

অমল॥ ছেড়েদে ভাই ছেড়েদে, দুষ্টু গরুর চেয়ে শূন্য গোয়াল ভাল। হেড মাষ্টার মশায় আমাকে চুপি চুপি বলেছেন—"অমল—চাঁদা তুলতে গেলেই কাঁচা পয়সা নাড়াচাড়া করতে হবে। এখনকার ছেলেরা পয়সাটা বড্ড চিনেছে। সিনেমা আর ফুটবলের ম্যাচ দেখতে গিয়ে অনেকেই বাপের পকেটে হাত দেয়। যাদের সঙ্গে নেবে তাদের বাজিয়ে নিও।

বিমল॥ মিথ্যা কিছু বলেন নি। আমাদের ঐ ভুতো—ঐ যে—ঐ নতুন ভর্ত্তি হয়েছে ক্লাশ নাইনে—স্ফূর্ত্তিবাজ ছেলেটা—

অমল ॥ হ্যাঁ—হ্যাঁ—এবার সাঁতারে ফার্ষ্ট হয়েছে অ্যানুয়াল স্পোর্টে, তিনটে প্রাইজ বাগিয়েছে।

বিমল ॥ হ্যাঁ, সেই ভূতনাথ মল্লিক—সে আমায় ধরেছে, আমাদের সঙ্গে বন্যার চাঁদা আদায় করতে যাবে। আমি বলেছি অমলকে বলতে হবে—বিকেলে পার্কে এসো বলে দেখবো।

অমল ॥ গায়ে পড়ে যখন চাঁদা তুলতে যেতে চাইছে—সন্দেহ হচ্ছে। তাছাড়া শুনেছি ওদের অবস্থা ভাল নয়। হেডমাষ্টারকে ধরাধরি করে হাফ ফ্রী হয়েছে।

বিমল ॥ বেশতো। আমরা বাজিয়ে নেবো। অমল, ওই যে আসছে—

অমল ॥ তবে ওকে ডাকি—এই—

বিমল ॥ চুপ—ডাকতে হবে না। যখন বলেছি তখন এখানেই আসবে (পকেট হইতে একটি দশটাকার নোট বাহির করিয়া তাহা পেন্সিলে চিহ্নিত করিয়া বেঞ্চির সামনে পায়ের কাছে ফেলিয়া রাখিয়া) চল্ এখান থেকে আমরা সরে পড়ি—ওই গোলঘরের আড়ালে।

অমল ॥ কিন্তু দশটাকার এই নোটটা ?

বিমল ॥ ঐটাই ভূতনাথের পরীক্ষা—ঐ যে আসছে—চলে আয়—চলে আয়—

[দুজনে সরিয়া পড়িল। ক্ষণপরে ভূতনাথের প্রবেশ। সে আসিয়া অমল ও বিমলের খোঁজে এদিক্ ওদিক্ চাহিল। তারপর বেঞ্চিতে বসিতে গিয়া দেখিল একটি দশটাকার নোট মাটিতে পড়িয়া রহিয়াছে। সে নোটটি তুলিয়া লইয়া ভাল করিয়া দেখিল। তাহার পর চারদিকে তাকাইল—কাহাকেও দেখিতে না পাইয়া নোটটি চার ভাঁজ করিয়া জামার ঘড়ির পকেটে পুরিল। এমন সময় চানাচুরওয়ালা চানার গান গাহিতে গাহিতে তথায় আসিল।

—গান—

চাই চানাচুর নকুল দানা বাবু ভাইদের জন্যে আনা ॥
সখের বাদাম টাট্‌কা দানা নিয়ে নাও দু-চার আনা ॥
ফুরিয়ে গেলে আর পাবে না সকলেরই আছে জানা ॥
থাকো যদি কেউ অচেনা খেয়ে তার উচিত জানা ॥
আমার কথা সত্যি কিনা চাই চানাচুর নকুল দানা ॥

চানাওয়ালা ॥ কি দাদা—মুখে চাবি দিয়ে বসে আছেন যে—

ভূতনাথ ॥ পকেটে কিছু নেই বলে !

চানাওয়ালা ॥ চারটে পয়সাও জোটে না !

ভূতনাথ ॥ অ্যা, যত বড় মুখ নয় তত বড় কথা ! (রাগের চোটে তাহার টুঁটি টিপিয়া ধরিল)

চানাওয়ালা ॥ মাপ কর ভাই, মাপ কর—পায়ে পড়ছি মাপ কর। [ভূতনাথ তাহাকে ছাড়িয়া দিল]

ভূতনাথ ॥ এত বড় কথা তুই বললি কোন সাহসে ?

চানাওয়ালা ॥ পেটের দায়ে বাবু—পেটের দায়ে। আজ কিছু রোজগার হয়নি। বুড়ো বাপ-মা

পথ চেয়ে বসে আছে। আমি গেলে ঠিক হবে হাঁড়ি চাপবে কি চাপবে না। যাই—জানি আজ হরিমটর (যাইতে গিয়া) কিছু মনে করো না বাবু। একটা কথা বলবো ?

ভূতনাথ ॥ বল—

চানাওয়ালা ॥ খুব দয়া তোমার। দু'ঘা মারলে কিচ্ছু বলার ছিল না আমার। আমার এ ভাজাগুলো সত্যি খুব ভালো—আমার মা'র হাতের তৈরী কিনা! একটা তোমায় দেবো ? না—না, দাম তোমাকে দিতে হবে না।

ভূতনাথ ॥ কাছে এস! না—না, ভয় নেই। (চানাওয়ালাকে টানিয়া সস্নেহে কাছে বসাইল) সত্যি আমার কাছে পয়সা নেই ভাই। খুব কষ্টেই আমাদের দিন চলে। ইস্কুলে পড়ি—পুরো মাইনে দিতে পারি না। কিন্তু কেউ গরীব বলে অপমান করবে সেওতো সইতে পারি না ভাই। তোমার কথাও তাই আমি সইতে পারি নি।

চানাওয়ালা ॥ আমরাও একদিন ভদ্রলোকই ছিলাম। কিন্তু কপালের দোষ দেখ—বাবা পড়লেন অসুখে—চাকরীটা গেল—লেখাপড়া শিখতে আমি পেলাম না। শেষটায় আর কি করবো চানাচুর বিক্রী করে দু' পয়সা রোজগারের চেষ্টায় আছি। মনে কত সাধ-আহ্লাদ ছিল, পুরলো না বাবু।

ভূতনাথ ॥ অথচ চোখের ওপর দেখি, আমাদের ক্লাশের কত ছেলে থিয়েটার দেখছে, সিনেমা দেখছে, কতভাবে কত পয়সা উড়োচ্ছে। সবাই এসে সে সব গল্প শোনায়। আমি জিজ্ঞেস করি, 'তোরা ভাই এত পয়সা পাস কোত্থেকে ?' কেউ বলে—বাপ-মা দেয়। কেউ বলে—বাজারের পয়সা থেকে চুরি করি। আমার এক এক সময় কি মনে হয় জানো ?

চানাওয়ালা ॥ কি দাদা ?

ভূতনাথ ॥ চুরি করি। যেমন ওরা করে। সাধু হয়ে লাভ কি! লাভ তো—এই চারটে পয়সা দিয়ে তোমার এক প্যাকেট চানাচুরও নিতে পারলাম না আমি।

চানাওয়ালা ॥ তা ভাই নাই বা নিতে পারলে—তাই বলে চুরি-চামারির মধ্যে না যাওয়াই ভাল। তোমায় ভাই আমি বলছি শোন। কাউকে বলো না কিন্তু।

ভূতনাথ ॥ না-না, তুমি বল—

চানাওয়ালা ॥ আমি একবার বাসে যেতে যেতে একজনের পকেট থেকে দশটাকার একটা নোট তুলে নিয়েছিলাম।

ভূতনাথ ॥ বল কি!

চানাওয়ালা ॥ হ্যাঁ—

ভূতনাথ ॥ তারপর ?

চানাওয়ালা ॥ দশ-দশটা টাকা কখনো এক সঙ্গে হাতে পাইনি—ছুটে গেলাম বাজারে, কতকাল মাছ খাইনি—আড়াই টাকা দিয়ে কিনলাম একটা ইলিশ মাছ—ইয়া বড়। বাবার জামা ছিল না,

কিনলাম একটা সার্ট। মার একটা আয়না চিরুণী ছিল না—তাও কিনলাম। একজোড়া স্যাণ্ডাল পরবার সখ ছিল আমার কিনতে গিয়ে মনে হ'ল, ডাক্তার বাবাকে বলেছিল একটু ফলটল না খেলে শরীর সারবে না। কথাটা মনে পড়লো—স্যাণ্ডাল কিনতে আর পারলাম না। বাকি পয়সায় ফল কিনে ঘরে ফিরলাম।

ভূতনাথ ॥ তারপর—তারপর ?

চানাওয়ালা ॥ মা বাবা সবাই অবাক, বললেন—এত টাকা পেলি কোথা ? ভারী বিপদে পড়লাম।

ভূতনাথ ॥ কি বললে ?

চানাওয়ালা ॥ বলতেই হল যে, দশটাকার একটা নোট কুড়িয়ে পেয়েছি।

ভূতনাথ ॥ তারপর ?

চানাওয়ালা ॥ বাবার আর তর সয় না—মাকে ঠেলে পাঠালেন হেঁসেলে। খুব রান্না হ'ল। ইলিশ মাছ ভাজা—ভাতে—টকে। কতকাল পরে বাবা আর আমি একসঙ্গে বসে পেট পুরে খেলাম—মনে হ'ল যেন অমৃত খাচ্ছি। কিন্তু ভাই, তারপরই যেন খেলাম বিষ !

ভূতনাথ ॥ বিষ ! মানে ?

চানাওয়ালা ॥ বলছি, শোন। আমাদের খাওয়া হয়ে যেতে মা খেতে বসলেন। কাছে বসে মাকে অনেক মাছ খাওয়াবো এই ছিল সাধ। গিয়ে দেখি, মা পাতে একটা মাছও নেন নি। নিয়েছেন শুধু ডাল আর ভাত।

ভূতনাথ ॥ কেন ?

চানাওয়ালা ॥ কিছুতেই বলেন না কেন—মাথা খুঁড়েও তাকে একখানা মাছও খাওয়াতে পারলাম না। না পারলাম আমি—না পারলেন বাবা।

ভূতনাথ ॥ কিন্তু কেন ? কি বললেন তিনি ?

চানাওয়ালা ॥ আঁচিয়ে উঠে বললেন—"ও মাছ আমার গলা দিয়ে যাবে না। যার টাকা খোকা কুড়িয়ে পেয়েছে না জানি সে কত গরীব—না জানি আজ তার মনে কত দুঃখ।" কুড়িয়ে পাওয়া দূরের কথা—আমার চুরি করা টাকা—তখনই মনে হতে লাগলো—অমৃত আমি খাইনি—আমি খেয়েছি বিষ।

ভূতনাথ ॥ মাকে পরে তুমি এ কথা বললে ?

চানাওয়ালা ॥ না ভাই বলিনি। সে সাহস আমার হয় নি। চলি ভাই। (উঠিয়া দাঁড়াইল।)

ভূতনাথ ॥ দাঁড়াও ভাই একটা প্যাকেট চানাচুর আমায় খেতে দেবে বলেছিলে।

চানাওয়ালা ॥ ও-হ্যাঁ—নাও দাদা। [এক প্যাকেট চানাচুর ভূতনাথকে দিল।]

ভূতনাথ ॥ তোমার মায়ের হাতের তৈরী, না ?

চানাওয়ালা ॥ হ্যাঁ, ভাই।

ভূতনাথ ॥ দাম দেবার পয়সা নেই—তা ছাড়া এর দামও হয় না। তোমার নাম কি ভাই ?

চানাওয়ালা ॥ ভোলানাথ—ভোলানাথ ভট্‌চায্যি। তুমি আমাকে ভুলো বলেই ডেকো।

ভূতনাথ ॥ কিন্তু আমাকে যেন ভুলো না ভাই ভুলো। কাল আবার দেখা হবে এখানে। ভারী ইচ্ছে তোমার সঙ্গে তোমাদের বাড়ী যাই, তোমার মাকে দেখি।

চানাওয়ালা ॥ তা যেয়ো—যাবে বৈকি। গেলে আর কিছু খাওয়াতে না পারি মার হাতের তৈরী এই চানাচুর পাবে। [পূর্ব্ববৎ গান ধরিয়া প্রস্থান।]

[একটি "বুট পলিশ" ছেলের প্রবেশ। সে বেঞ্চের চারিদিকে কি খুঁজিতে লাগিল।]

ভূতনাথ ॥ কি হে, কি খুঁজছো ?

বুটপলিশ ॥ সব্বনাশ হয়েছে আমার বাবু।

ভূতনাথ ॥ কি হল ?

বুটপলিশ ॥ একটু আগে এই বেঞ্চে এক বাবু বসেছিলেন। আমি তার জুতো পালিশ করছিলাম। যত ঘসি, বলেন আরও ঘসো। ঘসতে, ঘসতে পুরোনো জুতো আয়না হয়ে গেল আর—

ভূতনাথ ॥ আর ?

বুটপলিশ ॥ ঘসার চোটে তার জুতোর সেলাই গেল খুলে !

ভূতনাথ ॥ বটে ! তারপর ?

বুটপলিশ ॥ তারপর আরম্ভ হলো ধোলাই !

ভূতনাথ ॥ কার ?

বুটপলিশ ॥ আমার—আর কার !

ভূতনাথ ॥ বল কি ! তারপর ?

বুটপলিশ ॥ আমায় কাণে ধরে হিড় হিড় করে টেনে নিয়ে চললেন মুচীর কাছে। জুতো সেলাই-এর দু-আনা পয়সা আদায় করে ছাড়লেন আমার কাছে।

ভূতনাথ ॥ বটে ! জুতো-কালি করার পয়সা পেয়েছো তো ?

বুটপলিশ ॥ বলেন কি বাবু সেতো দেয়ই নি দুটো কসে কাণমলা দিয়ে ক্ষতিপূরণ আদায় করে নিয়েছে। কিন্তু আমার যা ক্ষতি হ'লো সে পূরণ করবে কে ? (কাঁদিতে লাগিল)

ভূতনাথ ॥ বল কি হে ! তোমার আর কি ক্ষতি হলো ?

বুটপলিশ ॥ আমার সব্বস্ব খোয়া গেছে, বাবু। পালিশের বাক্সটা এখানেই পড়ে ছিল কিনা—মুচীর ওখান থেকে ফিরে এসে দেখি—

ভূতনাথ ॥ বাক্সটা নেই ?

বুটপলিশ ॥ না বাবু, বাক্সটা ছিল কিন্তু বাক্সের এক কোণে—

ভূতনাথ ॥ কি—কি—কি ছিল ?

বুটপলিশ ॥ আমার সর্ব্বস্ব বাবু। (কাঁদিতে লাগিল।)

ভূতনাথ ॥ আরে মলো, বল না কি? দশ টাকার একটা নোট?

বুটপলিশ ॥ তুমি বুঝি পেয়েছ বাবু?

ভূতনাথ ॥ (পকেট হইতে নোটটি বাহির করিয়া) এইটে?

বুটপলিশ ॥ না—হ্যাঁ—ঐ তো!

ভূতনাথ ॥ নে (নোটটি তাহাকে দিতে গেল)

বুটপলিশ ॥ দশ টাকা!

ভূতনাথ ॥ (কি একটু সন্দেহ হইল) হ্যাঁ দশ টাকা। তোর না?

বুটপলিশ ॥ তুমি কি করে পেলে বাবু?

ভূতনাথ ॥ আমি এসে দেখি এখানে পড়ে রয়েছে।

বুটপলিশ ॥ বাক্স থেকে হাওয়াতে উড়ে গিয়েছিল। তুমি বাবু দেবতা তাই আমায় দিচ্ছ। দাও, নিচ্ছি। (নোটটি হাতে লইয়া) দশ দশটা টাকা—আমার এক মাসের কামাই। দু'বেলা পেট পুরে খেতে পারবো বাবু—বাপ-মা সবাই। কিন্তু বাবু—(হঠাৎ ফুঁপাইয়া কাঁদিয়া উঠিল।)

ভূতনাথ ॥ কেন রে কাঁদছিস কেন? কি হলো?

বুটপলিশ ॥ এর চেয়েও দামী—আমার আর একটা জিনিস খোয়া গেছে বাবু—সেই বাবুর সঙ্গে ধস্তাধস্তিতে বাক্স থেকে কোথায় ঠিক্‌রে পড়েছে—সেটা না পেলে আমি ঘরে ফিরতে পারবো না বাবু! (কাঁদিতে লাগিল)

ভূতনাথ ॥ আরে মলো—শুধু কাঁদে! বল না সেটা কি?

বুটপলিশ ॥ আমার ছোট ভাই-এর একটা ফটো। আমার সেই ভাইটা সেদিন বাস চাপা পড়ে মারা গেছে। জুতো পলিশে তার এমন হাত ছিল—জুতো হয়ে যেত যেন আয়না। কলেজের এক বাবু খুসী হয়ে তার ক্যামেরাতে ফটো তুলে ওকে দিয়েছিল। ও মারা যেতে সেই ফটোটা নিয়ে মা রাতদিন কাঁদে দেখে ফটোটা আমি চুরি করে রেখেছিলাম নিজের কাছে—আমার ঐ বুট-পলিশের বাক্সে। ভাইটা তো গেছে—ফটোটাও আজ গেল। নাও বাবু তোমার টাকা ফিরিয়ে নাও, যা আমার ছিল তাই যখন গেল, যা আমার নয় তা' আর রাখবো না। (নোটখানা ভূতনাথের হাতে গুঁজিয়া দিয়া কোনমতে কান্না চাপিয়া ছুটিয়া পলাইল। ভূতনাথ নোটটি লইয়া ক্ষণকাল কি ভাবিল, পরে উহা পূর্ব্ববৎ ভাঁজ করিয়া জামার ঘড়ির পকেটে রাখিয়া দিল। এইবার আসিল অমল ও বিমল!)

ভূতনাথ ॥ এই যে বিমলদা'! ব্যাপার কি? তোমাদের জন্য সেই কখন থেকে বসে আছি।

বিমল ॥ আরে, আমাদের এখন 'মাথার ঘায়ে কুকুর পাগল' (এদিকে ওদিকে তাকাইতে লাগিল)

ভূতনাথ ॥ কী? কি হয়েছে বিমলদা?

অমল ॥ দু'জনে সিনেমায় যাব বলে টিকিট কিনেছিলাম। টিকিট দুখানা পকেট থেকে হারিয়ে গেছে। এমন ছবিটা—আজই হচ্ছে শেষ দিন—দেখা হ'ল না।

বিমল ॥ গোটা দুই টাকা হাওলাত দেনা ভাই ভূতো।

ভূতনাথ ॥ শালুক চিনেছেন গোপাল ঠাকুর! আমায় পেলে টাকা দেবার লোক!

বিমল ॥ কেন তোর কাছে নেই।

অমল ॥ ঐ যে ঘড়ির পকেটটা ফুলো ফুলো মনে হচ্ছে!

ভূতনাথ ॥ চোখ পড়েছে তবে?

অমল ॥ তা আর পড়বে না! মা তো বলেন আমার নাকি বেড়ালের চোখ—আঁধারেও জ্বলে!

বিমল ॥ যা আছে বের কর্ ভূতো। চল্ তিন জনেই ছবিটা দেখে আসি।

ভূতনাথ ॥ (পকেট হইতে দশ টাকার নোটটি বাহির করিয়া) আছে বটে দশ টাকার একটা নোট—কিন্তু এ আমি খরচ করতে পারব না।

বিমল ॥ কেন রে? তা বেশ, না-হয় হাওলাতই দে।

ভূতনাথ ॥ পারব না—পারব না বিমলদা।

অমল ॥ কেন বল তো? কারো পকেট মেরেছ নিশ্চয়।

ভূতনাথ ॥ মুখ সামলে কথা ব'লো, অমলদা'—

অমল ॥ মানে! যা সত্যি তাই বলেছি—নইলে তুমি দশটাকা পাও কোত্থেকে? স্কুলে হাফ্ ফ্রী—জান্‌তে তো আর বাকী নেই।

বিমল ॥ কেন মিছিমিছি গোলমাল করছিস ভাই, ভূতো! আমরা তো আর কাউকে বলছিনে। নে, চল্—এমন সুন্দর সন্ধ্যেটা মাটি করিসনে। চল্ তিনজনে ছবিটা দেখে রেস্তোরাঁতে গিয়ে এক পেট চপ, কাটলেট খেয়ে নিই। কাক-পক্ষীটিও জানবে না—তার ভাবনা কি!

অমল ॥ তা নয় তো কি! আজ তুই খাওয়াবি—কাল আমরা খাওয়াবো—তবেই না আমরা দোস্ত্!

ভূতনাথ ॥ না, আমি এসব পারব না। এ টাকা আমার নয়। এ টাকা আমি কুড়িয়ে পেয়েছি, এখানে। কার এ টাকা আমি খোঁজ ক'রব। ঠিক মতো প্রমাণ নিয়ে, যার টাকা তাকে আমি ফিরিয়ে দেব।

অমল ॥ কুড়িয়ে পেয়েছিস, এখানে! বিমল। আমাদের চাঁদার ত'বিলটা দেখ্‌তো। কিছু আগে এখানে বসেই তো আমরা নোটগুলো গুন্‌ছিলাম। হয়তো একটা নোট হাওয়ায় উড়ে গিয়েছে।

[অমলের এই ইঙ্গিত পাওয়া মাত্র বিমল পকেট হইতে একতাড়া নোট বাহির করিয়া গুনিল।]

বিমল ॥ সত্যি তো অমল—দশটাকার একটা নোট কম দেখছি!

অমল ॥ তবে ঐ সেই নোটটা।

বিমল ॥ দাও ভাই, ভূতো।

ভূতনাথ ॥ না, দেব না।

বিমল। দেবে না! কেন?

অমল ॥ দিতেই হবে। নইলে কি হেড-মাষ্টারের কাছে আমরা চোর ব'নবো?

ভূতনাথ ॥ তা আমি কি জানি! এ টাকা যে তোমাদের তার প্রমাণ কি?

বিমল ॥ আমরা মিছে বলছি?

ভূতনাথ ॥ সত্যি যে বলছ তারই বা প্রমাণ কি?

বিমল ॥ তুমি দেবে না?

ভূতনাথ ॥ না।

অমল ॥ ভাল চাও তো দাও।

ভূতনাথ ॥ প্রমাণ না পেলে আমি দেব না।

বিমল ॥ বটে! প্রমাণ দিচ্ছি— (ভূতনাথকে চড় মারিতে গেল)

ভূতনাথ ॥ এতে সুবিধা হবে না। বাড়াবাড়ি করলে দুজনেই আমার হাতে ঘায়েল হবে। ভুলো না স্পোর্টের চ্যাম্পিয়ান আমি। আর, জুজুৎসুটা আমি ভালো করেই শিখেছি।

অমল ॥ চমৎকার! আমাদের দুজনকে মাপ কর ভাই ভূতো।

বিমল ॥ আমরা তোমাকে পরীক্ষা করে দেখছিলাম। দশটাকার নোটটা খুলে ছাখ্ ওর পেছনে পেন্সিল দিয়ে ঢেঁড়া চিহ্ন এঁকে দিয়েছি। ও নোটটা আমাদের চাঁদার টাকা।

[ভূতনাথ নোটটি খুলিয়া দেখিল বিমলের কথা সত্য। সে নোটটি বিমলকে দিল]

ভূতনাথ ॥ আমায় মাপ কর তোমরা।

বিমল ॥ (নোটটি লইয়া) আমাদেরও মাপ কর তুই। হেড-মাষ্টার মশায় বলেছিলেন—চাঁদা তোলার ভার যাদের ওপর দেবে, তাদের বাজিয়ে নিও।

ভূতনাথ ॥ তাই বলে এমনি করে বাজিয়ে নিতে হয় বিমল দা'? (কাঁদিয়া ফেলিল)

বিমল ॥ হ্যাঁ ভাই। এমনি করে বাজিয়ে নিয়ে তবেই না আমরা পেলাম তোমার মত খাঁটি সোনা।

[তাহাকে বুকে জড়াইয়া ধরিল]

অমল। কিন্তু আর দেরি নয়। চল ভাই চাঁদা তুলতে। উড়িষ্যা ডুবে গেল।

[ভূতনাথকে অমল বুকে টানিয়া লইল।]

—যবনিকা পড়িল—

—এবার পূজোয় নূতন নূতন বই—

ডক্টর শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত

বঙ্কিমচন্দ্রের সংক্ষিপ্ত গ্রন্থাবলী

তের খণ্ডে সম্পূর্ণ, উপহারযোগ্য সুদৃশ্য বাঁধাই

প্রত্যেকটি ১।০

শরৎচন্দ্রের সংক্ষিপ্ত রচনাবলী

শ্রীকান্ত (১ম পর্ব) ১৷৷০ পণ্ডিত মশাই ১৷৷০

ছোটদের পথের দাবী ২৲

সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়ের

রূপকথার ছাঁচে গড়া, সহজ গল্প বলার ছন্দে :

ছোটদের রামায়ণ (৫ম সং) ২৲

আরব্য উপন্যাসের গল্প (২য় সং) ২৷৷০

বাব্‌লা (কিশোর সং) ১৷৷০

গল্পের চেয়ে অদ্ভুত (২য় সং) ১৷৷০

স্বপনবুড়োর হাসির গল্প (২য় সং) ১৷৷০

একেবারে ঝকঝকে নতুন সংস্করণ

পাতায় পাতায় মজার হাসির রঙিন ছবি

এবার পূজোয় নতুন বই :—

স্বপনবুড়োর অদ্ভুত অভিযানমূলক কাহিনী

উড়ন্তচাকী ১৷৷০

ছেলে-বুড়ো সবাইকার জন্যে

কৃষ্ণপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়ের

—বঙ্কিমচন্দ্রের রচনাবলীর—

অনুকথন সিরিজ প্রত্যেকখানি ৷৷০

আনন্দমঠ দেবী চৌধুরাণী রাজসিংহ

মনীষীদের **জীবন চরিত** প্রত্যেকখানি ৷৷০

যুক্তাক্ষর ছাড়া, বড় বড় অক্ষরে ছাপা

সেরা লিখিয়েদের **সেরালেখার অনুবাদ :**

শিশুসাহিত্যের সব্যসাচী

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়ের অনুবাদ :—

বিখ্যাত ফরাসী লেখক : **জুলে ভের্নের**

রোমাঞ্চকর অদ্ভুত কাহিনী অবলম্বনে বিরচিত :

পাতায় পাতায় ছবি, বোর্ড বাঁধাই। প্রত্যেকটি ১৲

১। সাগরের অতল তলে—
(200,000 Leagues Under the Sea)

২। চাঁদের দেশে—
(From the Earth to the Moon)

৩। আশি দিনে পৃথিবী—
(Around the World in 80 days)

৪। বেলুনে পাঁচ হপ্তা—
(Five Weeks in a Balloon)

কার্ত্তিক মজুমদারের অনুবাদ :—

চার্লস ডিকেন্সের **গ্রেট এক্সপেক্টেশন্স** ১৷৷০

কৃষ্ণপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়ের অনুবাদ :—

চার্লস্ ডিকেন্সের গল্প ১৷৷০

চার্লস্ ডিকেন্সের :—**পিক্‌উইক্ পেপার্স** ১৷৷০

" **এ টেল অব টু সিটিজ** ১৲

মানবেন্দ্রমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের অনুবাদ :—

১। স্টিভেন্সনের—**কিড্‌ন্যাপ্‌ড** ১৷৷০

২। আলেক্‌জাণ্ডার ডুমার **কর্শিকান্ ব্রাদার্স** ১৷৷০

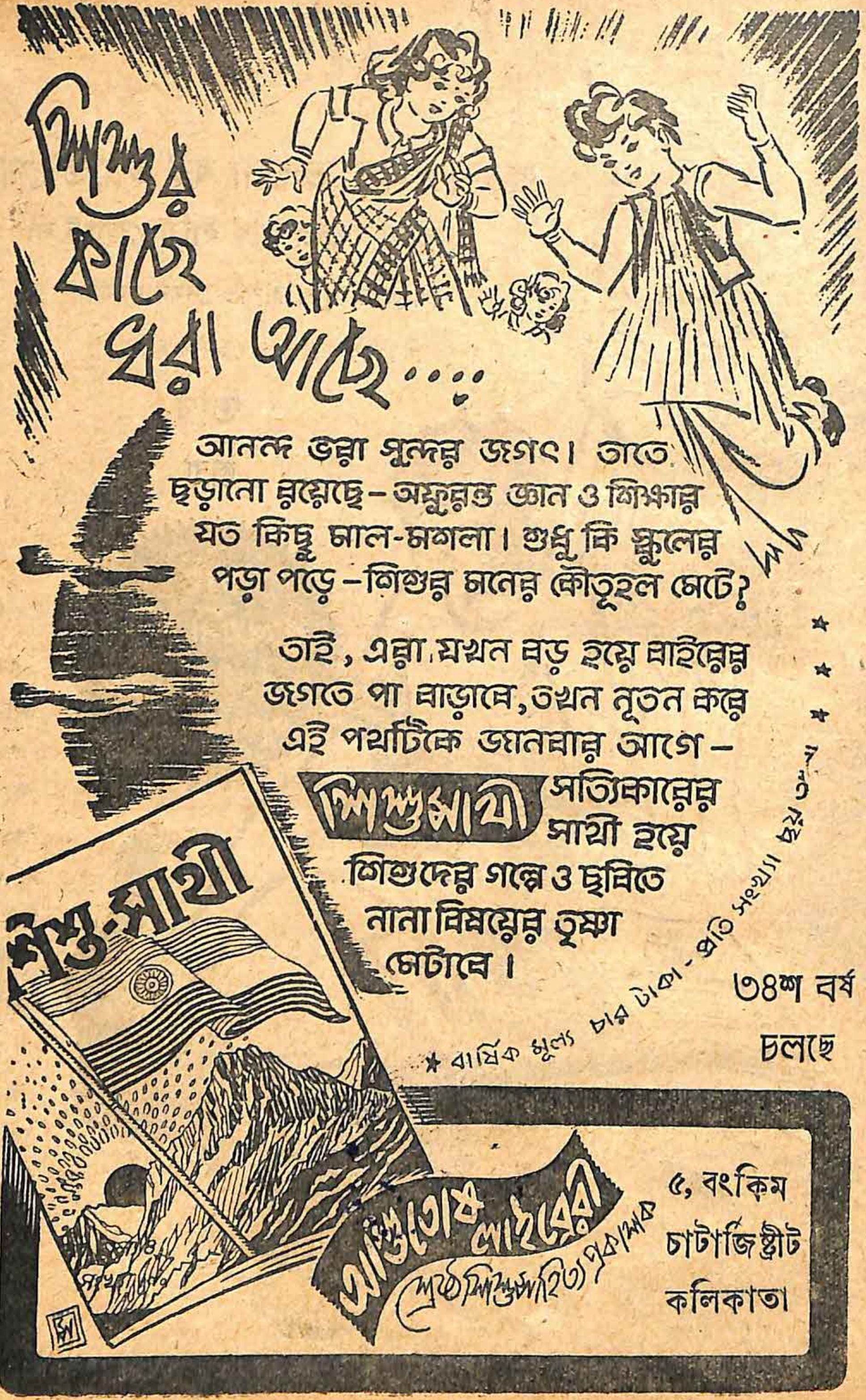
সনৎকুমার ভট্টাচার্য্যের অনুবাদ

অস্কারওয়াইল্ডের শ্রেষ্ঠ গল্প ১৲

দানবের দেশে গালিভার ৷৷০

বামনের দেশে গালিভার ৷৷০

এম, এল, দে এণ্ড কোং—১৩।১, কলেজ স্কোয়ার :: কলিকাতা—১২



শিশুদের কাছে ধরা আছে....
আনন্দ ভরা সুন্দর জগৎ। তাতে ছড়ানো রয়েছে—অফুরন্ত জ্ঞান ও শিক্ষার যত কিছু মাল-মশলা। শুধু কি স্কুলের পড়া পড়ে—শিশুর মনের কৌতূহল মেটে?
তাই, এরা যখন বড় হয়ে বাইরের জগতে পা বাড়াবে, তখন নূতন করে এই পথটিকে জানবার আগে—
শিশুসাথী সত্যিকারের সাথী হয়ে শিশুদের গল্পে ও ছবিতে নানা বিষয়ের তৃষ্ণা মেটাবে।
★ বার্ষিক মূল্য চার টাকা - প্রতি সংখ্যা।।
৩৪শ বর্ষ চলছে
শিশু-সাথী
আশুতোষ লাইব্রেরী
শ্রেষ্ঠ শিশুসাহিত্য প্রকাশক
৫, বংকিম চাটার্জি স্ট্রীট কলিকাতা

আশুতোষ লাইব্রেরীর প্রকাশিত
উপহার পুস্তক সমূহের
সংক্ষিপ্ত তালিকা

* তারকা-চিহ্নিত পুস্তকগুলি ডিরেক্টর বাহাদুর কর্তৃক বঙ্গদেশের যাবতীয় বিদ্যালয়সমূহের জন্য প্রাইজ ও লাইব্রেরী পুস্তকরূপে অনুমোদিত

[২৩শে মে, ১৯৪০ ; ১০ই এপ্রিল, ১৯৪১ ; ১৮ই জুন, ১৯৪২ ; ২৯শে এপ্রিল, ১৯৪৩ ও ৪ঠা মে, ১৯৪৪ তারিখের কলিকাতা গেজেট এবং ১২ই জুন, ১৯৪৫ তারিখের Govt. Notification No. 2 T. B. ; ৩১শে মে, ১৯৪৬ তারিখের Bengal Educational Gazette, 1946, Vol. II, ২৮শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৪৯ তারিখের West Bengal Govt. Notification No. 1 T. B. এবং পশ্চিম-বঙ্গ শিক্ষা-অধিকারের ১৯৫২ সালের ২৬. ২. ৫২ তারিখের 1 T. B., ৫. ৪. ৫৪ তারিখের 1 T. B. এবং ৫. ৫. ৫৫ তারিখের 1 T. B. নং বিজ্ঞপ্তি দ্রষ্টব্য]

<u>প্রত্যেকখানি ।/০ পাঁচ আনা</u>

[জীবনী-মালা]

ছোটদের উপযোগী সহজ ভাষায় লেখা জীবন-কাহিনী। প্রত্যেকখানা বই-ই নামকরা লেখকের লেখা। দামেও বেশ সস্তা। লাইব্রেরী ও দ্রুত-পঠনের খুবই উপযোগী।

* অহল্যাবাঈ	যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত
শ্রীশ্রীবিজয়কৃষ্ণ	ঐ
রাণী ভবানী	ঐ
রণজিৎ সিংহ	ঐ
রাণী দুর্গাবতী	ঐ
* বিদ্যাসাগর	ঐ
গ্যারিবল্ডী	ঐ

আশুতোষ লাইব্রেরী—৫, বঙ্কিম চাটার্জি ষ্ট্রীট, কলিকাতা

প্রত্যেকখানি ।/০ পাঁচ আনা

গুরুগোবিন্দ সিংহ	যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত
* দ্বিজেন্দ্রলাল	বিনয়কুমার গঙ্গোপাধ্যায়
* মাইকেল মধুসূদন	ঐ
* মহম্মদ মহসীন	ঐ
শ্রীশ্রীগৌর-নিতাই	ঐ
বাপ্পারাও	ঐ
পদ্মিনী	ঐ
* আশুতোষ মুখোপাধ্যায়	ঐ
চাণক্য	নীলকমল সেন
তিলক	ঐ
শিবাজী	নবগোপাল দাস
সার সৈয়দ আহাম্মদ	ঐ
কবীর	ধীরেন্দ্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায়
প্রতাপাদিত্য	পূর্ণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য
ঈশা খাঁ	ঐ
* গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়	হরিশ্চন্দ্র সেন
গোখেল	ঐ
অশ্বিনীকুমার দত্ত	জ্যোতিশচন্দ্র ঘোষাল
তৈলঙ্গ স্বামী	সুরেন্দ্রকুমার সেনগুপ্ত
* অক্ষয়কুমার দত্ত	অক্ষয়কুমার রায়
ভক্তকবি তুলসীদাস	মনোরম গুহ-ঠাকুরতা
শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস	ঐ

প্রত্যেকখানি ॥০ আট আনা

ছোটদের আলিবাবা	বিনয়কুমার গঙ্গোপাধ্যায়
ছোটদের আলাদিন	ঐ
* ছোটদের আবুহোসেন	ঐ

প্রত্যেকখানি ৷৷০ আট আনা

* ছোটদের গালিভার	মনোরম গুহ-ঠাকুরতা
* ছোটদের রবিনসন	ঐ
ছোটদের হিতোপদেশ	ঐ
* ছোটদের ঈশপ	তারাপদ রাহা
* ছোটদের গ্রিম	ঐ
ছোটদের গোপাল ভাঁড়	ঐ
* ছোটদের রবিনহুড্	ঐ
* ছোটদের জাতক	ঐ
ছোটদের কথাসরিৎ	ঐ
* ভক্তির ডোর (নাটক)	সত্যচরণ চক্রবর্ত্তী
কৃষ্ণ সখা	মৃত্যুঞ্জয় বরাট সেনগুপ্ত

প্রত্যেকখানি ৷৷৴০ দশ আনা

* ছোটদের আনন্দমঠ	বিনয়কুমার গঙ্গোপাধ্যায়
* ধ্রুব	পূর্ণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য
বালকদের খেলা	সুবোধ সেনগুপ্ত
* পুরাণ ভারত	সুধা দেবজা
মহাযুদ্ধের দান	প্রভাতকুমার গোস্বামী
* বাংলার কুটীর-শিল্প	ননীগোপাল চক্রবর্ত্তী
* বিজ্ঞানী ও বীজাণু	খগেন্দ্রনাথ মিত্র

বীজাণু-সন্ধানী বৈজ্ঞানিকদের আবিষ্কার ও জীবন-কথা ।

* ভীষ্ম	নরেন্দ্রনাথ মজুমদার
কাজলরেখা (ছোটদের নাটক)	মন্মথ রায়
পদ্মিনী	যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত
ভাতের কথা	চিত্তরঞ্জন বিশ্বাস

প্রত্যেকখানি ৸০ বার আনা

পেনাঙ-এর পাহাড়ে	দক্ষিণারঞ্জন বসু
* ছোটদের রামায়ণ	তারাপদ রাহা

প্রত্যেকখানি ।৫০ বার আনা

ছোটদের মহাভারত	মনোরম গুহ-ঠাকুরতা
* পিনোশিয়ো	ঐ
* হর্‌রা	সুনির্ম্মল বসু
* কুম্‌কুম্‌	ঐ
* পাতাবাহার	ঐ
* ঝিল্‌মিল্‌	ঐ
* আল্‌পনা	ঐ
তারাবাই	যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত
ছায়া-কায়া	যামিনীমোহন কর
খুকুরাণীর খেলা	বরদাকান্ত মজুমদার
মেনির কুটুম	ডাঃ সুরেন্দ্রনাথ সেন
* পরশমণি	বরদাকুমার পাল
* বাজিকর	ললিতমোহন নন্দী
* চূড়ামণি	বিজনবিহারী ভট্টাচার্য
* সাঝের বাতি	ঐ
* বাদুড়-বয়কট	ঐ
* সেয়ানে-সেয়ানে	ঐ
* পূজার ছুটি	ঐ
* রূপকথার আসর	প্রভাতকুমার শর্ম্মা
সুরের পরশ	অনিন্দিতা চৌধুরী
সাত সমুদ্র তের নদী পারে	নীহাররঞ্জন গুপ্ত
* ঝুম্‌ঝুমি	নলিনীভূষণ দাশগুপ্ত
* পারিজাত	ঐ
* জয়ডঙ্কা	কার্ত্তিকচন্দ্র দাশগুপ্ত
আগডুম বাগডুম	ঐ
* ঘুমপাড়ানি মাসি-পিসি	ঐ
খেয়াল	সুবিনয় রায়চৌধুরী

লর্ড পাওএল	বসন্তকুমার দাস
* মজার দেশ	বৈদ্যনাথ চট্টোপাধ্যায়
বাংলা সাহিত্যের কাহিনী	নীরেন্দ্র গুপ্ত

বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস ছোটদের জন্য সহজ কথায় বলা হইয়াছে।

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন	হরিশ্চন্দ্র সেন

ভারতের স্বাধীনতা যুদ্ধের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সেনাপতি দেশপ্রেমিক চিত্তরঞ্জনের জীবনকথা সহজ ও সরল ভাষায় লেখা।

প্রত্যেকখানি ১৲ এক টাকা

* মণ্টুর এক্‌স্‌পেরিমেণ্ট	নলিনীভূষণ দাশগুপ্ত
* রাণা প্রতাপ সিংহ	নারায়ণচন্দ্র চন্দ
* বঙ্গোপসাগরের জলদস্যু (১ম)	বিনয়ভূষণ দাশগুপ্ত
* রূপকথা	সরোজকুমার সেন
কেবল মজা	প্যারীমোহন সেনগুপ্ত
* দুনিয়ার আজব	মনোরঞ্জন চক্রবর্ত্তী
* টো-টো কোম্পানীর ম্যানেজার	হেম চট্টোপাধ্যায়
যমরাজার বিপদ	চারুচন্দ্র চক্রবর্ত্তী
খেয়াল খুশী	আশা দেবী
* নতুন যুগের রূপকথা	মণীন্দ্র দত্ত
* ঠাকুর্দ্দা	বীরেন্দ্রকুমার গুপ্ত
মানুষ হও	ঐ
* তুমি কোন্ দলে ?	ঐ
* শঙ্কর (১ম)	নীহাররঞ্জন গুপ্ত
* শঙ্কর (২য়)	ঐ
* আলিবাবা	বিনয়কুমার গঙ্গোপাধ্যায়
* আলাদিন	ঐ

(সংক্ষিপ্ত বঙ্কিম-গ্রন্থমালা)

'বন্দে মাতরম্' মন্ত্রের ঋষি বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস সমূহের ছোটদের উপযোগী সংক্ষিপ্ত সংস্করণ। এই সংস্করণই যে সব চেয়ে ভাল, একথা সকলেই এক বাক্যে বলেন।

আনন্দমঠ
চন্দ্রশেখর
দেবী চৌধুরাণী
* রজনী
* রাজসিংহ
* কপালকুণ্ডলা
* মৃণালিনী
বিষবৃক্ষ
* দুর্গেশনন্দিনী
কৃষ্ণকান্তের উইল
* সীতারাম
* ইন্দিরা, যুগলাঙ্গুরীয়, রাধারাণী (একত্রে)

* আরবের গল্প — আবদুর রশিদ
* বিচিত্র দেশ — বিনয় দত্ত
* ছেলেদের ভক্তমাল — দুর্গামোহন মুখোপাধ্যায়
ভোলানাথ — কানাইলাল মুখোপাধ্যায়

প্রত্যেকখানি ১৲ এক টাকা

নীলদর্পণ — দীনবন্ধু মিত্র

দীনবন্ধু মিত্রের নাটক নীলদর্পণের ছোটদের উপযোগী সংক্ষিপ্ত সংস্করণ।

গল্পে দশ মহাবিদ্যা — দময়ন্তী দেবী সরস্বতী
বহুরূপী — নলিনীভূষণ দাশগুপ্ত
রকমারি

সবেমাত্র যারা পড়তে শিখেছে তাদের জন্য রংবেরংএ ছাপা বহু খ্যাতনামা শিশুসাহিত্যিকের গল্প, ছড়া প্রভৃতিতে ভরা।

* মেরু-অভিযান — খগেন্দ্রনাথ মিত্র
* পাঁচ শিকারী — ঐ
* ইরাণ-তুরাণের গল্প — এস্. ওয়াজেদ আলী
* পাঁচমিশালী গল্প — কার্ত্তিকচন্দ্র দাশগুপ্ত
* সোনার কাঠি রূপার কাঠি — ঐ
* গোপাল ভাঁড়ের গল্প — ঐ
* পৌরাণিক গল্প (১ম) — কুলদারঞ্জন রায়
* পৌরাণিক গল্প (২য়) — ঐ

* দাদুর বৈঠক — কাদের নওয়াজ
* দেওয়ালীর আলো — অমিতাকুমারী বসু
ছড়াছড়ি — বিজনবিহারী ভট্টাচার্য্য
* কল্প-কথা — শিবরতন মিত্র
নীল কুঠীর মাঠ — গৌতম সেন
* ছুটির গল্প — বরদাকুমার পাল

প্রত্যেকখানি ১।০ পাঁচসিকা

দুই সহরের গল্প — দুর্গাবিনোদ মজুমদার

চার্লস ডিকেন্সের 'টেলস্ অব টু সিটিজের' ছোটদের উপযোগী অনুবাদ। সরল, স্বচ্ছন্দ, চিত্তাকর্ষক ভাষা।

হে বীর কিশোর — মণীন্দ্র দত্ত
* রবিন্‌সন্ ক্রুশো — যোগেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়
আমাদের কবি — মনোরম গুহ-ঠাকুরতা

কবি রবীন্দ্রনাথের জীবনকথা অতি সুন্দর ভাষায় চমৎকার করিয়া লেখা।

অন্তিমে গান্ধীজি — কালীপদ চট্টোপাধ্যায়
* জান কি ? — গিরিজাপ্রসন্ন মজুমদার

বিজ্ঞানের যেসব প্রশ্ন মানুষের মনে সর্ব্বদাই জাগিয়া উঠে ছোটদের উপযোগী সহজ কথায় তাহারই উত্তর।

* টম কাকার কাহিনী — ধীরেন্দ্রলাল ধর

দাস-ব্যবসায়ের পটভূমিকায় লেখা বিখ্যাত উপন্যাস 'আংকেল টমস কেবিনে'র সরল সংক্ষিপ্ত অনুবাদ।

রাজতরঙ্গিনীর গল্প — দুর্গামোহন মুখোপাধ্যায়
লৌহ মুখোস — রবীন্দ্রনাথ ঘোষ

'ম্যান ইন্ দি আয়রণ মাস্কে'র সহজ সরল অনুবাদ

আরব্যোপন্যাসের গল্প — সুরেন্দ্রনাথ রায়
* ডেভিড কপারফিল্ড — ধীরেন্দ্রলাল ধর

ইংরেজ লেখক চার্লস ডিকেন্সের বিখ্যাত উপন্যাস 'ডেভিড কপারফিল্ডের' ছোটদের উপযোগী সংক্ষিপ্ত অনুবাদ।

প্রত্যেকখানি ১।০ পাঁচসিকা

* বিজ্ঞানের মায়াপুরী	পরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত
* হাসির দেশ	নলিনীভূষণ দাশগুপ্ত
* সুন্দরবন	রবীন্দ্রনাথ সেন
* ছোট্‌ঠাকুর্দ্দার কাশীযাত্রা	আশাপূর্ণা দেবী
সপ্তকাণ্ড	নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়
রামায়ণ নয়—সাতটি মনমাতানো হাসির গল্প।	
* মণ্টু	যোগেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়
* জোয়ান অব আর্ক	নারায়ণচন্দ্র চন্দ
সাগরদ্বীপের কেল্লা	নির্ম্মল চৌধুরী
* আলোকের দেশ	খগেন্দ্রনাথ মিত্র
* মধুমতীর বাঁকে	ঐ
* আফ্রিকার জঙ্গলে	ঐ
* ডাকাতের ডুলি	ঐ
* বঙ্গ-বিজেতা	রমেশচন্দ্র দত্ত
মহারাষ্ট্র জীবন-প্রভাত	ঐ
ছোটদের উপযোগী সংক্ষিপ্ত সংস্করণ। মধুর সাবলীল ভাষা।	
পয়গম্বরদের গল্প	বন্দে আলী মিঞা
* হাদিসের গল্প	ঐ
* ঈশপের গল্প	তারাপদ রাহা
* সাতরাজ্যের গল্প	কার্ত্তিকচন্দ্র দাশগুপ্ত
কাজের বিজ্ঞান	রাধাভূষণ বসু
কয়েকটি অতি প্রয়োজনীয় বৈজ্ঞানিক বিষয়ের আলোচনা।	
* বাংলার মনীষী	বিজনবিহারী ভট্টাচার্য
* জীবন জেগেছে যার	গৌরগোপাল বিদ্যাবিনোদ
* প্রকৃতির পরাজয়	আবদুর রশিদ
প্রকৃতিকে বশে আনিয়া মানুষ কিভাবে নিজেদের উদ্দেশ্য সাধন করিতেছে—সেই কাহিনী।	

প্রত্যেকখানি ১৸০ এক টাকা বার আনা

রূপন্যাস — কালীপদ চট্টোপাধ্যায়

ছেলেমেয়েদের মনের মত করিয়া বলা কয়েকটি হাসির গল্প।

*** এই বিংশ শতাব্দী** — প্রিয়কুমার গোস্বামী

বিংশ শতাব্দীতে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যে যে নব জাগরণের অপূর্ব্ব সূচনা হইয়াছে, তাহাই ছোটদের জন্য বলা হইয়াছে।

*** রবীন্দ্রনাথ ও যুগ-সাহিত্য** — যতীন্দ্রমোহন বাগচি

বাংলার ডাকাত — যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত

বাংলার ডাকাতদের রোমাঞ্চকর অদ্ভুত গল্প। শিশুসাথীতে প্রকাশিত হইবার সময়েই বিশেষ সাড়া তুলিয়াছিল।

*** সীমান্ত-পারে** — খগেন্দ্রনাথ মিত্র

বাগ্দী ডাকাত — ঐ

*** চাঁদ মামার দেশ** — এম. আকবর আলী

বৈজ্ঞানিকেরা চাঁদ ও মঙ্গল প্রভৃতি গ্রহ সম্পর্কে যে সব খবর জানিতে পারিয়াছেন, উহাই সহজ সরল ভাষায় লেখা।

*** মৃত্যুঞ্জয় সুভাষ** — রাজেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায়

*** কায়া-মৃত্তিকা** — আবদুর রহমান

ইসলামী সাহিত্য হইতে ছোটদের জন্য সংগৃহীত গল্প।

*** পূজার পড়া** — রাজকুমার চক্রবর্ত্তী

*** ছোটদের আবৃত্তি, গান, অভিনয়** — সুনির্ম্মল বসু

সুবিখ্যাত কবি ও লেখক সুনির্ম্মলবাবুর লেখা অনেকগুলি আবৃত্তি, গান ও নাটক একসঙ্গে পাওয়া যাইবে।

প্রত্যেকখানি ২৲ দুই টাকা

*** বালক শ্রীকৃষ্ণ** — বরদাকান্ত মজুমদার

*** ছবি-কথা** — কাফী খাঁ

সুবিখ্যাত ব্যঙ্গ চিত্র-শিল্পী কাফী খাঁর লেখা ও আঁকা। কি ভাবে সহজে ছবি আঁকিতে শেখা যাইতে পারে সে বিষয়ে ও অন্যান্য বহু বিষয় সম্বন্ধে অনেক নতুন দেখিবার ও শিখিবার কথা আছে। ছোটদের বিশেষ উপযোগী।

প্রত্যেকখানি ২৲ দুই টাকা

* রবিন্‌হুড — তারাপদ রাহা

সুবিখ্যাত দস্যু রবিন্‌হুড—যিনি একই সাথে দস্যুবৃত্তি ও দান করিয়া দরিদ্র জনসাধারণের জীবন রক্ষা করিতেন, তাঁহারই জীবনের রোমাঞ্চকর ও সুমহান্ কাহিনী।

* গহনগিরির সন্ন্যাসী — কালীপদ চট্টোপাধ্যায়

* স্বাধীনতার অঞ্জলি

ছোটদের উপযোগী করিয়া বলা ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলন ও মুক্তি সংগ্রামের রোমাঞ্চকর কাহিনী।

প্রত্যেকখানি ২।০ সোয়া দুই টাকা

* সিপাহী যুদ্ধের গল্প — দুর্গামোহন মুখোপাধ্যায়

* টলষ্টয়ের গল্প — দুর্গামোহন মুখোপাধ্যায়

* যারা ছিল দিগ্বিজয়ী — যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত

প্রাচীন ভারত ও বাংলার সুমহান দিগ্বিজয়ী বীর ও বীরাঙ্গনাদের গল্প ছোটদের মনের মত করিয়া বলা।

স্বামী বিবেকানন্দ — মনোরম গুহ-ঠাকুরতা

প্রত্যেকখানি ২॥০ আড়াই টাকা

* ছেলেদের মহাভারত — পূর্ণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য

ছোটদের বত্রিশ সিংহাসন — মনোরম গুহ-ঠাকুরতা

* টাওয়ার অব লণ্ডন — রবীন্দ্রনাথ ঘোষ

সুবিখ্যাত লেখক এইন্‌সওয়ার্থের 'টাওয়ার অব লণ্ডনের' ছোটদের উপযোগী সহজ ও সরল অনুবাদ।

* এণ্ডারসনের রূপকথা — তারাপদ রাহা

* কবি-তীর্থের পাঁচালী — শচীন্দ্রনাথ অধিকারী

টুক্‌টুকে রামায়ণ — নবকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য

প্রত্যেকখানি ৩৲ তিন টাকা

* ছোটদের বেতালের গল্প — খগেন্দ্রনাথ মিত্র

মেস্‌মেরিজম্ — যাদুকর পি. সি. সরকার

প্রত্যেকখানি ৩৲ তিন টাকা

বীরেন দাশ

নতুন পাঠশালা

নতুন যুগের 'নতুন পাঠশালা'কে বুনিয়াদী শিক্ষার ভিত্তিতে কি করিয়া সফল করা যায়, তাহাই ছোটদের জন্য উপন্যাসের আকারে অতি সুন্দর ভাবে বলা হইয়াছে।

প্রতিভা দেবী

লিট্‌ল উইমেন্

এলকটের বিখ্যাত উপন্যাস 'লিট্‌ল উইমেনের' ছোটদের পড়িবার উপযোগী সহজ সুন্দর ও চিত্তাকর্ষক অনুবাদ।

৩।০ সোয়া তিন টাকা মূল্যের

সমর গুহ

নেতাজীর মত ও পথ

নেতাজীর আদর্শ ও কর্ম্ম-পথের বিস্তৃত পরিচয়।

৩॥০ সাড়ে তিন টাকা মূল্যের

শৈল চক্রবর্ত্তী

কালো পাখী

কালোপাখীর সঙ্গে সাগরপারের নানা রংয়ে রঙিন্ দ্বীপ-দ্বীপান্তরে গিয়া রঙের খেলার যে এক নতুন সন্ধান পাওয়া গেল, তাহাই ছোটদের উপযোগী করিয়া বলা। আগাগোড়া রঙীন্ ছবিতে ভরা। তিন রংয়ের ছবিও কয়েকখানা আছে। রঙের খেলার বিচিত্র আখ্যান।

৮৲ আট টাকা মূল্যের

ভূপেন্দ্রকিশোর রক্ষিত-রায়
জ্যোতিশচন্দ্র জোয়ারদার

বিজ্ঞানের চিঠি

বহু শতাব্দীর সাধনার ফলে যে অভিজ্ঞতা সারা দুনিয়ার বিজ্ঞানীরা লাভ করেছেন তারই খবর সহজ ভাষায় পত্রের আকারে জনসাধারণের কাছে পৌঁছে দেবার উদ্দেশ্যেই বইখানা লেখা। আন্তর্জ্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন বিজ্ঞানী সত্যেন্দ্রনাথ বসুর ভূমিকা এই গ্রন্থের গৌরব বর্দ্ধন করিয়াছে।

বার্ষিক শিশুসাথী (১৩৫৬)	৪৲
বার্ষিক শিশুসাথী (১৩৫৭)	৪৲
বার্ষিক শিশুসাথী (১৩৫৮)	৪৲
বার্ষিক শিশুসাথী (১৩৬০)	৪৲
জয়ন্তী শিশুসাথী	২৲


সুন্দর
কেশগুচ্ছ..
বেঙ্গল কেমিক্যালের
ক্যান্থারাইডিন হেয়ার অয়েল
কেশমূল সতেজ রাখে ও কেশের শ্রী বৃদ্ধি করে
বেঙ্গল কেমিক্যাল
কলিকাতা·বোম্বাই·কানপুর

Sudhansu Kumar Saha

Principal

